www.bhraman.com Subscribe Online: www.swarnakshar.in ISSN 0971-8885 ফেব্রুয়ারি ২০১৩ □ ২৫ টাকা

ভ্রমণ

বিংশতিবর্ষপূর্তি সংখ্যা

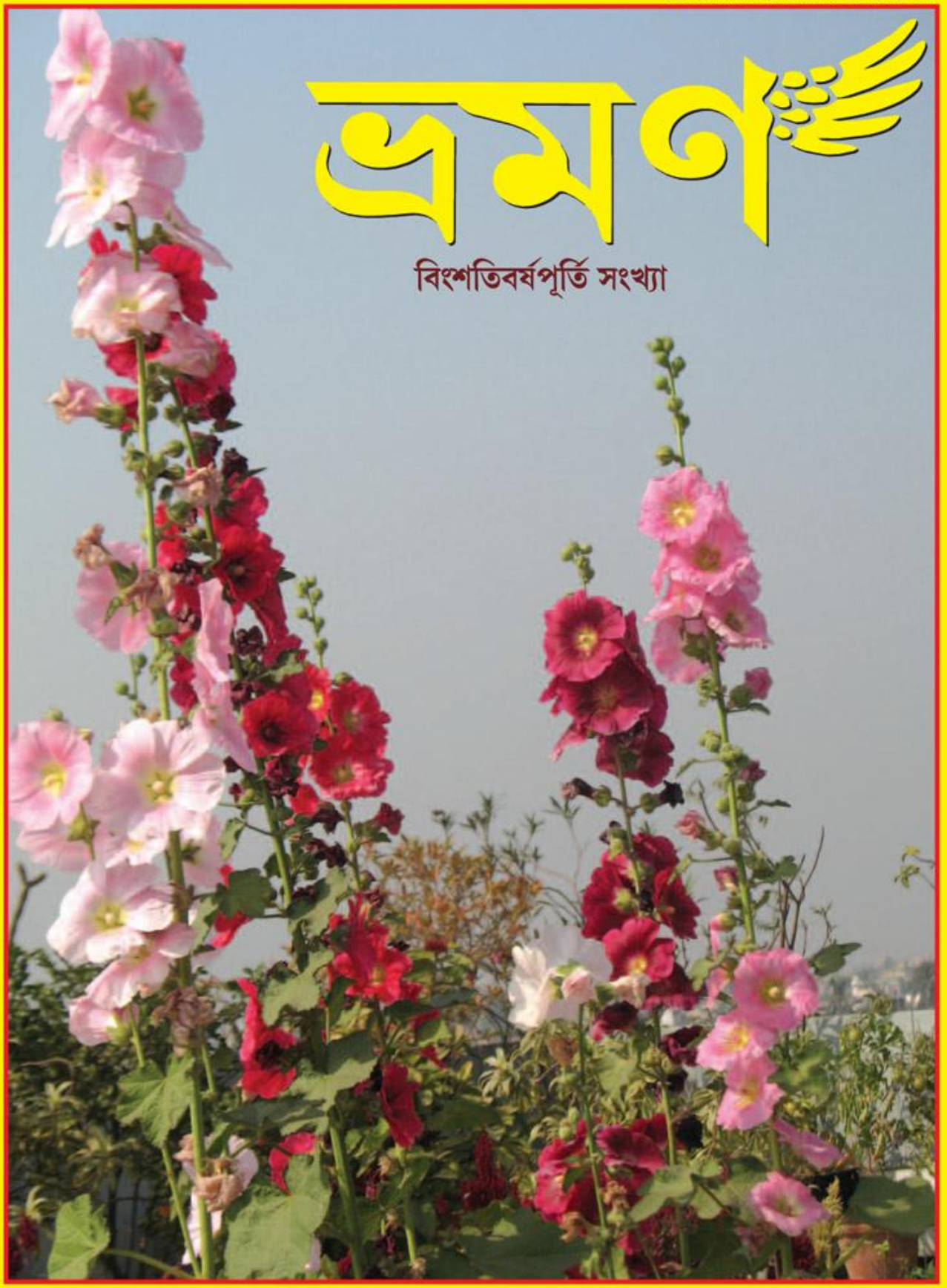

www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

কলকাতায় সর্বত্র পাবেন
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রিকা
পেতে অনলাইন গ্রাহক হোন
www.swarnakshar.in

এক বছরের ১২টি সংখ্যার গ্রাহকমূল্য ৩৬০ টাকা চেকেও পাঠাতে পারেন। এই নামে, এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

এই আশ্চর্য পৃথিবীর সঙ্গে আপনার সেতুবন্ধ

ভ্রমণ

বেরিয়ে পড়ার সেরা গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

তিনবছরের গ্রাহক হয়ে
হাতে হাতে নিয়ে যান
দুঘণ্টার সুপার ডিভিডি:
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে
বিশ্বভ্রমণ

অনলাইন গ্রাহক হতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

'ভ্রমণ'-এর ৯টি সাধারণ সংখ্যা (২৫ টাকা), একটি পুজোর গাইড সংখ্যা (৯০ টাকা) ও একটি শারদীয়া সংখ্যা (৯০ টাকা) সহ বছরে মোট ১১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
'ভ্রমণ'-এর দুটি বিশেষ সংখ্যা সাধারণ ডাকের গ্রাহকদের কাছেও ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হয়।

দুটি বিশেষ সংখ্যা পাঠানোর ক্যুরিয়ার খরচ ধরে সাধারণ ডাকে গ্রাহকমূল্য—

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৩৬০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৪১০ টাকা।

তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ১,০৮০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,২৩০ টাকা।

সব সংখ্যাই ক্যুরিয়ার মারফত পেতে চাইলে

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৪৬০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৫৬০ টাকা।

তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ১,৩৮০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,৭০০ টাকা।

তিনবছরের গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে (নীচের ঠিকানায়) জমা দিয়ে হাতে হাতে নিয়ে যান দুঘণ্টার সুপার ডিভিডি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশ্বভ্রমণ

টাকা বা ড্রাফট ডাকে পাঠালেও ডিভিডি কেবলমাত্র আমাদের অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 94332-17491, 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** subscription@swarnakshar.in

গ্রাহক হবার ফর্ম

Sending □ Rs. 360 □ Rs. 410 □ Rs. 460 □ Rs. 560 □ Rs. 1,080 □ Rs. 1,230 □ Rs. 1,380 □ Rs. 1,700 towards my subscription to BHRAMAN for □ One year □ Three years by Bank Draft Payable at Kolkata.

Name:.....

Address:.....

.....

.....

Bank Draft No.:..... Date:..... Bank:.....

Branch:..... Signature & Date:..... Phone No.:.....

যে মাসে গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে পৌঁছবে, তার পরের মাস থেকে পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
মানি অর্ডার/ড্রাফট Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে লিখবেন। পাঠাবেন এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019.

ভ্রমণ

সূচিপত্র

একবিংশতি বর্ষ প্রথম সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ফাল্গুন ১৪১৯

বিংশতিবর্ষপূর্তি সংখ্যা

২১ বছর আগের ভ্রমণ থেকে

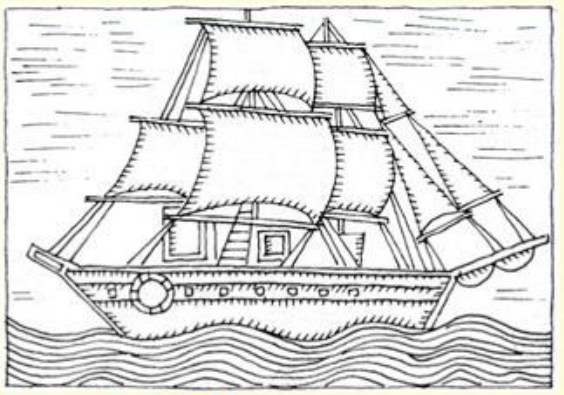

22 ভূপ্রদক্ষিণ
চন্দ্রশেখর সেন

30 কেদার বদ্রি
মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

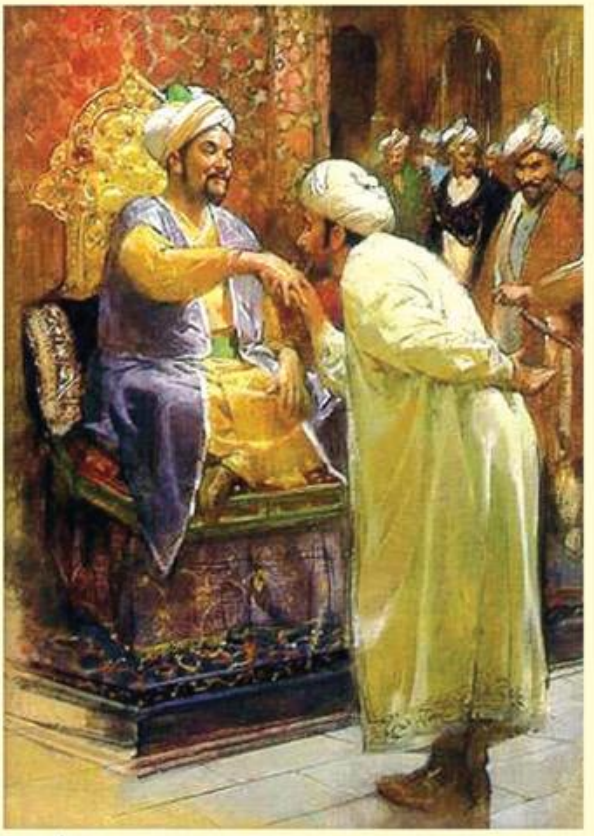

11 ইবন বতুতার ভারত ভ্রমণ
কিশলয় ঠাকুর

8 প্রধান সম্পাদকের কথা

62 বাবু শরৎচন্দ্র দাশের কাঞ্চনজঙ্ঘার ডায়েরি
ধ্রুব মজুমদার

২১ বছর আগের ভ্রমণ থেকে

34 মহারাষ্ট্রের হিল স্টেশন
প্রতাপকুমার রায়

42 মালয়েশিয়া
নিমাই ভট্টাচার্য

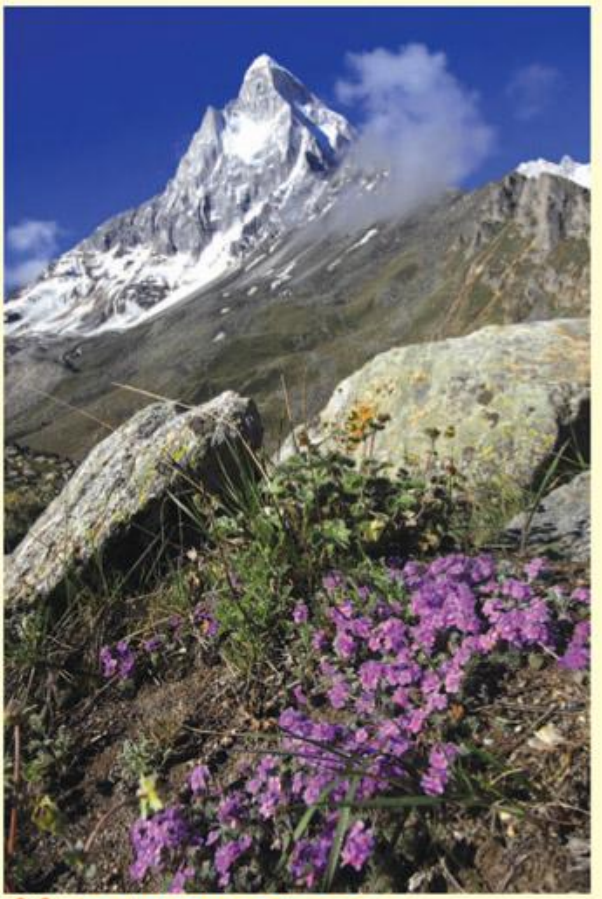

38 মহাদেবের পদতলে
শঙ্কু মহারাজ

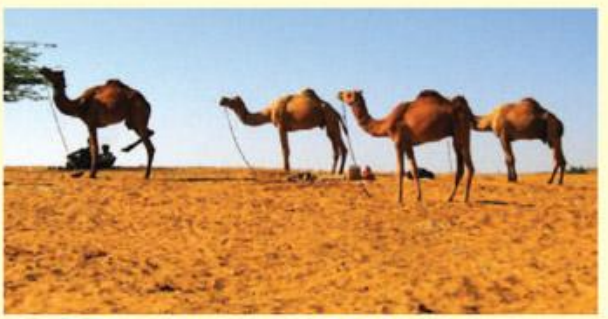

55 উট লুঠের কাহিনী
চার্লস মন্টেগু ডাউটি

52 রামচন্দ্রের বনবাসের পথ পরিক্রমা
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কথা

ফিরে দেখার ২০ বছর

72 ১৯৯৩ ∬ আমার ভ্রমণ
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

72 ১৯৯৪ ∬ জংলি পালামৌ: অন্য চোখে
বুদ্ধদেব গুহ

72 ১৯৯৫ ∬ আরেক সিমলা
শঙ্খ ঘোষ

73 ১৯৯৬ ∬ দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

73 ১৯৯৭ ∬ গাড়িতে মানস-কৈলাস
সমীর রায়

74 ১৯৯৮ ∬ নীল ও হ্যাভলক
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

75 ২০০০ ∬ আমাজন থেকে ইগুয়াসু
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

74 ১৯৯৯ ∬ ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত
হরপ্রসাদ মিত্র

76 ২০০১ ∬ জিম করবেটের জঙ্গলে
মণিদীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

76 ২০০২ ∬ **অর্ধশতাব্দী আগের বদ্রীনাথ যাত্রা**
প্রতাপকুমার রায়

78 ২০০৫ ∬ **অকল্পনীয় আন্টার্কটিকা**
প্রতাপকুমার রায়

79 ২০০৬ ∬ **৩০ বছর আগে আন্দামানের দ্বীপে**
রতনলাল ব্রহ্মচারী

80 ২০০৮ ∬ **আইসল্যান্ড ভ্রমণের বৃত্তান্ত**
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

77 ২০০৩ ∬ **তুন্দ্রার তৃণ**
নবনীতা দেব সেন

78 ২০০৪ ∬ **বোর্নিওর আদিম জঙ্গলে**
অর্পিতা চক্রবর্তী

79 ২০০৭ ∬ **সাগরখাঁড়ির গান**
অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

80 ২০০৯ ∬ **স্বর্গের কাছাকাছি জনপদ**
জয়া মিত্র

81 ২০১০ ∬ **এভারেস্ট এভারেস্ট**
বসন্ত সিংহরায়

81 ২০১১ ∬ **রেলপথে আগরতলা থেকে ধর্মনগর হয়ে ঊনকোটি**
রবীন চক্রবর্তী

82 ২০১২ ∬ **প্রধান সম্পাদকের কথা**

'ফিরে দেখার ২০ বছর' বিভাগের ছবিগুলি তুলেছেন: অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীশকুমার মাইতি, শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী, সিদ্ধার্থ সমাজদার, রবীন চক্রবর্তী ও অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

প্রচ্ছদের ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

এই সংখ্যার সব লেখায় বানান ও তথ্য অপরিবর্তিত। কয়েকটি ছবি নতুন সংযোজিত।
—সম্পাদক

কপিরাইট © স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ ২০১৩
ভ্রমণ-এ প্রকাশিত কোনও লেখা ও তার কোনও অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া মূলে বা অনুবাদে প্রকাশ করা যাবে না।

প্রধান সম্পাদক **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**
সম্পাদক **মহাশ্বেতা সমাজদার**

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।

দাম ২৫ টাকা

BHRAMAN
A Bengali Monthly on Travel & Tourism
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Telephone: 2283 2320, 2280 8818 **Fax:** 2287 6448
E-mail: bhraman@swarnakshar.in **website:** www. swarnakshar.in

প্রধান সম্পাদকের কথা

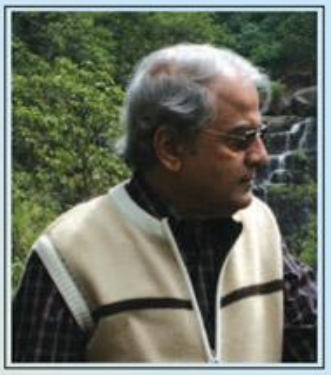

‘বছর দশ-বারো আগে আমাকে যেতে হয়েছিল রামচন্দ্রের বনবাসের পথপরিক্রমায়। অযোধ্যা থেকে শুরু করে দুই পর্যায়ে আমি ধনুষ্কোটি পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

বনবাসে বিসর্জিত হবার পর রামচন্দ্র যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছিলেন, চিহ্ন ধরে ধরে সেই পথটিকে পুনরাবিষ্কার— এই কাজটির মধ্যে রোমাঞ্চ ছিল, কিছু অ্যাডভেঞ্চারও ছিল।’

কথাগুলো আমার না, বাংলার অগ্রণী ঔপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের। আজ থেকে একুশ বছর আগে ১৯৯৩-এর ফেব্রুয়ারিতে ‘ভ্রমণ’ পত্রিকার নিয়মিত আত্মপ্রকাশেরও আগে ১৯৯২-এর আগস্টে প্রকাশিত ‘ভ্রমণ’-এর নমুনা শারদীয়া সংখ্যায় তাঁর এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বর্ণনা করেছিলেন।

ওই সংখ্যায় কিশলয় ঠাকুর শুনিয়েছিলেন ‘ইবন বতুতার ভারতভ্রমণ’: ‘পাখি যেমন নীড় ছেড়ে অনন্ত আকাশের উদ্দেশে ডানা ভাসিয়ে দেয়, আমিও তেমনই ঘর ছেড়ে আত্মীয়-পরিজন ফেলে রেখে পথে বের হলাম’— এভাবেই সুদীর্ঘ ভ্রমণের দিনলিপি ‘আল রিহ্‌লা’ শুরু করেছেন ইবন বতুতা। পুরো নাম— শেখ আবদাল্লা বিন মহম্মদ ইবন ইব্রাহিম আল-লাওয়ারি ইবন বতুতা।

চন্দ্রশেখর সেনের ‘ভূপ্রদক্ষিণ’-এর সূচনাপর্ব ‘যাত্রা’র পুনর্মুদ্রণ শুরু হয়েছিল এইভাবে: ‘ভারতের অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত

পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সমাজ মধ্যে বিভিন্ন ভাব দেখি নাই। আসামের শেষ সীমা ডিহিং নদীর অপর পার হইতে কচ্ছ-দ্বীপ পর্য্যন্ত, এবং হিমালয়ের কোল হইতে পঞ্চবটী পর্য্যন্ত যে যে স্থান পরিদর্শন করিয়াছি, সর্ব্বত্র সেই এক হিন্দু, মুসলমান, সেই এক প্রকার লোকের ভাব— সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র; সেই শিয়া সুন্নি মোল্লা হেদাতি; সেই মঠ, মন্দির, শিব, গণেশ; সেই দরগা, মস্‌জিদ, পীর, প্যাগম্বর। সুতরাং ভারতবর্ষ পর্য্যটনে ভারতীয় ভাবে লোক-চরিত পরিজ্ঞান ও নানারূপ অবস্থাবগত হওয়ার জন্য বিপুল অভিজ্ঞতা লাভ হয় বটে; কিন্তু আমাদের সম্মুখে এমন অভিনব কিছু উপস্থিত হয় না, যাহা দেখিতে আমরা একেবারে অনভ্যস্ত বা সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তুত। এই কারণে, অনুসন্ধিৎসু বাঙ্গালীর মনে, ইউরোপ ভ্রমণের— পাশ্চাত্য লোকমণ্ডলীর রীতি নীতি কাণ্ড কারখানা দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিবার—বাসনা স্বতঃই জাগিয়া উঠে। বহুকাল হইতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, একবার পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন বাস করিয়া যাই। নানা কারণে উহা ঘটিয়া উঠে নাই।'

'মালয়েশিয়া'র আমূল পরিচয় তুলে এনেছেন তাঁর প্রথম যৌবনে নেহরু আর কৃষ্ণ মেননের সান্নিধ্যে ইউরোপ-ঘোরা, আরব সাগর ডিঙিয়ে ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে আতলান্তিক মহাসাগরের পাড়ের দেশে দেশে ঘুরে-আসা নিমাই ভট্টাচার্য।

ওড়িশা, অরুণাচল, কর্নাটক, দিল্লি, পেরিয়ার, রূপকুণ্ড-কুঁয়ারি, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, মহাবালেশ্বর, পারমাদন— দিকে দিকে দেশে দেশে ডানা মেলে দিয়েছিল মনের একটা অনুমানের মতো একটা ভ্রমণ-পত্রিকা, যা ইচ্ছা হয়ে স্বপ্ন হয়ে ছিল মনের মাঝারে, ছ'মাস পরে নানান বাধাবিপত্তি পার হয়ে ১৯৯৩-এর ফেব্রুয়ারিতে যে পত্রিকার যাত্রা হবে শুরু। সেই শুরু-সংখ্যার 'ভ্রমণ'-এ কয়েকটা লেখা ছিল: আমার ভ্রমণ/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়; মোগল আমলে বাংলামুলুক/সুশীল ভদ্র; এভারেস্ট অভিযান ১৯৯১/গৌতম দত্ত; বরফরাজ্য সিকিম/সূর্য ঘোষ; পুষ্করমেলার নেপথ্যপুরাণ/শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়; শোনপুরের পশুমেলা/সুরজিৎ চক্রবর্তী। তাছাড়াও রাজস্থান, বেনারস, হনলুলু, উলুঘাটা-গড়চুমুক, আজবনগর, মঙ্গলদ্বীপ ইত্যাদি।

আজ একুশ বছরের এই প্রথম সংখ্যায় একুশ বছর আগের সেই নমুনা সংখ্যা ছাড়াও গত দুই দশকের আংশিক ভ্রমণস্মৃতিচারণা আপনাদের কার কেমন লাগল জানতে পেলে আমাদের ভালো লাগবে।

২০ বর্ষপূর্তি ভালো মতো অনুষ্ঠান করে উদ্‌যাপন করতে পারলে আরও আনন্দের হত, কিন্তু এমাসেই রোয়ান্ডা-উগান্ডার জঙ্গলে গরিলা দর্শনের উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত থাকায় এবারের মতো সেই সুযোগ পাওয়া গেল না। বিশেষ করে গরিলা অন্বেষণে এবছরের মতো এখনই বেশ দেরি হয়ে গেছে।

নতুন ভ্রমণবর্ষে সবাইকে আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সবার যাত্রা শুভ হোক।

মায়ানমারের ইনলে অঞ্চলের মন্দির □ ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

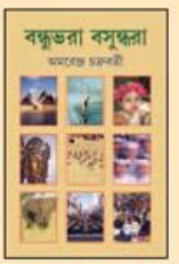

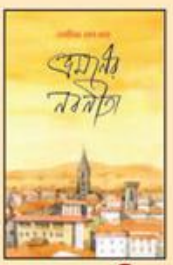

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি
Buy Online ▸ www.swarnakshar.in
তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী
শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী
আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার
বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন
দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়
দক্ষিণ থাইল্যান্ড
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
Read / Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
ভ্রমণ
ছেলেবেলা
Traveller
To be launched shortly
পেশাপ্রবেশ
কর্মক্ষেত্র
স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com
আরও অনেক বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

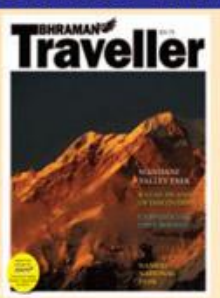

কিশলয় ঠাকুর

ইবন বতুতার ভারত ভ্রমণ

'পাখি যেমন নীড় ছেড়ে অনন্ত আকাশের উদ্দেশে ডানা ভাসিয়ে দেয়, আমিও তেমনি ঘর ছেড়ে, আত্মীয়-পরিজন ফেলে রেখে, পথে বের হলেম।' —এভাবেই সুদীর্ঘ ভ্রমণের দিনলিপি 'আল রিহলা' শুরু করেছেন ইবন বতুতা। পুরো নাম— শেখ আবু আবদাল্লা বিন মহম্মদ ইবন ইব্রাহিম আল-লাওয়াতি ইবন বতুতা।

আফ্রিকার মরক্কোর তাঞ্জিয়ারে ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। পিতা আবু আবদাল্লা সেখানে কাজির অর্থাৎ বিচারকের কাজ করতেন। নিজেও পিতার বৃত্তির কিছুটা তালিম নিয়েছিলেন। কিন্তু পথ তাঁকে হাতছানি দিয়ে বার করল। ১৩২৫ সালের ১৪ জুন যাত্রা শুরু। তখন তিনি একুশ বছরের তরুণ। তারপর অবিচ্ছিন্ন উনত্রিশ বছর, অর্থাৎ প্রায় তিন দশক ধরে আফ্রিকা, এশিয়া এবং চীন, এই তিনটি মহাদেশ ভ্রমণ। বর্তমান কালের মানচিত্রের চুয়াল্লিশটি দেশ এর মধ্যে পড়ে। মোট অতিক্রান্ত পথের পরিক্রমা সাতাত্তর হাজার ছয় শত চল্লিশ মাইল। মার্কোপোলোর পরিক্রমা পথেরও তিনগুণ বেশি। কলম্বাসেরও দুই শতাব্দী আগে, সঙ্গীদের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে উটের পিঠে ভয়ঙ্কর সাহারার মধ্য দিয়ে পর্যটন শুরু। প্রথমে পৌঁছন তিন হাজার মাইল দূরবর্তী মক্কা। সেখান থেকে আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, জেরুজালেম, ত্রিপোলি, দামাস্কাস, ইরাক, ইরান হয়ে ফের মক্কা। এই মক্কাতেই, ভারতীয় হজযাত্রীর মুখে ভারতের নানা কাহিনী শুনে আকৃষ্ট হলেন এই আশ্চর্য দেশবাসীর প্রতি। শেষে, নানা পথ ঘুরে এশিয়া মাইনর হয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল, সেখান থেকে পূর্বমুখী হয়ে, হিন্দুকুশ পার হলেন। সেখান থেকে সিন্ধুনদ অতিক্রম করে তেরো-শ তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর হিন্দুস্তান অর্থাৎ ভারত ভূমিতে প্রবেশ।

ভারতে তখন দিল্লির সুলতান বিখ্যাত খামখেয়ালি শাসক মহম্মদ বিন তুঘলক। তাঁর অধীনে কাজির চাকরি করে, আট বছর দিল্লি কাটিয়ে আরও কয়েক বছর দক্ষিণ ভারত সংলগ্ন দ্বীপাঞ্চল এবং পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম, সাতগ্রাম, সোনারগাঁও ইত্যাদি ঘুরে, তুঘলকের দূত হিসাবে চীন যাত্রার জন্য ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে দক্ষিণ ভারত থেকে জাহাজে ভারত ত্যাগ করেছেন। চীন ঘুরে স্বদেশে পৌঁছন তেরোশ পঞ্চান্নতে। সেখানেই 'আল রিহলা' শেষ করেন। তেরোশ' পঞ্চাশের ৯ ডিসেম্বর, বুধবার চুয়াত্তর বছর বয়সে, ফেজ-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই Prince of Travellers. তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে এখানে কেবল

ভারতীয় অংশটুকুই সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে।

হিন্দুস্তানের মাটিতে পা রাখলেন মানেই পা বাড়ালেন নয়। ইবন বতুতার সঙ্গে ছিল নারী, পুরুষ, উট, ঘোড়া, খচ্চরের এক বিরাট দঙ্গল। ওদের আঁচ পেয়েই সুলতানের সীমান্তপ্রহরীরা এসে সামনে দাঁড়ালো— হুঁশিয়ার। তোমরা কারা আগে পরিচয় দাও, কেন ঢুকেছ এদেশে, কোথায় যাবে, সে সব বল। সরিয়ে দাও উট, ঘোড়া, সব। বতুতা পথেই শুনেছিলেন, হিন্দুস্তানে কোনও বহিরাগত এসে থাকতে চাইলে, চাকরি বা ব্যবসা বাণিজ্য করে বসবাস করার ইচ্ছে থাকলে কোনও বাধা নেই, না হলে কেবল ঘোরাঘুরি চলবে না। সুতরাং বুদ্ধি করে দলের সবাই জানালো তারা সুলতানের এই সুন্দর দেশে থাকতে চায়। এতে খুশি হল প্রহরীরা। সিন্ধু প্রদেশের শাসক কুতব-উল-মুল্‌ক থাকেন মুলতানে। দূত খবর নিয়ে ছুটল সেখানে। তিনি খবর পাঠালেন সুলতানের কাছে। সুলতান তখন রাজধানী দিল্লির বাইরে শিকারে ছিলেন। সে এখান থেকে পঞ্চাশ দিনের পথ। কিন্তু খবর গেল পাঁচ দিনেই। এই খবর পাঠাবার দুরকম ব্যবস্থা ছিল তখন। এক রাজকীয় ঘোড়া, দুই পায়ে ছোটা রানার বা ধাওয়া। ঘোড়ার বিশ্রামের ঘাঁটি ছিল প্রতি চার মাইল অন্তর। আর ধাওয়া বদলের মঞ্চ ছিল ঘন ঘন। এক হাতে খবরের থলে, অন্য হাতে ঘণ্টি বাঁধা ডাণ্ডা। ঘণ্টির শব্দ পেলেই পরবর্তী ধাওয়া মঞ্চে প্রস্তুত হত এবং হাত বদল করে সেও ছুটতো। এভাবে নাকি ঘোড়ার চাইতেও দ্রুততর হত ধাওয়ার গতি। এই ধাওয়া কেবল চিঠিপত্রই দিত না। সুলতানের জন্য বিদেশের ফল, গঙ্গাজলের জার— এমনকি অপরাধী-দস্যু-ডাকাতদের চলাফেরার পথ দিয়েও এইসব বাক্সবন্দী করে মাথায় করে আনা হত রাজধানী পর্যন্ত।

সুতরাং পাঁচ দিনে খবর এবং পরের পাঁচ দিনে উত্তর এসে গেল সুলতানের, স্বাগতম্ মেহমান! তবে ইত্যবসরে, অন্য কর্মচারীরা তাদের তৎপরতা দেখাতে কসুর করেনি। শুল্ক অফিসাররা তল্লাসি করে বতুতার দলের বহু সামগ্রীই বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। লুঠপাট হয়ে গেছে জীবজন্তুগুলি। কিন্তু সুলতানের ফরমান পৌঁছতেই গোটা চিত্রটা পাল্টে গেল। কুতুব-উল-মুল্‌ক নিজে এসে স্বাগত জানালেন ওদের। ফেরৎ দেওয়া হল বাজেয়াপ্ত সব সামগ্রী। এমনকি লুঠ-পাট হওয়া জীবজন্তুগুলিও খুঁজে আনল কর্মচারীরা। প্রচুর খাদ্য রসদ দিয়ে তাদের দিল্লির পথে যাত্রা করিয়ে দেওয়া হল। কিছু ব্যবসায়ী এখানে ব্যবসা করেও নেয়। সুলতানকে উপহার দেওয়ার জন্য তারা চড়া সুদে অনেক মূল্যবান সামগ্রী ধার দিল বতুতাকে। তারা জানতো, ধার শোধ হবেই, না হলে সুলতানকে নালিশ করলে ওর গর্দান যাবে।

দিল্লির পথে বতুতার স্মরণীয় অভিজ্ঞতা, কাফের (হিন্দু) রমণীদের, স্বামীর সঙ্গে সানন্দে সহমরণ বা সতীদর্শন। পথে পথে, এরকম অনেকগুলি দৃশ্য তাঁর সঙ্গীদের চোখে পড়ে। তবে নিজে তিনি একই জায়গায় তিনজন সতী সহমরণে যাওয়ার দৃশ্য দূরে দাঁড়িয়ে আদ্যোপান্ত লক্ষ করেন। সেজেগুজে ঘোড়ায় চেপে এই রমণীরা মন্দির সংলগ্ন শ্মশানভূমিতে আসে। পথে পথে পল্লীবাসীরা এদের মাধ্যমে তাদের পরলোকগতদের কাছে বার্তা পাঠাচ্ছিল। নিকটবর্তী জলাশয়ে স্নান করে মন্দিরে বিগ্রহের কাছে পূজা দিয়ে প্রত্যেকে হাসি মুখে এরা চিতায় আরোহন করে। বাদ্য বাজনা চলে তাদের ঘিরে। আগুন জ্বালিয়ে দিলেও ছটফট করে না সতীরা। স্বামীর মৃতদেহ আদ্যন্ত জড়িয়ে থাকে। কিন্তু এ দৃশ্য ইবন বতুতার কল্পনাতীত ছিল। তা সহ্য করতে না পেরে তিনি চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যান। সঙ্গীরা তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ জল-হাওয়া করে সুস্থ করে।

দিল্লি

রাজধানী দিল্লি পৌঁছে তো অবাক ইবন বতুতা। এতো সুন্দর চোখ ধাঁধানো শহর এর আগে তিনি দেখেননি। বলছেন, প্রাচ্য দুনিয়ায় মুসলমানদের যতো শহর আছে তার মধ্যে এটি বৃহত্তম। অবশ্য তাঁর তথ্য, এটি হিন্দু (কাফের)-দের হাতেই গড়ে উঠেছিল। ১১৮৮ সালে মুসলমানরা জয় করে নেয়। দিল্লি কেবল একটি শহর নিয়ে হয়নি। মোট চারটি শহর— দিল্লি, সিরি, দার-উল-খিলাদ আর তুঘলকাবাদ নিয়ে দিল্লির রাজধানী। এর চারদিক ঘিরে বিশাল প্রতিরক্ষা প্রাচীর দেখেছেন বতুতা। এগারো হাত চওড়া এর দেওয়াল। দেওয়ালের ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গপথ। অশ্বারোহী সৈন্যরা এই সুড়ঙ্গ দিয়ে নগর রক্ষার জন্য ছুটে বেড়াতো। মাঝে মাঝে প্রকোষ্ঠ ছিল যাতে থাকতো রক্ষীরা, এবং অস্ত্রশস্ত্র ও মজুত খাদ্য। দরজা ছিল মোট আঠাশটি। প্রধান দরজাটার নাম ছিল বুদাউন।

উচ্ছ্বসিত বর্ণনা আছে কুতুব মিনারের। মিনারটি পুরো সোনার ছিল। ওপরে ওঠার সিঁড়ি এতো চওড়া যে তিনি শুনেছেন ওই সিঁড়ি দিয়েই হাতি পাথর নিয়ে যেতো উপরে।

সুলতান মহম্মদ শাহ অর্থাৎ মহম্মদ বিন তুঘলকের প্রাসাদ ছিল অভিজাত জাঁহাপনা অঞ্চলে। জাঁকজমকপূর্ণ এই প্রাসাদের নাম দায়রসারা।

দিল্লির সুলতানদের কিছু পুরনো শোনা কাহিনীও আল রিহলায় উল্লেখ করেছেন বতুতা। যেমন সুলতানা রাজিয়ার কাহিনী। ছেলে এবং এক কন্যা রাজিয়াকে রেখে সুলতান শামসউদ্দিন মারা গেলে বড় ছেলে রুকনুদ্দিন মসনদে বসেন। কিছুদিনের মধ্যে সে তার পরের ভাই মুয়াজুদ্দিনকে হত্যা করে। রাজিয়া এতে ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর নেতৃত্বে সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে রুকনুদ্দিনকে হত্যা করে ও রাজিয়া সিংহাসনে বসেন। পুরুষের মতো বহির্বাস পরে, তীর-ধনুক নিয়ে তিনি ঘোড়ার পিঠে ঘুরে প্রশাসন দেখতেন। কিন্তু অভিযোগ উঠল এক কাফ্রি ক্রীতদাসের সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক হয়েছে। ফলে তাকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হল, মসনদে বসল তার ছোট ভাই নাসিরুদ্দিন। এক আত্মীয়কে বিয়ে করলেন রাজিয়া। দুজনে মিলে লোকজন যোগাড় করে ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন তিনি। কিন্তু হেরে পালিয়ে যান। একদিন ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত অবস্থায় এক চাষীর কাছে তিনি জল চাইলেন। চাষী তাঁকে জল আর কিছু খাবার দিল। তাই খেয়েই অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর রূপে এবং চেহারায় চাষীর সন্দেহ আগেই হয়েছিল। এবার সে ঘুমন্ত রাজিয়ার স্খলিত অন্তর্বাস দেখতে পেল। মণিমুক্তোখচিত তাঁর ঘাঘরা প্রতিলুব্ধ করল চাষীকে। সে রাজিয়াকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে দেয়। পোশাক নিয়ে যায় বাজারে বেচতে। তাতেই সে ধরা পড়ে। মারের চোটে সব স্বীকার করে মৃতদেহ দেখিয়ে দেয়। রাজিয়ার মৃতদেহ তুলে এনে তখন যমুনাতীরে কবর দেওয়া হয়। গড়ে তোলা হয় সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ।

আসল কথায় আসি। বতুতা যখন সদলে দিল্লিতে পৌঁছলেন, সুলতান তখনও রাজধানীতে ফেরেননি। প্রধান নকিব তাঁদের প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। সেখানে অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন উজির খাজাজাহান স্বয়ং। তিনি তাঁদের নিয়ে গেলেন হাজার উস্তান বা স্তম্ভ নামক সুলতানের বিশাল দরবার কক্ষে। সেখানে সুলতানের সিংহাসনের সামনে মাটি পর্যন্ত মাথা নুইয়ে কুর্নিস করলেন উজির। দেখাদেখি বতুতাও সদলে তাই করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষকরা জোর ধ্বনি তুলল, বিসমিল্লাহ! বতুতার কথা, সেখান থেকে আমাদের নিয়ে আশা হল বাদ-উদ-হারাম-এর দরজায়। ওদের ইঙ্গিতে আমরা আবার ঘোড়া থেকে নামলাম। প্রধান কাজি কামালউদ্দিন বুরহান ছিলেন সেখানে। তাদের দেখাদেখি ওই ফটকেও আগত হলাম আমরা। আবার নাবিকরা বলল- বিসমিল্লাহ। আমাদের সঙ্গে অনেক উপহার ছিল। ফটকের সচিব সেগুলি নিয়ে নথিভুক্ত করল। তখন ভিতর থেকে কয়েকজন কর্মচারী এল। কাজির সঙ্গে আস্তে আস্তে কী সব কথা হল তাদের। তারপর প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিয়ে

গেল তারা। ফের এলেন, কী কথা হল, আবার তারা ভিতরে গেল। এবার আমাদের বসতে বলা হল। এলো ভিতর থেকে নানা রকম খাবার। সোনায় মোড়া মণিমাণিক্য-খচিত সব পাত্র। খাবারে হাত দিতেই নাকি আমত হল। আবারও ঘোষক চেঁচিয়ে বলল— বিসমিল্লাহ। তারপর খাওয়া। শেষে এলো সুগন্ধী তাম্বুল। আমরা তা মুখে দিতেই ঘোষক বললে— বিসমিল্লাহ। এবার এলো আমাদের জন্য সোনা বসানো রেশমি পোশাক। বিসমিল্লাহ বলে আমাদের প্রধান তোরণে এগিয়ে দিলেন তাঁরা। তারপর ভূমিস্পর্শ করে তোরণে আগত হলেন। আমরাও তাই করলাম। তারপর কিছু কর্মচারী সঙ্গে দিয়ে আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল শহর-প্রান্ত পালামে, আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িতে। সেখানে গিয়ে আমরা তাজ্জব। প্রচুর ফল-মিষ্টি-মাংস আমাদের রাতের খাবারের জন্য মজুত। ভেলভেট-রেশমে মোড়া অপূর্ব মোলায়েম সব শয্যা। কর্মচারী জানালেন, এসব হল সুলতান জননী মুকদুমা-ই জাহানের ব্যবস্থাপনা।

পরদিন প্রাসাদে গিয়ে কাজির সঙ্গে দেখা করতেই তিনি দুটি টাকার থলে দিলেন বতুতাকে। প্রত্যেকটিতে দু-হাজার টাকা। এটা নাকি আপাতত হাতমুখ ধোয়ার খরচা। খাদ্য সামগ্রী তো অঢেল আসতে লাগলো পালামে। বতুতা, সুলতান জননীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে কুর্নিস করে আসেন। কিছু উপহারও দিলেন। বিনিময়ে সুলতান জননীও দুহাত ভরে উপঢৌকন দিলেন। এখানে উল্লেখ্য, সুলতান জননী অন্ধ ছিলেন। পুত্রের সিংহাসন আরোহণের দিন আলো আর রত্নভবনের জেল্লায় নাকি তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আর শত চিকিৎসাতেও সে দৃষ্টি ফিরে পাননি।

ইতিমধ্যে খবর এলো সুলতান ফিরে আসছেন। দিল্লির সাতমাইল দূরে তলবতে তাঁর ছাউনি পড়েছে। বতুতাকে সেখানে এগিয়ে গিয়ে সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে পরামর্শ দিলেন উজির। উট, ঘোড়া, খুরসাজের ফল, কিসমিস, তুর্কিস্থানের মেষ, মিশরের তরবারি আর বেশ কিছু ক্রীতদাস-দাসী সঙ্গে নিয়ে গেলেন সুলতানকে নজরানা দেওয়ার জন্য। সুলতানের তাঁবুতে তখন বিরাট জমায়েত। একে একে মান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় সাঙ্গ হলে, বতুতার তলব পড়ল। নকিব তাঁকে নিয়ে গিয়ে সুলতানের সামনে কুর্নিস করল। বতুতার উপহারগুলি দেওয়া হল কর্মচারীদের হাতে। তার তালিকা দেখে সুলতান হাসলেন। বতুতাকে পরিচয় করানো হল— 'মৌলানা বদরুদ্দিন' বলে। সুলতান করমর্দন করলেন। পার্শিতে বললেন, তোমাদের পরে খোদার ফজ্‌ল নাজেল হোক। কোনও ভয় নেই। আমি এমন সব সুখসুবিধা দেবো যা আর কোথাও পাওনি।

এরপরে খানাপিনার ইলাহি মজলিশ বসে। তিনি প্রাসাদে দেখা করতে বললেন বতুতাকে। সুলতানের রাজধানীতে প্রবেশের রাজকীয় জমক দেখে বিস্মিত বতুতা। স্বর্ণ, রৌপ্যখচিত রেশমি পোশাকসজ্জিত হাতি ঘোড়ার শোভাযাত্রার মধ্যে রাজপতাকা, রাজছত্র শোভিত সুলতান এগোচ্ছেন। পথের দুপাশে বাঁধা মঞ্চ থেকে চলছে মেয়েদের বন্দনাগান। শোভাযাত্রার সামনে, কামানের মতো পাথর ছোঁড়া যন্ত্র দিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হলো দিনার, মোহর। গরিবরা নিচ্ছে কুড়িয়ে। এদিকে সুলতান জননীও পুত্রের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনে লক্ষ দিনার বিলিয়ে দিলেন তোরণে উপস্থিত গরিবদের মধ্যে।

পরদিন শুক্রবার সকালে সুলতান প্রাসাদের পরিষদ ভবনে এসে বসলেন। রাজপুরুষেরা একে একে দেখা করলেন। দেশীয় মান্যবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎকার শেষ হলে ডাক পড়ল বিদেশিদের। সুলতানের পায়ের কাছে স্তূপীকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টাকার থলে। তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী এক একজনকে এক এক রকম থলে তুলে দিচ্ছিলেন। বতুতাকে যে থলেটি দেওয়া হলো তাতে ছিল পাঁচ হাজার দিনার।

কয়েকদিন পর সুলতানের কাছ থেকে দুজন লোক এলো বতুতার কাছে। তারা বলল, সুলতান জানতে চেয়েছেন, কী চাকরি অতিথিরা চায়— উজিরৎ (মন্ত্রী), কিতাবৎ (সচিব),

মহম্মদ বিন তুঘলকের হাতে চুম্বন করছেন ইবন বতুতা। বার্ট সিলভারম্যানের আঁকা তৈলচিত্র

ইমারৎ (শাসক), কাজি (বিচারক), তাবরিল (অধ্যাপক), মসিখৎ (অতিথিশালার পরিচালক)। এর মধ্যে যেকোন চাকরি করতে পারে, পছন্দমতো।

কিন্তু ইবন বতুতার সঙ্গীদের অধিকাংশই তখন ঘরে ফেরার জন্য আকুল হয়ে উঠছে। চাকরি নিয়ে বিদেশে থাকতে চায় না। দু-একজন মাত্র রাজি হল। বতুতার অবশ্য আরও কিছুকাল এখানে থাকবার ইচ্ছে হলো। সে নিজের পছন্দের কাজির চাকরি নিতে রাজি হলো। বিকেলে, প্রাসাদের ছাতে বসেছিলেন সুলতান। সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো বতুতাকে। সুলতান তাঁকে দিল্লির কাজির নিয়োগনামা দিলেন। বেতন বার্ষিক বারো হাজার দিনার। অর্থাৎ টাকার হিসাবেও মাসিক এক হাজার টাকা। সেই সঙ্গে সমপরিমাণ রাজস্বের জায়গির দান করলেন দিল্লির লাগোয়া অঞ্চলে। আর নগদ বারো হাজার টাকা দিলেন কাজ শুরুর আগে হাত খরচার জন্য।

সুলতানি ঈদ

কাজির কাজের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, সুলতানের কাণ্ডকারখানা, নানাবিধ সুলতানি জাঁকজমক ইত্যাদির বর্ণনার মধ্যে দিল্লির সুলতানি ঈদ-উৎসবের এক তুলনাহীন বর্ণনা দিয়েছেন বতুতা। এখানে তা তুলে ধরছি:

ঈদ আর বকর দুটি ঈদ উৎসব এই নগরীতে যা হয় তার তুলনা কোথাও নেই। বকর ঈদে সুলতান বর্শা ছুঁড়ে একটা উট জবাই করেন। তাছাড়া ঈদের সঙ্গে বকর ঈদ-এর বিশেষ ফারাক নেই। ঈদের বর্ণনাটাই দেওয়া হলো। মোট সাতদিন ধরে এই উৎসব চলে। উৎসবের আগের দিন নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য সুলতান মণিমুক্তা খচিত রেশমি বা মেষের পশমের পোশাক পাঠিয়ে দেন।

সারা শহরই নতুন সাজে সজ্জিত হয় এদিন। নতুন পতাকা উড্ডীন হয় প্রাসাদশীর্ষে। সুলতানের নিজস্ব ছিল ষোলটি হাতি। হাতিশালা থেকে সেগুলিকে বার করে, গা মেজে, স্নান করিয়ে, মণিমাণিক্যে বোনা রেশমি পোশাক পরানো হয় সেগুলিকে। হাতির ওপর হাওদাও থাকবে অমনি সোনা আর মখমলে মোড়া। ওপরে সুলতানের নিজস্ব রাজছত্র। সেও রত্নখচিত। ছাতার বাঁটগুলিও নিখাদ সোনার। এর মধ্যে পছন্দ মতো একটিতে সুলতান নিজে উঠবেন। সামনে চলবে ক্রীতদাসের দল। তাদের মাথায় সোনার ফেজ। কোমরে সোনার কটিবাঁধা। তাদের সামনে নাকিব। সোনার টুপি মাথায়, কোমরে সোনার বেল্ট, হাতে স্বর্ণদণ্ড। সুলতান ছাড়া অন্য হাতিগুলিতে ওমেন, ইরাক, ইরান, খুরসান, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি পশ্চিমের মেহমানরা। প্রধান বিচারপতি বা কাজিও উঠবেন হাতিতে। এভাবে প্রায় শ'তিনেক লোকের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা প্রাসাদ তোরণে পৌঁছলেই, সেখানে অপেক্ষমাণ বিরাট সেনাবাহিনী প্যারেড শুরু করবে। ভিন্ন ভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পতাকা। সুলতান এগোতেই, পিছনে বাজনা-বাদ্যসহ সেনাবাহিনী এগোতে থাকবে। সুলতানের আত্মীয় পরিজন অবশ্য সুলতানের পরেই স্থান পাবে। শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমা করে পৌঁছবে জুমা মসজিদে। সেখানে ইমাম প্রার্থনা পরিচালনা করবেন। তারপরে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন।

এদিকে দৌলতখানা, রেশমি কাপড়, গোলাপ, জেসমিনে সাজানো থাকবে। বিকেলে সেখানে বসবে ঈদ-দরবার। তার প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে এখানে ওখানে রেশমি কাপড়ে তৈরি হবে কৃত্রিম গাছ। তার নিচে নিচে সোনায় মোড়া আসন। মাঝখানে সুউচ্চ মঞ্চে বসানো হবে সুলতানের স্বর্ণ-সিংহাসন। এগারো হাত লম্বা, ছয় হাত চওড়া এই সিংহাসনটি পুরোপুরি সোনায় ঠাসা। ফলে এতো ওজন যে চারটে অংশে ভাগ করে বয়ে আনতে হতো। তার ওপরে রেশমি গদি দিয়ে তিনদিকে তাকিয়া রেখে সুলতানের বসার ব্যবস্থা হত। সিংহাসনের ওপরে রত্নখচিত রাজছত্র। সুলতান এসে আসন গ্রহণ করলেই বিসমিল্লাহ্ ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়। কাজি, খতিব, উলেমা, সইদ ইত্যাদি এবার বসবেন। তারপরে বসবেন সুলতানের ভাই, শ্যালক, জ্ঞাতিবর্গ। তারপরে দূরে বসবে ক্রীতদাসরা।

এবার গম্বুজের মতো সোনার প্রকাণ্ড ধুনুচি এনে বসানো হবে মাঝখানে। তাতে পুড়বে সুগন্ধী কাঠ, গুগ্গুল, তিমির তেল। সুগন্ধে ভুরভুর করবে দরবার। সোনা-রুপোর পাত্রে করে সবার মাথায় ছিটানো হবে পুষ্পনির্যাস। সর্বশেষে বিরাট ভোজ। জমির মালিকেরা, স্বর্ণদিনার এনে সুলতানের পায়ের কাছে ভেট দেবে। সেগুলি রাখা হবে প্রকাণ্ড সোনার পাত্রে। তারপর সুলতান সেই থেকে ইচ্ছে মতো বিলি করে দেবেন।

পরের দিনের উৎসবে সিংহাসন বদল হবে। সেও সোনার, তবে অতো বড় নয়। এদিনের প্রধান আকর্ষণ নাচ, গান ও সুন্দরী দানপর্ব। ওবছর যেসব হিন্দু (কাফের) রাজা সুলতানের কাছে পরাজিত হয়েছে তাদের বন্দিনী কন্যারা নাচবে, গাইবে ওই আসরে। সুলতান মান্যগণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে তাদের বিলি করে দেবেন। তারপরের দিনে আসবে সাধারণ হিন্দু বন্দিনীরা। তারাও নাচবে গাইবে। এদের দিয়ে দেওয়া হবে সুলতানের আত্মীয়দের মধ্যে। তৃতীয় দিনে হয় সুলতানের আত্মীয়দের শাদির অনুষ্ঠান। চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের মধ্যে কিছু বাছাই করে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হত। ষষ্ঠ দিনে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের মধ্যে শাদির ব্যবস্থা করতেন সুলতান নিজ ব্যয়ে। আর উৎসবের শেষে সপ্তম দিনে চলতো মুক্ত হস্তে দান খয়রাতি। এভাবেই সাঙ্গ হত সুলতানি ঈদ।

দান খয়রাতি, দুহাতে দিনার বিলি, এসব যে তিনি সব সময় খুব হিসেব করে করতেন, তা নয়। এসবই তাঁর খেয়ালি চরিত্রের প্রকাশ। বতুতাও ছিলেন খুব অমিতব্যয়ী। তাই বিচারকের আসনে বসেও ঘুষ নিতে কসুর করতেন না বলে স্বীকার করেছেন। তবু তাঁকে ঋণ করতে হতো। একবার দৌলতাবাদের পথে সুলতানের তাঁবুতে বতুতাও ছিলেন। খবর পেয়ে পাওনাদাররা এসে হল্লা জুড়ে দেয়। সুলতান ব্যাপারটা জানতে পেরেই, নিজেই ওদের টাকা মিটিয়ে দেন।

সুলতানের বীভৎস রূপ

যে খেয়ালবশে তেজি স্ফূর্তির বন্যা বইয়ে দিতে পারতেন, দুহাত ভরে ছড়িয়ে দিতে পারতেন গরিব-দুঃখীদের জন্য স্বর্ণদিনার, সেই খেয়ালবশেই সামান্য কারণে হত্যা করতে পারতেন যেকোন ভালো লোককে। রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে পারতেন প্রাসাদ তোরণে। ইবন বতুতা স্মরণ করছেন, প্রথম যেদিন সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে প্রাসাদে আসেন, প্রধান ফটকের কাছাকাছি এসেই তাঁর ঘোড়া চিঁহি-চিঁহি, চিৎকারে লাফ দিয়ে তাঁকে সুদ্ধু উল্টে ফেলে দেবার উপক্রম। কী ব্যাপার? সামনে তাকিয়ে বতুতা দেখেন রক্তে ভাসছে ফটকের সামনেটা। তার মধ্যে লুটোচ্ছে দু-তিনটে সদ্যকাটা মুন্ডু ও ধড়।

ক্রমে এরকম বীভৎস দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যান তিনি। জানলেন, সুলতান চান, কোনও লোককে শাস্তি দিতে হলে তা প্রকাশ্যে হলে অন্যেরা সাবধান হবে। তাঁর শাসনে প্রতিদিনই বেশ কিছু লোকের গর্দান যেতো। আর তাদের মুন্ডচ্ছেদ করা হতো প্রকাশ্যে, প্রধান তোরণে। এজন্য, তোরণের পাশেই যেমন প্রহরী থাকত, তেমনি থাকত জল্লাদেরা। তোরণ কখনও শুকনো বা খন্ডিত দেহ ছাড়া দেখেননি বতুতা। অবশ্য কোনও কোনও অপরাধীকে প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কেটে রাখা হতো। মৃতদেহ তিনদিন ওভাবেই থাকতো।

সুলতানের বৈমাত্রেয় ভাই মাসুদ খানের নির্মম হত্যাকাণ্ডও দেখেছেন ইবন বতুতা। মাসুদের মা ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিনের মেয়ে। এই মহিলার নামে চারিত্রিক অভিযোগ এনে তাঁকে বন্দী করা হয়। বন্দীদশায় তিনি

অপরাধ স্বীকার করেন। অবশ্য সুলতানের শাসনে একবার কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে তার নিষ্কৃতি নেই। প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার বাদে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা ছিল। এই জিজ্ঞাসাবাদ ছিল আসলে নির্মম অত্যাচার। যতোদিন পর্যন্ত অভিযোগ স্বীকার করা না হচ্ছে, নিয়মিত চলবে ওই রকম জিজ্ঞাসাবাদ।' এর হাত থেকে মৃত্যুই শ্রেয় মনে করে প্রায় সকলেই অভিযোগ স্বীকার করতো। এই মহিলা তা করেন। না, অভিযোগ স্বীকার করলেই ক্ষমা পাবে এমন কথা ভাবা ভুল। অপরাধীর ক্ষমা নেই সুলতান তুঘলকের শাসনে। সুলতান আলাউদ্দিনের কন্যাকে তখন প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে নিয়ে গিয়ে মাথায় পাথরের ঘা মেরে মেরে হত্যা করা হয়। ঠিক তার দু'বছর পর মাসুদের বিরুদ্ধে এলো রাজদ্রোহের অভিযোগ। সেও অপরাধ স্বীকার করে। তার মাকে যেখানে পাথর মেরে দু'বছর আগে হত্যা করা হয়েছিল ঠিক সেইখানে নিয়ে গিয়ে তার মুন্ডচ্ছেদ করা হল। তারপর তিনদিন ফেলে রাখা হলো সেখানে সেই কাটামুন্ডু আর ধড়। অথচ ওই তরুণ মাসুদ এতো সুন্দর ছিল দেখতে যে সুলতান নিজেই বলতেন সারা দুনিয়ায় এমন সুপুরুষ আর নেই। নিজের ভাগনে বাহাউদ্দিনের গর্দান নিয়ে সারা শরীর কুচিকুচি করে কেটে পাত্রে ভরে তার ঘরের স্ত্রী-পুত্রদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিরিয়ানি খেতে।

শেখ শিহাবুদ্দিন ছিলেন উচ্চ বংশজাত। তার দাদুর নাম অনুসারে খুরসানের নাম হয়। সৎ ধার্মিক প্রকৃতির এই শিহাবুদ্দিনকে, সুলতান তাঁর অধীনে চাকরি দিতে চাইলে সে প্রত্যাখ্যান করে। কী! এত সাহস? তার দাড়ি উপড়ে ফেলা হল। তারপরে সাত বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া হলো দৌলতাবাদে। সাত বছর পরে তাকে নিয়ে এসে ফের রাজস্ব বিভাগের দেওয়ানের পদ দেন সুলতান। অনেক তোয়াজ করে তাঁকে রাজিও করালেন। তারপর সুলতান অযোধ্যার কাছে নদী তীরে নতুন স্বর্গদ্বার প্রাসাদ তৈরি করে সেখানে নিয়ে যেতে চাইলেন শিহাবুদ্দিনকে। সে গেল না এবং চাকরিই ছেড়ে দিল। সুলতান শুনলেন, শিহাবুদ্দিন নাকি বলেছে যে অত্যাচারী সুলতানের নোকরি সে করবে না। ডেকে জানতে চাইলেন, একথা কি সত্যি? শিহাবুদ্দিন বললে— হ্যাঁ। ব্যাস, মুন্ডু গড়িয়ে পড়ল তার।

এক জুরি ছিলেন ওঁর অধ্যাপক। নাম আসিরাউদ্দিন। অনাবৃষ্টির সময় তাকে ডেকে বললেন সুলতান— কুয়ো কেটে দিন। সে তা করেনি। সুলতান এর কারণ জানতে চাইলে সে বলল, চারদিকে হাহাকার, একটা কুয়োয় কী হবে?

কী হবে, কী হবে না, সে ভাবনা সুলতানের। আপনার নাক গলানোর দরকার নেই —বলে, কারাগারে ঢুকিয়ে দিলেন নিজের অধ্যাপককে। কারাগারবাসের পর সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। অপর দুই পরিচিত জুরি তার কথা জানতে চাইলে সে বলল, বাঁচালে বাবা অত্যাচারীর হাত থেকে।

এ খবর কী করে পৌঁছল সুলতানের কাছে। তিনজনকেই তিনি বন্দী করে আনলেন। ওই জুরি দুজন সাক্ষ্য দিল, হ্যাঁ খোদাবন্ধ, ও আপনাকে অত্যাচারী বলেছে। প্রাণদণ্ড হলো অধ্যাপকের। অপর দুজন চলে যাচ্ছিল। তাদের ডেকে বলা হলো— তোমাদেরও মুন্ডচ্ছেদ হবে। শুনে তারা কেঁদে ফেলল, আমরা তো আপনার নিন্দা করিনি জাঁহাপনা। সুলতান বললেন, তাতে কী, আমার নিন্দে কানে শুনে চুপ করে হজম করেছো তো।

ইসলামের রীতি অনুযায়ী সকলের ওপর নামাজ পড়ার নির্দেশ ছিল। সে নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে একবার তিনি একই দিনে নিজস্ব সৈন্যবাহিনীর সাড়ে তিনশ বীরকে প্রাণদণ্ড দেন। রক্তে ভেসে গেল প্রাসাদতোরণ। না, এতে মনে কোনও বিকার উপস্থিত হয়নি সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের।

তুঘলকের নিযুক্ত কাজিরাও সুলতানের মর্জি বুঝে রায় দিতেন। কিন্তু বতুতা বলছেন, তাঁর হতো অস্বস্তি। এরকম অনেক মামলাই তিনি শারীরিক অজুহাত দেখিয়ে হস্তান্তর করে দিতেন অন্য কাজিকে। মালোয়ার রাজধানী ধারার একটি কাহিনী শুনিয়েছেন তিনি। এখানকার উজির ছিলেন খাঁজাজাহান। খবর এলো তাঁর ভাইপো বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়েছে। উজির তাঁর ভাইপো সহ সন্দেহভাজন সকলকে চালান দিলেন সুলতানের কাছে। কয়েকজন আমিরও ছিলেন ওই বন্দীদের মধ্যে। একে একে সবার গর্দান নেওয়া গেল। উজিরের ভাইপোর পালা এলে সুলতান কী ভেবে উজিরকেই ব্যবস্থা নিতে বললেন। ছোকরা ভাবল, চাচা হয়তো জানটা বাঁচিয়ে দেবে তার। কিন্তু সুলতানের উজির সুলতানের মর্জি বুঝে তার তো প্রাণদন্ড দিলেনই, বরং আরো বীভৎসভাবে সে কাজ সাঙ্গ করার নির্দেশ দিলেন। প্রকাশ্য বধ্যভূমিতে আনা হলো তাকে। চারদিকে সান্ত্রির প্রহরা, মাঝখানে নিয়ে আসা হল এক জল্লাদ হাতিকে, চারিদিক লোকারণ্য। মৃত্যুপথযাত্রী তরুণ সেই হাজার-হাজার লোকের মধ্যে কাকে যেন খুঁজছিল চোখ দিয়ে। দেখা গেল ওই ভিড়ের মধ্য থেকে এক সুন্দরী তরুণী এগিয়ে আসতে চেষ্টা করছে তরুণটির কাছে। সে জানালো সে ওই তরুণের প্রেমিকা, একবারটি যেতে চায় কেবল তার কাছে। হুকুম মিলল। সারা নগরীর হাজার

শীতে আমরা বরফ বিক্রি করি
গরমে করি ফুল

Endeavour TOURS

Authorised booking Agent of
Sikkim Govt. Hotel

'সিকিম নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন সিকিম পর্যটনের প্রাক্তন অফিসার শ্যামলকুমার ভৌমিক। তাঁর সংস্থা 'এন্ডেভার ট্যুরস' সিকিম স্পেশ্যালিস্ট'

NORTH SIKKIM PACKAGES

Available Daily

1N /2 Days (Yumthang) - 1600/- per head.
2N /3 Days (Yumthang, G-Dongmar) - 3200/- per head.
3N /4 Days Available for exclusive package only.

Hotel & Resort of Sikkim

Gangtok	— Hotel	Resort
Ravangla	— Hotel	Resort
Pelling	— Hotel	Resort
Rumtek	—	Resort
Borong	—	Resort
Namchi	— Hotel	Resort
Biksthang	—	Resort
Rinchenpong	— Hotel	Resort
Kaluk	— Hotel	Resort
Hee	— Hotel	Resort
Bermiok	— Hotel	
Chayataal	—	Resort
Uttarey	— Hotel	Resort
Yoksom	— Hotel	Resort
Okhrey	— Hotel	
Versay	— Hotel	

BHUTAN Phuntsholing, Thimpu, Paro, Punakha
ANDHRA Vizag, Araku, Hyderabad
ORISSA Puri, Bhubaneshwar
WEST BENGAL Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Rishyap, Dooars
Weekend Tours Mandarmoni, Bakkhali, Digha, Sankarpur, Tajpur.
Contact for: Family Packages, Transport, Sikkim Silk Route Tour.

TAAB Member TAAB

Contact:

S. K. Bhaumik
Swati Bhaumik
1, Indra Roy Road, Bhawanipur
Opp. Indira Cinema, Kol-700025.
Ph: (033) 2486-0583, 98364 64632
98311 07246, 98303 06159
Email: endeavourtour@yahoo.co.in
Website: www.endeavourtour.net

TREKS & TOURS

সমগ্র লাদাখ (৮/১৫/২০ দিন) 26/5, 16/6, 27/8,13/10
কৈলাস ও মানস (গাড়িতে/হেলিকপ্টারে) May to Sept.
মুক্তিনাথ / সমগ্র নেপাল 17/3, 1/4, 20/10, 26/10
অরুণাচল 5/5, 13/10
উত্তর ও পূর্ব সিকিম 21/4, 14/10
লাহুল স্পিতি, কিন্নর 18/9
দামোদর কুণ্ড (নারায়ণ শিলা দর্শন) হেলিকপ্টারে May to Sept.
লাসা, রংবুক ও বেজিং (গাড়িতে/হেলিকপ্টারে) May to Sept.
সমগ্র কুমায়ুন (৩৭টি স্থান) 8/12
লাক্ষাদ্বীপ (৩/৭টি দ্বীপ) Oct. to Apr.
নাগাল্যান্ড ও মণিপুর / মিজোরাম ও ত্রিপুরা 3/2, 3/3, 17/11

ট্রেকিং: কালাপাথর, ফোকসুমদো লেক, ল্যাংট্যাং, গৌসাইকুণ্ড, এরাউন্ড অন্নপূর্ণা, অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প, আদি কৈলাস, মিলাম, পিণ্ডারি, মণিমহেশ, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস, পঞ্চচুল্লি, রূপকুণ্ড

কর্পোরেট, অফিস, স্কুল, কলেজ অথবা ফ্যামিলি যে-কোনও ধরণের গ্রুপ, ট্যুর প্যাকেজ প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা করা হয়।

9, Lalbazar Street, Marcantile Building, 1st Fl. Block-E, Kolkata-700001
37, Deshpran Sasmal Road, Howrah-1
Web: www.treksandtours.com
E-mail: treksandtours@gmail.com
9433073745 ● 2119-9000
9432369253 ● 2643-9253

citius adventures

MANAS SAROVAR (Via Nepal)
Group Departures -
07th May, 2013 / 14th May, 2013 / 19th May, 2013.
₹117000/- (Kathmandu to Kathmandu)
15 Nights 16 Days.

EVEREST BASE CAMP
Group Departures - 10th April, 2013
₹60200/-(Kathmandu to Kathmandu)
13 Nights 14 Days.

SANDAKPHU TREK
Group Departures - 19 January,2013.
₹13100/- (NJP to NJP).
5 Nights 6 Days.

DZONGRI & GOECHALA TREK
Group Departures - 14 April, 2013
₹30400/- (NJP to NJP).
10 Nights 11Days.

PAPSURA & DHARAMSURA BASE CAMP TREK
Group Departures - 1 June, 2013
₹26777/- (Manali to Manali)
09 Nights 10 Days.

PINDARI & KAFNI GLACIER TREK
Group Departures - 10 May,2013
₹15000/- (Kathgodam to Kathgodam)
09 Nights 10 Days.

125, Rashbehari Avenue. Kolkata - 29
email us at : adventures@citiusinfo.com
Contact us at +919874044084 I +919007176258

হাজার নরনারীর সামনে লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়ে সেই প্রেমিকা ছুটে গেল তার প্রেমিক ওই যুবকের কাছে। কয়েক মুহূর্ত জলভরা চোখে দুজনে দাঁড়িয়ে রইল মুখোমুখি। তারপরই দু'জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল দু-জনের বুকে। গাঢ় অন্তিম আলিঙ্গন। চতুর্দিক শ্বাসরুদ্ধ এদৃশ্যে। ইসলামি দুনিয়ায় এরকম দৃশ্য কল্পনাতীত। হঠাৎ প্রধান সাত্রীর ইঙ্গিতে যন্ডামার্কা দুটো লোক ঝটকা মেরে ছিনিয়ে নিল তরুণটিকে। ছুঁড়ে ফেলে দিল হাতিটার পায়ের কাছে। হাতিটাও উন্মত্ত বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। কয়েক মুহূর্ত আগে দয়িতার আলিঙ্গনে যে বক্ষ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, সেই বুক পা দিয়ে গুঁড়িয়ে দিল জল্লাদ-হাতি।

পরদিন সকালে খবর এলো, ওই তরুণী গতরাতেই কুয়োর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

এবার উজিরের সম্মতিতেই ওদের দুজনেরই মৃতদেহ পাশাপাশি শুইয়ে দেওয়া হলো। ওই যুগল কবরের নাম গোর-ই আশিকন, লাভার্স গ্রেভ।

দিল্লি-দৌলতাবাদ

অত্যাচারী বলে, সামনে বলতে না পেরে লোকে চিঠিতে গালিগালাজ করে পাঠাতো সুলতানের কাছে। সুলতানের চিঠি অন্য কেউ খুলত না। ওই চিঠি তিনি যতো পড়েন, ততো তাঁর মাথায় রক্ত চড়ে যায়। ফলে একসময় তিনি ক্ষ্যাপাটেই হয়ে যান। তাঁর ধারণা হল দিল্লির সব লোক পাজি। সবাইকে ভিটেমাটি ছাড়া করতে হবে। হুকুম দিলেন, তিনদিনের মধ্যে সবাইকে দিল্লি ছেড়ে দৌলতাবাদে যেতে হবে। প্রাচীন দেবগিরিই দৌলতাবাদ। আর অন্যান্য শহরের লোকদের আহ্বান জানালেন দিল্লি এসে বসবাস করতে। তেমন কেউ এলো না। এদিকে প্রাণভয়ে দিল্লির লোক যে যেখানে পারে, পালাতে থাকল। ঘরে ঘরে তল্লাসি চালাল সুলতানের দাস। শেষ পর্যন্ত তারা ধরে আনল এক অন্ধ আর এক খঞ্জকে, ওরা পালাতে পারেনি। হুকুম হলো, পাথর ছোড়া কামানে খঞ্জটাকে ঢুকিয়ে গোলার মতো দাগানো হোক। তাই হলো। ছাতু-ছাতু হলো তার দেহ। আর অন্ধকে ঠ্যাঙ ধরে টেনে টেনে নেওয়ার নির্দেশ হলো। শেষ মেষ অন্ধের ওই ঠ্যাঙখানাই কেবল দৌলতাবাদে পৌঁছয় বলে জানিয়েছেন বতুতা।

যাহোক, দৌলতাবাদে মারাঠি তরুণীদের রূপে মুগ্ধ হয়েছেন বতুতা। তাদের আয়ত চোখ, 'তিল-ফুল-জিনি-নাশা' নাক, এবং প্রণয়লীলার শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন তিনি। একটি গাইয়েদের বাঈজী বাজারও দেখেছেন তিনি। প্রশংসা করেছেন এখানকার হিন্দুদের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের চরিত্রের। যা হোক, দৌলতাবাদ জমেনি। এবং ফেরত আসতে হয়েছিল তুঘলককে।

সুলতানের মর্জি বুঝে সর্বদা তাঁকে খুশি রাখতে চেষ্টা করতেন বতুতা। যখনই সুলতান তাঁকে কোনও প্রিয় বাক্য বলতেন সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেশীয় সহবৎ অনুযায়ী, বতুতা তাঁর ডানহাত চুম্বন করতেন। এতে ভারি খুশি হতেন সুলতান। তাঁর কাছে নিত্য নতুন বন্দিনী হিন্দু তরুণী ভেট পাঠাতেন। সন্ধ্যার আড্ডায় ডেকে পাঠাতেন।

যোগীদের কান্ড

সুলতান হিন্দু যোগীদের খুব খাতির করতেন। তারা আগে ভাগে বিপদের খবর দিতে পারে। তুকতাক করে বিপদমুক্ত করতে পারে। অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী তারা। এক সন্ধ্যায় বতুতা ডাক পেয়ে, সুলতানের খাস কামরায় হাজির হয়ে দেখেন বেশ কয়েকজন যোগী নিয়ে আড্ডা হচ্ছে। বতুতা যেতেই, সুলতান একজন যোগীকে বললেন, এ আমার বিদেশি মেহমান। একটা কিছু দেখিয়ে দাও তো, যা ও কোনোদিন ভুলবে না।

বতুতা দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে এক যোগী ধীরে ধীরে শূন্য মার্গে উঠে, স্থির হয়ে শূন্যে ঝুলতে থাকলেন। পরে আর এক যোগী মন্ত্র পড়ে কাঠের পাদুকা ছুঁড়ে আঘাত করে তাঁকে নামান। বতুতা এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে যান। জল-হাওয়া করে তাঁকে সুস্থ করা হয়। অমন খেলা আর তিনি দেখতে চাননি।

তবে সুলতানের মেজাজকে সব সময় তাঁর পক্ষেও শরিফ রাখা সম্ভব হয়নি। ওই শান্তিপ্রাপ্ত শিহাবুদ্দিনের সঙ্গে তিনি একবার দেখা করেছিলেন। সুলতান খবর পেয়ে রেগে যান। তাকে গৃহে নজরবন্দী করেন। এতে দুঃখ পেয়ে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিনরাত কোরানপাঠ করতে লাগলেন বতুতা। ক'দিন পরে দূত মারফৎ এই খবর পেয়ে নজরবন্দী তুলে নিলেন সুলতান। তবে কিছুদিনের মধ্যে তাকে বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। বললেন, আপনি ভ্রমণ ভালোবাসেন, আমার দূত হয়ে চীনে যান। রাজি হলেন বতুতাও। কিছুদিন আগেই চীনের সম্রাট বহু উপঢৌকন সহ দূত পাঠিয়েছিলেন সুলতানের কাছে। সুলতান দিলেন তার চাইতেও বেশি সামগ্রী। একশো সুসজ্জিত ঘোড়া, কাফেরদের (হিন্দু) মধ্য থেকে বাছাই করা একশো পুরুষ বান্দা, একশো নর্তকী গায়িকা, প্রতিখানি শত দিনার মূল্যের, একশো সুতির কাপড়, একশো রেশমী বস্ত্র, একশো

কাশ্মিরী গরম পোশাক, একশো আলোয়ান, বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র, সুগন্ধী সামগ্রী। বতুতাকেও দুহাতভরে যাওয়ার খরচ ও বহু সঙ্গী দিয়ে জাহাজের পথে পাঠিয়ে দিলেন সুলতান।

সেকালে কালিকট থেকে চীনগামী জাহাজ ছাড়ত। কালিকটকে ইবন বতুতা বর্ণনা করেছেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দররূপে। এখানে এসে তিনি যে বড় চীনা জাহাজটি দেখলেন, তাতে সুলতানের দেওয়া মালপত্র তোলা গেলেও তরুণী বাঁদীদের জন্য পৃথক কেবিন নেই। বতুতা বললেন, বাঁদী ছাড়া কোথাও আমি চলি না। অতএব ওই জাহাজ বাতিল। অন্য ছোট জাহাজের ব্যবস্থা হলো। তাতেও বতুতার নিজের থাকার উপযুক্ত কেবিন নেই। ফলে মালপত্র, সঙ্গী ও কিছু বাঁদীকে তাতেই তুলে দিয়ে তিনি তাতে তার উপযোগী কামরা তৈরি করিয়ে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করলেন। কালিকটে হিন্দু রাজার অতিথি হয়ে কিছুদিন কাটিয়ে, যেদিন যাত্রা করবেন, তার আগের রাতে সামুদ্রিক ঝড়ে তাঁর সব কিছু তচনচ হয়ে গেল।

বতুতার একবার মনে হল, সুলতানের কাছে ফিরে গিয়ে এই বিপর্যয়ের কথা জানাবেন। কিন্তু সুলতানের মেজাজের কথা ভেবে এসব তাঁকে না জানানোই শ্রেয় মনে করলেন। কালিকটে এভাবে তিনমাস কাটিয়ে কিছু অর্থসংগ্রহ করে, আরো কিছু সংগ্রহের আশায় এবার আশপাশের কয়েকটি রাজ্য, দ্বীপ সফরে বের হলেন। মালাবার, সিংহল, মালদ্বীপ ঘুরে ঘুরে পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম এবং সোনারগাঁও পর্যন্ত এলেন। ফের ফিরে গেলেন কালিকট। এবং নানা রাজ্যের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ভরে, এখান থেকে চীন যাত্রা করেন। ওই সময়কার অভিজ্ঞতার সামান্য কিছু বিশেষ করে মালদ্বীপের কথা তুলে ধরছি।

মালদ্বীপ

মালদ্বীপ বলতে একটা বা দশ, বিশ, একশো দুশো দ্বীপ নয়, বতুতার হিসাবে দুহাজার দ্বীপের সমষ্টি এই মালদ্বীপপুঞ্জ। প্রবাল দিয়ে গড়া, যেন নীল সাগরের বুকে রক্তপ্রবালের মালা ভাসছে। পর্যটক সুলেহমান অবশ্য সংখ্যাটা সঠিক করার চেষ্টা করে বলেছেন, ঠিক দুশো নয় এক হাজার নয়শো। বতুতার আন্দাজের কাছাকাছি। কিন্তু মার্কোপোলো কী বললেন? মোট নাকি বারো হাজার সাতশো দ্বীপ, কিছু কি এর জলে ডোবে ও ভাসে? হিসাবের গোলমালের কারণ হয়তো সেইটেই। কারণ মালদ্বীপ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বিশেষ উঁচু নয়। এমনকি এক বিংশ শতকে এই দ্বীপপুঞ্জের কোনও চিহ্ন থাকবে কি না তা নিয়েই বিশেষজ্ঞরা ভাবিত। যা হোক, আমরা

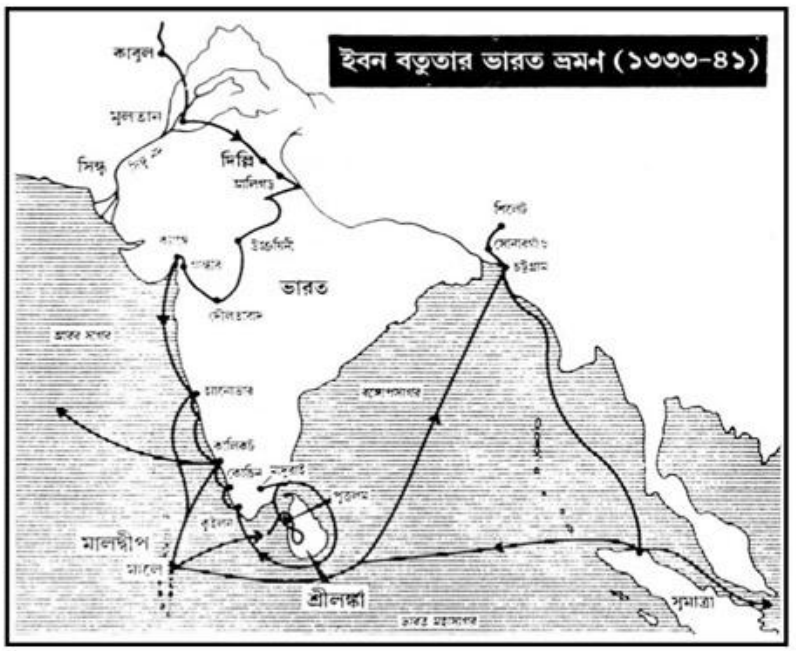

এখানে ইবন বতুতার কথায় ফিরে যাই।

জাহাজ একেবারে দ্বীপাঞ্চলের ভিতরে যেতে পারে না। গায়ে গায়ে দ্বীপ, তাকে ঘিরে ঘিরে পরিখার মত জলধারা। এক দ্বীপের গাছের শাখা অন্য দ্বীপের বৃক্ষশাখাকে আলিঙ্গন করে। এ দ্বীপের ছেলে স্নানে নেমে ভাব জমায় ও দ্বীপের কন্যার সঙ্গে। চলাচলের জন্য ছোটছোট কাঠের ডিঙি-নৌকো চলে নারকেল শাখায় মর্মর তুলে। বড় দ্বীপ মালেতে যেমন অনেক লোক, তেমনি কোনো দ্বীপ নির্জন-প্রায়। জাহাজ ভিড়তেই ছোট ছোট কাঠের নৌকো নিয়ে এগিয়ে এলো দ্বীপের মেয়ে-পুরুষ। কাছে আসতেই দেখা গেল পুরুষেরা নগ্নপ্রায়। মেয়েদের কোমর থেকে হাঁটু অবধি আব্রু আছে। ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন। হাতে তাদের নারকেল আর পান। কী ব্যাপার? জানতে পারলেন বতুতা, নবাগতদের মধ্যে যার যাকে পছন্দ তাকে ডাব-পান দিয়ে ঘরে নিয়ে যাবে মেয়েরা। ঘরে, মানে বাইরের ঘরের গোসাঁইজি নয়। একেবারে অন্দরের কেষ্ঠঠাকুরই করে রাখবে। এঘরে সব কিছুতে তোমার তখন অধিকার। এই মেয়েদের তুমি ইচ্ছে মতো ভোগ করতে পারো, তা নিয়ে কেউ নিন্দে মন্দ করবে না। তবে উচ্চবংশীয়েরা দিগা এবং বীনা নামে দু-ধরনের বিয়ের অনুষ্ঠান

করেই সে সব করে। এজন্য অবশ্যই কোনো দায় নেই। তুমি চলে আসবার সময় ওদের সঙ্গে নিয়ে যাবার দায় নেই। কারণ এই দ্বীপের মেয়েরা কোনও অবস্থাতেই বাইরে যাবে না। পিছনে কেউ কোচার কোনো ধার টেনে কেঁদে বলবে না— 'আমাকে ফেলে কোথায় চললে প্রিয়তম'। অতএব, দ্বীপ ছেড়ে আসার সময় ঝাড়া হাত-পা পর্যটক সেজে বেরিয়ে আসা যায়। তবে সেই ফেলে আসা রমণীরা না কাঁদলেও তাদের জন্য সারা জীবন মন কেমন করে, ইবন বতুতারও করেছে। তিনি লিখেছেন সেবায়, সঙ্গদানে, সঙ্গমে এমন আরামদায়ক নারী আমি আর কোথাও পাইনি জীবনে। দিল্লির সুলতানের কাজি ছিলেন বতুতা। এখানেও শাসনকর্তা আছেন, অতএব সহজেই কিছুদিন আরাম খাবার মতো কাজির চাকরি জোটাতে তাঁর অসুবিধে হল না। তখন মালদ্বীপ শাসন করছিলেন এক নারী, নাম খাদিজা। সুলতান জালালউদ্দিনের মেয়ে। অতএব বাংলাদেশের নাতনি। খাদিজার আব্বাজান জালালউদ্দিন ছিলেন বাংলার সুলতান সালাউদ্দিনের ছেলে।

কাজির চাকরি নিয়ে প্রথমেই তিনি মেয়েদের উর্ধ্বাঙ্গ আবৃত করে চলাফেরার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। নগ্নগাত্রেই তারা পথে ঘাটে, হাটে বাজারে ঘুরে বেড়াতো। কাজের খোঁজে তারা বাড়িতে আসত। বলত, যদি পাঁচ দিনার পর্যন্ত পায়, তাহলে আগের মালিকের কাছে থেকে মুক্ত হয়ে জনাবের কাছে থাকতে পারে। এত সহজলভ্য বলে, ধনী ব্যক্তিদের কারো কারো হারেমে এরকম পঁচিশজন পর্যন্ত রমণী দেখেছেন তিনি। নিজেও তিনি এরকম রমণী নিয়েছেন। তিনি দেখেছেন, এরা ভারি সেবাপরায়ণা। নিজেদের হাতে রান্না করবে, কাছে বসে খাওয়াবে, উচ্ছিষ্ট সাফ করবে। জল এনে স্বামীর হাত-পা ধুয়ে দেবে। পরে শয্যাতে তাঁকে শুইয়ে, প্রথম তার হাত-পা টিপে দেবে। তারপর যা হবার হবে।

বতুতার ভাষায় 'বেশ কয়েকটা শাদি হলো এখানে'। এই মালদ্বীপেই ইবন বতুতা বিয়ের কথা বললেন। অন্য দ্বীপ বা দেশগুলিতে কেবল আছে 'সম্ভোগের' কথা। কিংবা রমণী ক্রয় করার কথা। যেমন চট্টগ্রামে এসে এক দিনারে একটি সুন্দরী ক্রয় করে নেন। এত শস্তায় সুন্দরী আর তাঁর দীর্ঘভ্রমণে কোথাও দেখেননি।

চট্টগ্রাম থেকে ফেরার পথে আরাকান উপকূলে বরাকার নামে এক দ্বীপে উঠেছিলেন। সেখানে দেখেন, মেয়েদের কেবল উর্ধ্বাঙ্গই নয় নিম্নাঙ্গও নগ্ন। কেবল স্থানবিশেষে গাছের পাতা দিয়ে ঢাকা। এরা নারীপুরুষ পথ চলতে পাশের বৃক্ষছায়ে বিশ্রামই শুধু করে না, বিশ্রম্ভনও করে। পথ পাশেই এরকম আলিঙ্গনাবদ্ধ নরনারী তিনি দেখেছেন। সুযোগ পেয়ে নিজেও ভোগ করেছেন।

চট্টগ্রামে গিয়ে বতুতা খুব বেশি দিন কাটাননি। কারণ সেখানে সুমাত্রার একটি জাহাজ নোঙর করেছিল এবং সেই জাহাজে উঠেই সুমাত্রা যাত্রা করেন তিনি। ফলে খুব বেশি সাদি (বিবাহ) করার সেখানে সুযোগ পাননি তিনি। কিনেছিলেন একটিমাত্র অতীব সুন্দরী ক্রীতদাসী, যার নাম ছিল 'আজুরা'। এর জন্য তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছিল মাত্র ১ দিনার। এই ১ দিনারের মান তখন ছিল ৮ দির্হামের সমান এবং ১ দির্হাম বলতে বোঝাতো ২ আনা। তৎকালীন চট্টগ্রামের বাজারদর সম্পর্কেও বেশ কিছু তথ্য দিয়ে গেছেন বতুতা। তখন ১ দিনারে ওখানে পাওয়া যেত ২৫ র‍্যাটল (ratl) চাল। ১ র‍্যাটল তখন পরবর্তীকালের ১৪ সেরের সমান। তখন তিনজনের একটি পরিবারে বার্ষিক জীবিকা নির্বাহের খরচ ছিল ১ টাকা (১৬ আনা) বা জনপিছু ৫ আনা ৪ পাই। কিন্তু এটাও তখন অনেক বেশি। কারণ ওই সময়ে নাকি ওইসব অঞ্চলে জবরদস্ত মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল। যার ফলে একজন সাধারণ চাষীকে একটি দুধেল গরু কিনতে দাম দিতে হত ৩ দিনার। চারটি মুরগির দাম হয়ে গিয়েছিল ১ দির্হাম এবং ওই ১ দির্হামে তখন ১৫টির বেশি পায়রা পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি মাত্র ১৪ সের ঘির জন্য তখন দাম দিতে হচ্ছে ৪ দির্হাম, অর্থাৎ ৮ আনা। দুমূর্ল্যের বাজারই বটে!

স্বর্ণদ্বীপ

স্বর্ণদ্বীপ বা শ্রীলঙ্কার রাজপ্রাসাদে গিয়ে তো তাঁর চক্ষুস্থির। বতুতা বলেছেন, তার নাম আরিয় সকরবর্তী (আর্য চক্রবর্তী?)। দেখেন, মেঝেতে ফরাস বিছিয়ে বহুলোক মুক্তো ঝাড়াই বাছাই করছে। এতো মুক্তো? রাজা বললেন, আমারই ভেড়িতে ওর চাষ হয়। এতো মুক্তো আর কোথাও দেখেননি?

বতুতা বললেন, দেখেছি, তবে এতো নয়, আর এতো বড়ও নয়। শুনে রাজা খুশি। বাছাই করা বড় বড় মুক্তোগুলি দুহাতে আঁচল ভরে তাঁর কোলে দিলেন। বললেন, যতো ইচ্ছে নিন। নীল কাপড়ে মুক্তো বেঁধে তিনি এখান থেকে এলেন কুনোয়ারে। এখানেও এসে দেখেন মণিমুক্ত ছড়ানো। এক একটা রুবি যেন মুরগির ডিমের আকার। একটা শ্বেতহস্তির গলায় সাতটা রুবি ঝুলছে।

শ্বেতহস্তির কথা শুনলেও, আগে কখনও দেখেননি বতুতা। এই দুর্লভ সুন্দর জীবটির গলায় রুবি ঝুলবে না? দাস মেয়েরা পর্যন্ত এখানে রুবির জাল বুনে মাথায় পরে।

বানরের কান্ড

এখানকার বানরের কান্ড দেখে তাজ্জব বতুতা। রাজ্যময় বানর। বনেও থাকে, শহর জনপদেও থাকে। সর্বত্র অবাধ বিচরণ, অধিবাসীরা সম্মান করে বানরদের। তবে বানররা, নর রাজার বদলে মান্য করে বানর রাজাকে। একটি নেতা বানর বোধহয় ওদের রাজা, সে মাথায় পাতার মুকুট পরে। তার হাতে সর্বদা রাজদন্ডের মতো থাকে কোনও গাছের ডাল। বনের মধ্যে কোনও ফাঁকা জায়গায় বানররাজের সভা বসে। রাজার দুপাশে দু-দুটো করে চারটে বানর সভাকালে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। রাজার পাশে এসে বসে বানর-রানী। রাজার সামনে ওরা সব কলা-মুলো-ভেট রাখে, রাজা অল্প নিয়ে বাকিটা বিলিয়ে দেন। তারপর নিজেদের মধ্যে কী সব কিচির-মিচির কথা শেষে সভা ভঙ্গ হয়।

এমনিতে ওরা বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ, ভদ্র। তবু তরুণী রমণীদের দেখলে আর ভদ্রতা থাকে না ওদের। এক গৃহস্থ বাড়ির ঘটনা বর্ণনা করেছেন বতুতা। একটা বানর তাদের পরিবারে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। গৃহস্থের তরুণী কন্যা তাকে আদর করে খেতে দিত। এক দিন তার মেয়ে একা একটা কামরায় শুয়েছিল। বানরটা ঢুকেই ভিতর থেকে খিল দিয়ে দেয়। মেয়েটির আর্ত চিৎকারে দরজা ভেঙে বাড়ির লোক হতভম্ব। বানরটা তার মেয়ের ওপরে ঠিক মানুষের মতো বলাৎকার করছে। না, মেয়েটিকে সে আঁচড়ায়নি বা কামড়ায়নি। এমনি সব কাহিনীর পর কাহিনীতে ঠাসা তাঁর আল রিহলা।

কিন্তু প্রশ্ন, কেন বেরিয়েছিলেন বতুতা এই ভ্রমণে। তাঁর গোড়ার দিকের উক্তিগুলিতে মনে হবে আল্লার নাম করে মক্কার পথে তিনি বেরিয়েছিলেন, পরে তাঁর ইচ্ছে হলো আল্লাহ-তাল্লার ফজল নাজেল হওয়া ইসলামিক দুনিয়াটা দেখবেন। শেষে দেখেন, পূর্ণ জীবন সম্ভোগ করে ফিরে যাচ্ছেন। পথে পা দিয়েছিলেন কুমার হিসাবে। কিন্তু আলেকজন্দ্রিয়ায় পৌঁছেই কেঁদে ফেললেন। কতো লোকের কতো সঙ্গী-সঙ্গিনী, আমার কেন নেই। এই অনাত্মীয় পরিবেশে ওঁকে কাঁদতে দেখে এক সওদাগরের দয়া হলো। সে আদর করে ওঁকে ত্রিপোলিতে নিয়ে গেল। এক বিচারকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিল বতুতার। এটা তাঁর, স্বীকৃতিতে প্রথম বিবাহ। অবশ্য দুজনের মধ্যে কাজিয়ায় এ বিয়ে বেশিদিন টেঁকেনি। তার পরে পথে পথে আর একাকী থাকেননি, রাস্তায় রমণী পেয়েছেন, ভোগ করেছেন। কখনও শাদি, কখনও সম্ভোগ। একেবারে যুবরাজের মতো জীবন। তাই পর্যটক সম্পর্কিত ঐতিহাসিকেরা ইবন বতুতাকে বলেন— দ্য প্রিন্স অফ ট্রাভেলার্স।

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

স্পা ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

সমগ্র হিমাচল এবং লে-লাদাখ। যাত্রার তারিখ আপনার। নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের। ন্যূনতম ২ জন। Mobile: 94748-00233/91637-91788. E-mail: spatourandtravels@gmail.com

ডুয়ার্স naturecamp travels

গরুমারা, জলদাপাড়া, চিলাপাতা, বক্সা, রায়মাটাং, জয়ন্তী, বিন্দু, ঝালং, রকি-আইল্যান্ড, সামসিং সহ সমগ্র ডুয়ার্সে হোটেল, গাড়ি ও প্যাকেজ। গরুমারাতে নিজস্ব রিসর্ট। Call : 98744-39571, 84204-63611.

কনকাঞ্জলি ট্যুরিজম

মধ্যপ্রদেশ, নৈনিতাল, হরিদ্বার, দিল্লি, আগ্রা, বেনারস, হিমাচল, কাশ্মীর, গ্যাংটক, ডুয়ার্স, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, চাঁদিপুর, বকখালি, গোপালপুরের সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, আন্দামান ও অরুণাচল হোটেল ও প্যাকেজ। 98304-32868. www.kanakanjalitourism.com, 7, B. B. Ganguly St.

আপনি কি সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণে ইচ্ছুক ?

আপনি কি বাঙালি আতিথেওতায় ও বাঙালি পরিবেশে, ও বাঙালি খাবারের স্বাদে কাশ্মীর ভ্রমণ করতে চান? তবে চলুন ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর— ডিলাক্স কাশ্মীর (হাউসবোট সহ ১১ দিন) ১৩,৫০০ টাকা, পাতনিটপ ও বৈষ্ণোদেবী সহ কাশ্মীর ১২ দিন) ১১,০০০ টাকা, অমৃতসর সহ জম্মু-কাশ্মীর (১৪ দিন) ১২,৫০০ টাকা। আমাদের বিশেষ আকর্ষণ জম্মু-জম্মু টেলারমেড প্যাকেজ (আহারাদি বাদে) ৫,০০০ টাকা, আহারাদি সহ ৯,৫০০ টাকা (৯ রাত ১০ দিন) বুকিং করতে যোগাযোগ করুন: ভ্রমণ পিয়াসী ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস: 90627-27906/98830-15720.

পরিযায়ী ট্যুরস এন ট্রাভেলস

Tailor Made Package-এ চলুন হিমাচল প্রদেশ, কুমায়ুন, গাড়োয়াল হিমালয়, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, সিকিম, উত্তরবঙ্গ, কাশ্মীর, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তর ভারতে। সারা ভারতে হোটেল বুকিং করা হয়। Doors-এ সারাবছর special প্যাকেজ। কাশ্মীর 10/5, 24/5, 7/6 (M): 99036-93756.

Swaraj Tour & Travels

কাশ্মীর (14500/-) 28/03, 11/04, 20/5. কিন্নর লাহুল স্পিতি (16500/-) 28/5, 16/6 ভুটান (12500/-) 28/3, 6/4, 22/5. চিতওয়ান সহ নেপাল (11,500/-) 22/3, 22/4, 22/5. অরুণাচল সহ মেঘালয় আসাম (15,800/-) 17/4, 22/5. দার্জিলিং ও শিলং-এ নিজস্ব হোটেলের গ্রীষ্মকালীন বুকিং শুরু হয়েছে। 7A, Rani Rashmoni Rd., Kol-13, 1st Floor, Room No. 110, 94330-54015, 98310-84798 & (033) 3020-7220. সারা ভারতে সর্বত্র হোটেল, প্যাকেজ বুকিং করা হয়।

Kumaon Tour 50% Off

Visit Kumaon with us through Hotel Uttarakhand Kausani, www.uttarakhandkausani.com & Hotel Milam Inn Munsiyari, www.milaminn munsiyari.com Please cont.: 05962-258012, 094129-24222, 096908-82006.

প্যাকেজ ট্যুর

সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

কাশ্মীর (১৪ দিন) মধ্যপ্রদেশ (১২ দিন) হিমাচল (১০ দিন) ডুয়ার্স (৫ দিন) লাভা-লোলেগাঁও (৭ দিন) সিকিম (৯ দিন) প্যাকেজ। ৩, ম্যাঙ্গো লেন, ১ম তল, কলকাতা-১। Ph: 033-2262-2820/1849, (M): 098308-50105.

শান্তিনিকেতন ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস

সুন্দরবন প্যাকেজ IN/2D@2,500/- 2N/3D@3,500/-. ডিলাক্স প্যাকেজ 2N/3D@ 4,500/-, শর্তাবলী প্রযোজ্য। দার্জিলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, চারখোল, পেডং, বিন্দু, ঝালং, মূর্তি, লাটাগুড়ি সহ ডুয়ার্স। 98305-29628/99030-64928.

TSC ভ্রমণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ভারতের সর্বত্র হোটেল ও বেড়ানোর সবরকম ব্যবস্থা, air, rail-eticket, পাসপোর্ট সহায়তা করা হয়। Sr. Citizen-দের বিশেষ ব্যবস্থা। Trael Solutions and Consultancy. 43/1, Block-A, Bangur Avenue, Kol-55, Ph: 98307-38885/98310-95512/033 2574-6122.

হ্যাপি হলিডে ডেস্টিনেশন (9874690699)

এবার বসন্তে জঙ্গলে বাঘ দেখতে কানহা (5000/-) সুন্দরবন (3,500/-) থাকা, খাওয়া, সাফারি সমেত, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, ডুয়ার্স। সর্বত্র হোটেল বুকিং বসন্তে শান্তিনিকেতন, গোয়া-এক্সক্লুসিভ প্যাকেজ, (জেলাভিত্তিক/কলকাতা/ বুকিং এজেন্ট প্রয়োজন)।

Crews Tourism Pvt Ltd

নিজস্ব প্যাকেজ— কাশ্মীর 10, 20, 31/3, 15, 28/4, 8,19, 26/5, 2/6 সিমলা মানালি 15/4, 18, 26/5, 3/6 কেরালা 25/1, 4/2 নৈনিতাল 9/3, 16/4, 19, 27/5 কেদারবদ্রী 19, 26/5, 2/6 ভুটান 9,17/3, 20, 27/4, 11/5 লে লাদাখ 19, 26/5, 2/6. Ph: (033) 4001-6660, 86979-82878.

কাশ্মীর 1250/- প্রতিদিন

কাশ্মীর বৈষ্ণোদেবী অমৃতসর 19, 26/4, 10/5, 7/6 (14 দিন) সিমলা কিন্নর লাহুল স্পিতি 11/4, 9/5, 6/6 ভাইজ্যাগ আরাকু 24/2 কুমায়ুন নৈনিতাল আলমোড়া বিনসর 12/4, 10/5, 7/6 প্রয়াগে কুম্ভ স্নান 15, 25/2, 8/3 @5,500/- আন্দামান 1,350/- (জনপ্রতি) গোয়া 3N/4D (3 Star রিসর্টে) 6,700/- (ন্যূনতম ৮ জন যে-কোনও দিন যে-কোনও প্যাকেজ)। S. S. Travels Wings, 64 B B Ganguly St. 2nd floor, Kol-12, 96740-28866. E-mail: sstravelwings@gmail.com সারা ভারত হোটেল ও গাড়ি বুকিং।

Welcome-এর গ্রীষ্মের ভ্রমণ

কাশ্মীর— মানসবাল, উলার হ্রদ, রাজ-পারিয়া অরণ্য, ডাকসাম, আহরবাল, দাচিগ্রাম অরণ্য, আরুভ্যালি, সোনমার্গ, হ্যাজিবোস গ্লেসিয়ার, যুসমার্গ, পহেলগাঁও, শ্রীনগর। লাদাখ— লে, নুব্রাভ্যালি, খারদুংলা পাস, প্যাংগং লেক, চাংলা পাস, সুমোরিরি লেক, সিন্ধু নদ। জোজিলা পাস, দ্রাস, কারগিল, জাঁকসা— সারচু উপত্যকা সহ সমগ্র লাদাখ। অরুণাচল মেঘালয় কাজিরাঙা 2, 9, 16/4, কাশ্মীর 6, 25/4, 10, 26/5, 12/6. 98310-15846, 97482-97852, 93332-10664 (কৃষ্ণনগর), 91437-95260 (বিরাটি)। সারা ভারতের সর্বত্র হোটেল, প্যাকেজ, গাড়ি বুকিং করা হয়।

প্যাকেজ ট্যুর

Itinerary Planner

Hotel and Family Package booking For Gangtok, Ravangla, Pelling, Rinchenpong, Kaluk, Juluk, Okhrey, Versey, North Sikkim Package. *Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Rishyap, Dooars. *Bhutan, Orissa, Himachal, Uttarakhand, Rajasthan and Kerala. Contact: 98303 06159/(033)2486 0583. www.itineraryplanner.net

নৈনিতালের একমাত্র বাঙালি ট্রাভেল এজেন্সি

SUNITI TOUR & TRAVELS

সমগ্র কুমায়ুনে হোটেল/ গাড়ি/ বাস ও Carbett সাফারি বুকিং করা হয়। এছাড়া কুমায়ুন প্যাকেজ Nainital (2N) Jaggeswar (1N) Patal Bhubaneswar/ Chaukari (1N) Munsiary (2N) Kausani (1N) Covering Almora, Ranikhet, Baijnath. যাত্রা 22/3, 12/4, 24/5. যোগাযোগ: H. O. The Mall, Nainital, 05942-220402, (M): 098972-09933, 094519-45541. কোল বুকিং: AD 287, Rabindra Pally, Kestopur, Kol 101, (M): 98301-10177, 98745-26617, 94330-72131. Web: www.suniti travels.com, Email: little_sparrow88@yahoo.com

NORTH EAST TRAVELS

নিজস্ব হোটেল: রিশপ, লাভা, লোলেগাঁও, চারখোল, কোলাখাম, গ্যাংটক, পেলিং, উত্তরে, বার্মিওক, কালুক ও জয়পুর। ভিতরকণিকা, কানহা, বান্ধবগড়, কাজিরাঙা, করবেট ও গরুমারা ও জলদাপাড়া প্যাকেজ ট্যুর। এপ্রিল মাসে পাখি দেখতে কাকড়াগাদ, মে মাসে কক্সা কিন্নর প্যাকেজ ট্যুর। পশ্চিম সিকিমে গাড়ি ও হোটেল বুকিং। সিল্করুটে হোটেল ও গাড়ি বুকিং। ১১ ডোভার লেন, কলকাতা-২৯, 94745-94446, (033) 4004-5082.

Excursion2India

আপনার সাধের জায়গায় আপনারই সাধ্যের মধ্যে ভ্রমণের সমস্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার জন্য যোগাযোগ করুন। ভারতের যে-কোনও জায়গার হোটেল, গাড়ি অথবা টেলরমেড প্যাকেজ বুকিংয়ের যোগাযোগ: 91635-80464, 94393-65707, www.excursion2india.com

New Eye India Travels

রাজস্থান/ কেরল/ বম্বে গোয়া/ সাউথ ইন্ডিয়া/ ভাইজ্যাগ-আরাকু-হায়দ্রাবাদ/ সিকিম/ ডুয়ার্স। এছাড়া কমপক্ষে ৮ জনের জন্য যে-কোনও দিন যে-কোনও প্যাকেজ। 6, C. R. Avenue, Kol-72, (033) 6459-7052, 97487-56954, 98365-84017, 99034-16136.

Sylvan Tours & Travels

প্রতিদিন সিকিমি (NJP থেকে কমপক্ষে 6 জন) কাশ্মীর/সিমলা মানালি/ নেপাল/ গোয়া/ নৈনিতাল 23/2, 1, 23/3, 16, 17, 25/4, 3/5. Sujit: 98301-56212 / 94334-09706. 7, C. R. Avenue, Laha Paint House, Kol-72. www.sylvantravels.com

ভ্রমণবার্তা

হোটেল রিসর্ট

Season 4

ভূস্বর্গ কাশ্মীরে জানাই সাদর আমন্ত্রণ— জম্মু-কাশ্মীর সরকার অনুমোদিত বুকিং সংস্থা সঙ্গে বেসরকারি সেরা হোটেল বুকিংয়ের বিরাট আয়োজন। জম্মু, শ্রীনগর, শোনমার্গ, গুলমার্গ, পহেলগাঁও, পাটনীটপ, হাউসবোট ও পছন্দ অনুযায়ী গাড়ির ব্যবস্থা। Ph: 98308-77017/90510-13413.

Season 4

অচেনা, অদেখা ভিন্ন স্বাদে হিমালয়। নামচি, হি-বার্মিওক, উত্তরে, ভার্সে, আরিটার, সিলারিগাঁও, পেডং, জুলুক, নাথাং, লুংথাং-এ হোটেল ও গাড়ির ব্যবস্থা। Ph: 98308-77017/90510-13413.

Season 4

শিব ঠাকুরের আপন দেশে— কল্পা, সাংলা, সারাহান, রামপুর, সোলাং, সিমলা, মানালি, কুলু, ধরমশালা, ডালহৌসি, খাজিয়ার, চাম্বায় সরকারি ও বেসরকারি হোটেল ও গাড়ির ব্যবস্থা। Ph: 98308-77017/90510-13413.

Season 4

মরুভূমির নৃত্যাঙ্গনে ও হাভেলির ঘুঙুরের শব্দে রাজস্থান সরকার অনুমোদিত বকিং সংস্থা সঙ্গে সেরা ও বাছাই করা হোটেল বুকিং। পছন্দসই গাড়ি ও বিশ্বস্ত গাড়িচালক। জয়পুর, আজমির, পুস্কর, উদয়পুর, যোধপুর, মাউন্ট আবু, জয়সলমির ও বিকানির। Ph: 98308-77017/90510-13413.

Season 4

কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গোয়া, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য স্থানের সরকারি ও বেসরকারি হোটেল বুকিং এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী লে-লাদাখ, আন্দমান ও বাংলাদেশ ঘোরার ব্যবস্থা। Ph: 98308-77017/90510-13413.

Season 4

সপ্তাহান্তে সুন্দরবন, মন্দারমণি, দিঘা, তাজপুর, বিহারীনাথ, ধুতুরদহ, পঞ্চলিঙ্গেশ্বর, ইটাচুনারাজবাড়ি, গড়পঞ্চকোট, মুকুটমণিপুর, শান্তিনিকেতন, গালুডি, ডুয়ার্স। Ph: 98308-77017/90510-13413.

ECO VILLAGE GUEST HOUSE

হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে কয়েকদিন গ্রামবাংলায় মনোরম পরিবেশে কাটিয়ে আসতে পারেন। চারশয্যাবিশিষ্ট ঘর, ভাড়া ৮০০ টাকা। Home Stay & Guest House. যোগাযোগ করুন গৌর সুরের সঙ্গে। 98301-27925, (033) 2694-0509.

লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, কালিম্পং

লাভা (ইয়াংকি রিসর্ট) লোলেগাঁও (সোনাখাড়ি) রিশপ (ইয়াংকি রিট্রিট) কালিম্পং (টুস)- বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: ৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা-১। Ph: (033) 2262-1849/98308-52068. www.hotelatpuri.com

হোটেল রিসর্ট

Villa Tours & Travels

হিমাচল (প্যাকেজ- 9/3, 17/5, 25/5, 7/6/13) উত্তরাখণ্ড, কাশ্মীর (প্যাকেজ- 16/4/13) সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, লে-লাদাখ 21/6 (19 দিন)। নিজস্ব হোটেল: মানালি, সাংলা, কল্পা, সারাহান। Ph: 2231-8019/98303-71744. 98301-89778, 94338-13678.

Parijayee Tours 'N' Travels

পুরীতে-আমাদের নিজস্ব হোটেল Blue Sea. ডুয়ার্স-Taskers Den, Green Touch Resort (Gorumara) (Jaldapara) Acacia Eco-Resort. দার্জিলিং-Hotel Zodiac গ্যাংটক- Hotel Green Park. সারা ভারতে Hotel Booking করা হয়। আমাদের Offbeat প্যাকেজ- Kolakham, Charkhole, Pedong, Rishi, Aritar, Silarigaon, Zuluk, Singtam, Kaffer, Rikkisum, Damsang, Fagu Tea estate, Tinchule. 60B, Chowringee Road, Kol-20, 033 3262-5588, 99036-93756, 84201-96053. Web: parijayeetnt.com

পাইন ব্রুক গেস্টহাউস-শিলং

সমস্ত রুম অ্যাটাচড, গিজার, এল সি ডি, ডাইনিং/কনফারেন্স হল, রুম সার্ভিস, রেস্টুরেন্ট। প্রবাসে বাঙালিয়ানা বিনোদনের শ্রেষ্ঠ ঠিকানা। স্কুল-কলেজ-অফিস-কনফারেন্স প্রভৃতির জন্য ট্রাভেল এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: 98310-89453 (কলি), 094369-85858 (শিলং)।

Estuarine ভিলেজ রিসর্ট, ভিতরকণিকা

জঙ্গলের বাফার এলাকায়, বাহ্মণী নদীর তীরে আধুনিক সুবিধাযুক্ত ৫টি কটেজ ও ৭টি টেন্ট-এ থাকার সুব্যবস্থা। গ্রুপ বুকিং ও ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ ছাড়। ২ থেকে ৪ দিনের প্যাকেজ অথবা রুম বুকিংয়ের যোগাযোগ: 91635-80464, 94393-65707. www.villageresort.in

গোবিন্দ রিসর্ট (পুরী)

পুরীর সমুদ্র থেকে ১ মিনিট দূরে, মার্বেলে মোড়া, বাঙালি খাবার, সঙ্গে কর্মীদের আতিথেয়তা। ডবল বেড 800/- থেকে 1,000/-, A. C. 1,500/-, Colour T.V, Balcony, ব্যানার্জিদা: 98310-39240, মানব: 98043-29990.

Naik Palace

পুরীর সমুদ্র থেকে সামান্য দূরত্বে, মার্বেলে মোড়া, বাঙালি খাবার, সঙ্গে কর্মীদের আতিথেয়তা। ডবল বেড 800/- – 1,200/-. A C 1,500/-, Colour TV, Balcony. ব্যানার্জিদা: 98310-39240, মানব: 98043-29990.

গ্যাংটক, পেলিং, দার্জিলিং

হোটেল মেরু (গ্যাংটক) সিকিম অরোরা/টুরিটো (পেলিং) হোটেল জেডিয়াক/ মার্বেল ইন্টারন্যাশনাল (দার্জিলিং) তৎসহ রাবংলা, উত্তরে, রিংচিংপঙ, লাচুন, লাচেন, আরিতার হোটেল বুকিংয়ের ব্যবস্থা। কিল বুকিং: (033) 2262-1849/2820, 98308-50105/99033-11361.

ডুয়ার্সের জঙ্গল

হোটেল সোনালি/ড্রিমল্যান্ড/অর্কিড রিমট গ্রিন ক্যাসেল— একগুচ্ছ হোটেল লাটাগুড়িতে বুকিং-এর যোগাযোগ: সোনালি ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস। ৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা-১। Ph: 033-2262-1849/2820, 98308-52068/99033-11361.

গ্রীন ভ্যালি

কৈলাশ মানস গাড়িতে 19/5, 17/6, 16/7, 15/8, 13/9 @99,999/- চারধাম ১৫ দিন @13,750/-, সন্দকফু ট্রেকিং ৭ দিন @6,750/- Ex. NJP. 94330-95271, 98369-54365.

হোটেল রিসর্ট

গ্রীষ্মের ছুটিতে আপনার পছন্দসই ঠিকানা

আপনার সাপ্তাহিক ছুটি, গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা আছি আপনার পাশে সর্বত্র— পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, শান্তিনিকেতন, হরিদ্বার সহ সমগ্র হিমাচল, কুমায়ুন, ডুয়ার্স, সুন্দরবন, ভাইজাক - আরাকু, হোটেল/গাড়ি প্যাকেজ)। ভ্রমণ পিয়াসী ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেল: 90627-27906/98830-15720.

দীপ রিসর্ট

পুরীর সমুদ্রসৈকতে আপনার নিজস্ব ঠিকানা: সমুদ্রমুখী এ সি ডিলাক্স রুম/কটেজ, রঙীন টিভি, টেলিফোন, রেস্টুরেন্ট— বুকিংয়ের জন্য Call করুন: 2262-2820, 98308-52068.

HOTEL ZODIAC, DARJEELING

5 minuites walking distance from Mall, Colour TV, Telephone, Carpet, Restaurant. All rooms are Veiw-Booking: 2262-1849/99033-11361.

সমগ্র জম্মু-কাশ্মীরে নিজস্ব হোটেল/গাড়ি

শ্রীনগর (ডাললেক ও ডালগেটের সন্নিকটে), পহেলগাঁও (লিডার নদীর ধারে ও চন্দনবাড়ি রোডে), পাতনিটপ সহ সমগ্র জম্মু-কাশ্মীরে নিজস্ব বাঙালি পরিচালিত হোটেল/ গাড়ি ও বাঙালি খাবার উপভোগের একমাত্র ঠিকানা: ভ্রমণ পিয়াসী ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস: 90627-27906/98830-15720.

UTOPIA

আমাদের নিজস্ব হোটেল সোনামারি রিসর্ট (রিশপ) সিলভান স্টে (রিশপ), বাদলথিণা রিসর্ট (দমনপুর বক্সা টাইগার রিজার্ভ) 2N/3N বনদপ্তরের অতিথিনিবাসে (রামসাই, বিচাভাঙা, কালিপুর, ধূপঝোড়া) কাটাতে পারেন। যেতে পারেন চিলাপাতার গহন অরণ্যে, নল রাজাদের গড়ে। সাউথ খয়ের বাড়িতে। এছাড়া রিশপ, শিলারিগাঁও, রিশিখোলা, আরিপং, জুলুক, কুপুপ, নাথাং— যে-কোনও দিন যে-কোনও সময়-যতখুশি যেতে পারেন। 134B, S. P. Mukherjee Rd, Kol-25, 2463-5553, 98304-07707, 90518-77727. সারাবছর আকর্ষণীয় ডুয়ার্স প্যাকেজ।

রাখী গেস্টহাউস, উদয়পুর সী-বিচ

পশ্চিমবঙ্গে অন্তিমপ্রান্তে ওড়িশার সমুদ্র পকুলে আপনার নিজস্ব ঠিকানা-নন এসি রুম, রেস্টুরেন্ট, টিভি-বুকিং: সোনালি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস, 2262-1849/99033-11361/ 98369-52052.

মা তারা ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস

নিজস্ব হোটেল: সিমলা-রিজভিউ, মানালি-প্রশান্ত, ডালহৌসি-কাস্টি রিসর্ট। ডালহৌসি ভিউ, গ্যাংটক সম্রাট রিজেন্সি। হিমাচল, কাশ্মীর ও গ্যাংটকের হোটেল, গাড়ির ব্যবস্থাপনায় specialist। 4, N. S. Rd, Kol-1, (M): 98306-36372, 98365-47731, 098160-76929.

Shilavilla Resort Pvt Ltd

কলকাতা থেকে ১ ঘণ্টায় সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশে বিলাসবহুল রিসর্টে ছোট্ট ছুটি কাটাতে সপরিবারে আসুন। সুবিধা-এ সি/নন-এ সি, সুইমিং পুল, ইন্ডোর গেম, গার্ডেন। কনফারেন্স রুম ও Fishing-এর সুবিধা। www.shilavilla resort.com, 98301-63896/98362-29187.

অনুরূপ ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

গ্রীষ্ম প্যাকেজ: কাশ্মীর ১৩,০০০/-(১৪) সিমলা ১০,৫০০/-(১১), কেদার ১২,০০০/- (১৩) নৈনিতাল ১২,৫০০/-(১৩)। নেপাল ১০,৫০০/- (১০)। সারা ভারতে হোটেল বুকিং। 98304-1135. কিস্তিতে ভ্রমণের সুযোগ।

ভ্রমণবার্তা

হোটেল রিসর্ট

হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা-পেলিং

নিউ হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডের কাছে বাঙালি পরিচালিত হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা। ঘরে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে অনুভব করুন। উপভোগ করুন বাঙালি আতিথেয়তা ও বাঙালি খাবার। রুম ভাড়া ৭০০-১,২০০ টাকা। পেলিং থেকে অন্য জায়গায় থাকা ও sight seeing করা হয়। সন্তু চৌধুরী 93397-30148.

হোটেল গেস্টহাউস বুকিং

প্যাকেজ: দিঘাতে থাকা+খাওয়া 2N/3 days 800/- জনপ্রতি। পুরীতে থাকা+খাওয়া (4N/5 days) + sight seeing (by CAR) 2,800/- জনপ্রতি। পুরীতে থাকা+খাওয়া 400/- জনপ্রতি। দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং থাকা+খাওয়া 650/- জনপ্রতি। (M): 98313-80562/80131-59604.

কাশ্মীরে হোটেল/প্যাকেজ/গাড়ি

LINKAGE জম্মু, শ্রীনগর, পাটনিটপ, পহেলগাঁও, গুলমার্গ, শোনমার্গ সহ সর্বত্র আপনার সময় ও পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন বাজেটের হোটেল, গাড়ি ও প্যাকেজ। Ph: 2265-8999, 2227-6685, 98301-52169.

Crews Tourism Pvt Ltd

নিজস্ব হোটেল— গ্যাংটক Hotel AJAMBARI এবং Hotel Trinetra, Forest Colony Gate, দিঘা- Hotel APARUPA, Old Digha, সারা ভারত হোটেল, প্যাকেজ, Air, Rail & Bus ticket, excursion, short trip booking করা হয়। Ph: (033) 4001-6660, 86979-82878.

Hotel SAHARA, Kashmir

Your friendly host in Kashmir-Hotel SAHARA, Kohankhan, Dalgate, Srinagar, Pin: 190001, (M): 094190-10592. Email: ahameed47@rediffmail.com

হিন্দুস্থান গেস্টহাউস

দার্জিলিং ম্যালের কাছে হিন্দুস্থান গেস্টহাউস এবং ক্লাব স্ট্যান্ড থেকে ওঠার পথে রৌনক হোটেল। লাভায় নীহারবিন্দু ও রিশপে Eco Resort Holly Hock. 700/- থেকে শুরু। কোল বুকিং: Club Destiny, 8 Lenin Sarani, Kol-13. 2228-3246, 98044-00261.

সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, লাভা, লোলেগাঁও রিশপ, সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, ধরমশালা খাজিয়ার, নৈনিতাল, মুসৌরি, কৌশানি- হোটেল ও প্যাকেজ: 2262-2820/1849/98308-52068. www.sonali tourtravels.net

S. S. Travel Wings

নিজস্ব হোটেল— পুরী-আকাশ গেস্টহাউস, মন্দারমণি-সানভিউ রিসর্ট, স্টার ইন, দার্জিলিং-ট্র্যাভেলারস ইন, ডুয়ার্স-হোটেল Dynasty, ডুয়ার্স (3N/4D) 4,700/-, মন্দারমণি (2N/3D) 1,600/- দার্জিলিং গ্যাংটক পেলিং (7N/8D) 9,000/-. সারা ভারত হোটেল, গাড়ি বুকিং: 96740-28866.

ডুয়ার্সের রানি 'জয়ন্তী' নদী ও পাহাড়ের কোলে
ROVERS' INN JAYANTI

Call: 94340-14233, 94347-54349, 97349-03177, 97341-72815, 035642-03163. Mail: Parthasr69@gmail.com, WEB: roversinnjayanti.com

হোটেল রিসর্ট

Sylvan Tours & Travels

পুরী, দিঘা, দার্জিলিং, সিকিম, ডুয়ার্স, হিমাচল, কাশ্মীর, কুমায়ুন, গাড়োয়াল, নেপাল, ভুটান, অরুণাচল— সর্বত্র হোটেল/গাড়ি। Sujit: 98301-56212/94334-09706. 7, C. R. Avenue, Laha Paint House, Kol-72. www.sylvantravels.com

সিকিম ও দার্জিলিং naturecamp travels

গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, হিবারমিওক, উত্তরে, জুলুক ও নাথাং ভ্যালি সহ সিঙ্গরুট ও উত্তর সিকিম প্যাকেজ। দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, কোলাখাম, তিনচুলে, সিলারিগাঁও, বড়া ও ছোটা মাংগোয়ায় হোটেল, গাড়ি ও প্যাকেজ। (M): 98744-39571, 84204-63611.

উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও ডুয়ার্স

LINKAGE দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, কোলাখাম, তিনচুলে, চটকপুর, কার্শিয়াং, পেডং, ঋষিখোলা, টুমলিং, সান্দাক-ফু ছাড়া ডুয়ার্সের সর্বত্র হোটেল গাড়ি। Ph: 2265-7999, 2227-6685, , 2226-4661, 98301-52169.

গিরিবর্ত্মের দেশ লাদাখ। ভ্রমণের অনন্য অভিজ্ঞতা

LINKAGE লে, প্যাংগং হ্রদ, খারদুংলা পাশ, নুব্রা ভ্যালি, সো-মোরিরি হ্রদ। আপনার সময় ও পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন বাজেটের প্যাকেজ লে থেকে লে ৬ দিনের প্যাকেজ: ১৩,৫০০ থেকে শুরু। 2265-7999, 98301-52169.

সিকিমে হোটেল/প্যাকেজ/গাড়ি

LINKAGE গ্যাংটক, রাবংলা, পেলিং, ইয়ুমথাং, গুরুডোংমার, কালুক, উত্তরে, বোরং, নামচি, জুলুক, ওখরে, ভার্সে, লিংথাম, অ্যারিটারের বিভিন্ন বাজেটের আকর্ষণীয় প্যাকেজ। Ph: 2227-6685, 2265-7999, 98301-52169.

উত্তরাঞ্চলে হোটেল/গাড়ি

LINKAGE নৈনিতাল, কৌশানি, করবেট, চৌকরি, হরিদ্বার, মুসৌরি, ঋষিকেশ, রুদ্রপ্রয়াগ, চোপতা, গৌরীকুণ্ড, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ সহ চারধামরুটের সর্বত্র হোটেল ও বিভিন্ন গাড়ির ব্যবস্থা। 2265-7999, 2227-6685, 98301-52169.

হিমাচলে হোটেল/ গাড়ি

LINKAGE সিমলা, মানালি, ধরমশালা, ডালহৌসি, খাজিয়ার, চাম্বা, সারাহান, সাংলা, কল্পা, কাজা, কেলং। আপনার পছন্দের প্যাকেজ ও গাড়ির ব্যবস্থা। Ph: 2265-7999, 2227-6685, 2226-4661, 98301-52169.

হাবিব গেস্টহাউস, শ্রীনগর | নেহরু পার্ক

তমাল পোদ্দার পরিচালিত ডাল লেক থেকে হাঁটাপথে ৩ মিনিট দূরত্বে বাঙালি পরিচালিত হোটেল। বাঙালি খাবার। আহারাদি সহ জম্মু— জম্মু প্যাকেজ ১০,৫০০, 9N/10D, আহার ছাড়া জম্মু-প্যাকেজ, 7,500/-, 9N/10D. Club Destiny, (M): 98313-60282, 2228-3246.

হোটেল রিসর্ট

CITI SAFARI TOURS Pvt. Ltd.

International>Eurail Tickets & Passes, Domistic & International:- Hotel Booking, Adventure & Wildlife Safari, Cruise & Tailor made packages. 167-N, R. B. Ave. Gariahat Jn. Kol-19, 2460-6101, (M): 90381-11199. citisafari.ho@gmail.com

ভিক্টোরিয়া প্যালেস (ডাললেক, শ্রীনগর)

ডাল লেকের কাছে কাশ্মীরি ঘরানার বাগানসমেত ১৫ রুমবিশিষ্ট বাঙালি পরিচালিত হোটেল। রুমে টি ভি, গিজার কার্পেট সঙ্গে বাঙালি খাবার। কাশ্মীরের অন্যান্য স্থানে হোটেল ও গাড়ি বুকিং। 98311-25446, 98303-08705. বিশদ জানতে www.kashmirspecial.com

হোটেল কবীর (ডাললেক, শ্রীনগর)

কাশ্মীরের ডাল লেকের সন্নিকটে ৪৫ রুমের হোটেল। বাঙালি পরিচালিত বাঙালি খাবার। গুলমার্গ, শোনমার্গ যেতে হোটেল ম্যানেজার সাবির ন্যায্য মূল্যে সবরকম ব্যবস্থা করে দেন। বিমানে যাতায়াতকারীদের আনার ব্যবস্থা আছে। 98311-25446, 98303-08705. www.kashmirspecial.com

Kolkata Guest House (ভাইজ্যাক)

ভাইজ্যাকের রামকৃষ্ণ বিচের থেকে হাঁটাপথে মাত্র ১ মিনিটের পথ। হোটেলে খাওয়াদাওয়াতে পুরোপুরি বাঙালিয়ানা। রুমভাড়া ৭০০-১,০০০ টাকা। আরাকু, ঋষিকোন্ডা বিচ সহ ভাইজ্যাকের অন্যান্য জায়গায় ঘোরার জন্য আপনি গাড়িও পাবেন এখানে। 98311-25446, 98303-08705।

বশিষ্ঠ ট্র্যাভেলস (হরিদ্বার)

হরিদ্বারে বাঙালি প্রতিষ্ঠান। এখানে তাপস সরকারের পরিচালনায় বিভিন্ন বাজেটের হোটেল ও ধর্মশালা বুকিং পাবেন। গাড়োয়ালের বিভিন্ন স্থানে যেতে ছোট-বড় সবরকমের গাড়ির বন্দোবস্ত আছে। 096392-45542 (হরিদ্বার), 9903525040/9830308705. 033-2212-9788.

BUXA INN

জঙ্গল ও পাহাড়ের কোলে কোর এরিয়ার মাঝে জঙ্গলকে উপভোগ করতে হোটেল বক্সা ইন (খাওয়া-থাকার সুব্যবস্থা আছে)। Contact: Ratul Majumder, +919434229040/ +919775946511. Website: www.buxainn.com email id: ratulapd@gmail.com

সারথী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

কাশ্মীর বৈষ্ণোদেবী (১২) ১৫/৩, ১৪/৪, ২২/৫, ১১,০০০/- কেদার বদ্রী (১৩) ২৮/৪, ৭/৫, ২২/৫, ১০,৯৫০/- সিমলা মানালি (১১) ১০/৩, ২০/৪, ২২/৫, ১০,০০০/-, কল্পা কিন্নর (১১) ১১/৪, ২৭/৪, ২২/৫, ১০,৫০০/- উত্তর ভারত (১২) ২৪/৩, ১০,২৫০/- 280 N. S. Road, Howrah-1, Ph: 3025-3238/98308-40557/89024-98879 www.sarathitours..com ভারতের সর্বত্র হোটেল ও গাড়ি বুকিং করা হয়।

বিদেশ ট্যুর

Sylvan Tours & Travels

সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া @Rs. 35,500/- 6 দিন 26/5, ব্যাংকক পাট্টায়া @ Rs. 15,500/- 5 দিন 22/5, শ্রীলঙ্কা @ Rs. 28,990/- 8 দিন 18/4, 15/5. Air fare এবং Visa আলাদা। পাসপোর্টসহ ফোন করুন: Sujit 98301-56212/94334-09706. Web: sylvantravels.com

২১ বছর আগের ভ্রমণ থেকে

ভূপ্রদক্ষিণ

চন্দ্রশেখর সেন

চন্দ্রশেখর সেনের জন্ম ১৮৫১ সালে মালদহ জেলায়। তাঁর পিতা হরিমোহন সেন ছিলেন মালদহ কোর্টের সেরেস্তাদার। চন্দ্রশেখর কিছুকাল কলকাতায় ডাক্তারি পড়েছিলেন। কিন্তু পাশ করতে পারেননি। সেই অসম্পূর্ণ বিদ্যে নিয়েই তিনি রীতিমত ডাক্তারি করেছিলেন কিছুকাল। প্রথম চাকরি স্কুলমাস্টারি। তারপর হাতের লেখা ভালো ছিল বলে পিতার অধীনে নকল-নবিশের কাজ। পরে মালদহের জেল অধ্যক্ষ। চিরকালই চন্দ্রশেখর ছিলেন কিছুটা অস্থিরমস্তিষ্ক। তাই সব ছেড়েছুড়ে ১৮৮৯ সালে বেরিয়ে পড়েন বিশ্বভ্রমণে। প্রথমে ইউরোপে বেশ কিছুকাল বসবাস করেন তিনি। ১৮৯১ সালের মে মাসে ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। এবং ব্যারিস্টারির সনদ পান ১৮৯২ সালে। অনেক পরে, দেশে ফিরে এসে কিছুকাল কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারিও করেছিলেন তিনি। শেষ জীবনে তিনি নববিধান ধর্মমত অবলম্বন করেন। কয়েক বছর এলাহাবাদেও ছিলেন তিনি। এবং সেখান থেকে 'সাহস' নামে একটি সংবাদপত্রের সম্পাদনা করতেন। চন্দ্রশেখরের ওই বিশ্বভ্রমণ তিনি তাঁর 'ভূপ্রদক্ষিণ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে যান। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল গত শতকে। এখানে সেই বইটির প্রথম 'যাত্রা' অংশটি পুনর্মুদ্রিত হল। লেখাটিতে চন্দ্রশেখরের ব্যবহৃত আদি বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। চন্দ্রশেখরের মৃত্যু হয় ১৯২০ সালে।

২১ বছর আগের ভ্রমণ থেকে

ভারতের অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্যটন করিয়াও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সমাজ মধ্যে বিভিন্ন ভাব দেখি নাই। আসামের শেষ সীমা ডিহিং নদীর অপর পার হইতে কচ্ছ-দ্বীপ পর্য্যন্ত, এবং হিমালয়ের কোল হইতে পঞ্চবটী পর্য্যন্ত যে যে স্থান পরিদর্শন করিয়াছি, সর্ব্বত্র সেই এক হিন্দু, মুসলমান, সেই এক প্রকার লোকের ভাব— সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র; সেই শিয়া সুন্নি মোল্লা হেদাতি; সেই মঠ, মন্দির, শিব, গণেশ; সেই দরগা, মস্‌জিদ, পীর, প্যাগম্বর। সুতরাং ভারতবর্ষ পর্য্যটনে ভারতীয় ভাবে লোক-চরিত পরিজ্ঞান ও নানারূপ অবস্থাবগত হওয়ার জন্য বিপুল অভিজ্ঞতা লাভ হয় বটে; কিন্তু আমাদের সম্মুখে এমন অভিনব কিছু উপস্থিত হয় না, যাহা দেখিতে আমরা একেবারে অনভ্যস্ত বা সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তুত। এই কারণে, অনুসন্ধিৎসু বাঙ্গালীর মনে, ইউরোপ ভ্রমণের— পাশ্চাত্য লোকমণ্ডলীর রীতি নীতি কাণ্ড কারখানা দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিবার— বাসনা স্বতঃই জাগিয়া উঠে। বহুকাল হইতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, একবার পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন বাস করিয়া যাই। নানা কারণে উহা ঘটিয়া উঠে নাই। অবশেষে বন্ধু-বান্ধবের কল্যাণে ও বিধাতার বিশেষ কৃপায়, কোন প্রকারে শরীরটা লণ্ডনে আনিয়া ফেলিয়াছি। (মনটা অনেকদিন হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় ফিরিয়াছে।) পথের বৃত্তান্ত শুনিতে অনেকেই উৎসুক, প্রথমে তাহাই শুনাইব।

পরিবার বর্গের নিকট বিদায় হইয়া কলিকাতায় আসিয়া জনৈক গ্রাজুয়েট (Graduate) বন্ধুর উপলক্ষে একটি কলেজের বাসায় আশ্রয় লই। এই স্থলে কতকগুলি ভদ্রলোকের কথা না উল্লেখ করিলে নিতান্ত অভদ্রতা ও অকৃতজ্ঞতা হয়। ইহারা সকলে উক্ত বাসায় ছিলেন। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক। এই যুবাদল আমাকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করেন। ইহাদের সরল প্রেম ও বিশেষ শ্রদ্ধা আমি কখন ভুলিতে পারিব না। নিঃস্বার্থ প্রীতি সম্বন্ধে এই উন্নত যুবকদলের কাছে আমি অনেক উপদেশ পাইয়াছি। কয়দিন ইহারা পড়া-শুনা ছাড়িয়া সর্ব্বদা আমাকে লইয়া থাকিতেন। যাত্রা-দিবস সন্ধ্যার সময় সকলে হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া আমাকে মেলট্রেনে তুলিয়া দেন। এই দ্বাদশটী যুবার কথা আমি যখন মনে করি, তখনই আমার চক্ষু ফাটিয়া জল আসে। প্রেমময়ের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি এই মোমের পুতুল কয়টীকে আরও উজ্জ্বল রূপ প্রদান করুন। ইহাদের দৈবজ্যোতিতে বঙ্গদেশ আলোকিত হউক।

গাড়ীতে ৬১ ঘণ্টা কাটাইয়া চতুর্থদিবস প্রাতে ৯টার সময় বোম্বাই ভিক্টোরিয়া-ষ্টেশনে পৌঁছি। পথে দুই জন মাত্র ইংরেজের সহিত আলাপ হয়। মেথডিষ্ট চর্চ্চের অধিনায়ক বিখ্যাত রেভারেণ্ড থোবর্ণ (Dr. Thoburn-Methodist Church) ও বোম্বাই পাইলট সার্বিসের ইউরিজ (Mr. Uridge Bombay Pilot service)। পাদরি থোবর্ণের সহিত ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। প্রতাপ বাবুর "প্রাচ্য খ্রীষ্ট" (Oriental Christ) গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন "Mr. Mozoomdar has taken a wrong view of Christ "প্রতাপ বাবু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন।" "Christ lives among us as a reality, but the other saints and great men do not" — "খ্রীষ্ট প্রকৃত সত্তারূপে আমাদের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন; অন্যান্য সাধু ও মহাত্মাগণ নয়।" তাঁহার কথার উত্তরে আমি এই মাত্র বলিলাম— "আমি ত সাহেব এই বুঝি— যেখানে পিতা সেখানে পুত্রের নিতান্ত প্রয়োজন, নতুবা পিতা বলিয়া সম্বোধন করে কে? পিতা যখন নিত্য, তখন পুত্রের নিত্যতা অনিবার্য্য।" এই কথাতে সাহেব হাসিয়া বলিলেন "ঠিক, এ ভাব তুমি কোথা হইতে পাইলে?" আমি বলিলাম "আমার স্মরণ হয় না, ইহা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থ হইতে পাইয়াছি, বোধ হয়, ইহা আমার নিজের।"

বোম্বাই নগরে এক রাত্রি যাপন করিয়া পর দিন বেলা ৪টার সময় ইটালীয় ষ্টিমার "সিঙ্গাপুরে" উঠিলাম। কলিকাতায় যখন কুকের বাড়ী একেবারে লণ্ডন পর্য্যন্ত টিকিট কিনি, তখন তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, এক জনের মত একটী কেবিন (Cabin) যেন আমার জন্য ঠিক করা হয়। কিন্তু তাহা হয় নাই, কারণ প্রত্যেক কেবিনে দুই বা ততোধিক জনের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। বন্দর হইতে নৌকাযোগে জাহাজে যাইবার সময় বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম, কি প্রকারে এক কেবিনে ইউরোপীয়ের সহিত বাস করিব। বিধাতার কৃপায় জাহাজে গিয়া দেখি, প্রথম শ্রেণীতে দশ বার জন মাত্র যাত্রী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমি একা— কোথায় একটা কেবিনের জন্য ব্যস্ত ছিলাম, এ দিকে সমস্ত সেকেণ্ড ক্লাস আমার জন্য "রিজার্ভ (Reserved)।" সেইদিন "পি এণ্ড ও" কোম্পানির মেল ছাড়াতে অনেক লোক উহাতেই যায়। সুতরাং আমাদের জাহাজ খালি। জাহাজে সমস্ত কর্ম্মচারী ইটালীয়, এক জন আফিসর (Officer) ব্যতীত আর কেহ ইংরেজী জানেন না। বিষম ফাঁফরে পড়িলাম— আমি যাহা বলি কেহ বুঝে না, উহারা যাহা বলে আমি কিছু বুঝি না। আফিসরটীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বার্ত্তার পর তিনি আপনার কাজে গেলেন। ডেক যাত্রী (Deck passenger) আটজনই ভারতীয়; ছয়জন কাঠিয়াওয়াড় প্রদেশের বৈষ্ণব ও জৈন বণিক, এক জন শ্রীহট্টের বৃদ্ধ খালাসী ও তাহার পুত্রবধূ। ইহারাই তখন আমার দেশের লোক হইল। ৪।।০ টার সময় জাহাজ ছাড়িল, বাতাসও ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া উঠিল, শেষে আহারের সময় এমন তুফান যে, কিছুমাত্র উদরস্থ করিতে পারিলাম না। কেবিনের দরজায় ডেকের উপরে চেয়ার লইয়া বসিলাম। ষ্টুয়ার্ড (Steward) এক খানা রুটী ও কয়টা কলা আনিয়া দিল, তাহাই খাইলাম। ডেকের উপরে ঢেউ আসিয়া আরোহীগণের সমস্ত ভিজাইয়া দিতে লাগিল। যাত্রীদের সমূহ কষ্ট দেখিয়া দুঃখ হইল, কিন্তু উপায় নাই, আমাদের সেলুনে (Saloon) বহু স্থান থাকিতেও তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে পারিলাম না। রাত্রি ৮টার সময় কেবিনে গিয়া শুইলাম।

পরদিন প্রাতে ৬টার সময় উঠিয়া দেখি, জল স্থির, যেন সে সমুদ্রই নয়। কাফি খাইয়া সম্মুখের উপর-ডেকে গিয়া বসিলাম। চারিদিকে অকূল পাথার দেখিয়া চিত্ত পুলকিত হইল। খানিক হু হু করিয়া চক্ষের জল ফেলিলাম! যখন প্রাণ ঠাণ্ডা হইল, তখন একটী গান বাঁধিয়া মনের আনন্দে গাইলাম।

সপ্তম দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে আদেন (এডেন) বন্দরে পৌঁছিলাম। এ জীবনে কখন উদ্ভিদহীন পাহাড় দেখি নাই। আদেন প্রবেশ করিবার সময় ঐরূপ মরু পাহাড় দেখিয়া প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল। পাহাড় অনেক দেখিয়াছি, এ পাহাড় দেখিয়া প্রাণ হু হু করে কেন? খানিকক্ষণ কিছু বুঝিতে পারি না; শেষে টের পাইলাম, এরূপ বিশ্রী পাহাড় এই প্রথম দেখিতেছি বলিয়া এরূপ হইতেছে। আমরা যে সময় বোম্বাই ছাড়ি, তখন সেখানে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া আমাদের জাহাজ কোয়ারাণ্টাইনের (Quarantine) অধীন ছিল, অর্থাৎ আরোহীরা ইচ্ছামত কোন বন্দরে নামিতে পারিবেন না, নির্দ্দিষ্ট-কাল ঘাটে এক খানি জাহাজে বাস করিয়া পরে গম্য স্থানে যাওয়া বিধি। এই কারণে পঁহুছিবামাত্র কোন নৌকা জাহাজের নিকট আসিল না; যাত্রীগণকে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া নামিতে হইল। ভারতীয় লোকগুলি চলিয়া গেল, আমার প্রাণ কেমন করিতে লাগিল। উহারা লোহিত-সাগরের পশ্চিম তীরস্থ ইটালির উপনিবেশ মাসাওয়াপ্রদেশে বিষয় কার্য্যে যাইতেছে, এখান হইতে স্বতন্ত্র জাহাজে রওনা হইবে। উহাদের নিকট শুনিলাম, অনেক গুজরাটী বণিক সেখানে দোকান করিয়া বেশ দশটাকা রোজগার করিতেছে। কাঠিওয়াওয়াড় কচ্ছ প্রভৃতির বহুলোক দেশীয় জাহাজে ভারত সমুদ্রের অপর পারস্থ জাঞ্জিবার পর্য্যন্ত সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া থাকে। ঐ জাহাজগুলির নাম "বাণ"। উহাদের নাবিক খালাসী সমস্তই ভারতীয়। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা যে অধিবাসীর মানসিক

গঠনে বিশেষ কাজ করে, ইহাই তাহার প্রমাণ:- সমুদ্রতীরে বাস হেতু ঐ সকল লোক সমুদ্রযাত্রা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করিয়া উহাতে আমাদের মত কোন প্রকার বিভীষিকা দেখে না। কচ্ছদ্বীপের মাণ্ডবী বন্দর ঐ সকল জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামতের প্রধান স্থান। এই কয়দিনে লাটিন ভাষার সাহায্যে ইটালীয়দের কথা-বার্ত্তা কতক বুঝিতে ও দুই একটা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। ফল-কথা একদিনও কোন বিষয়ের জন্য তিলমাত্র ক্লেশ পাইতে হয় নাই; বিধাতার কৃপায় প্রথম হইতেই কাজ চালাইয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

প্রাতে উঠিয়া দেখি, জাহাজে মাল বোঝাই হইতেছে। তীর হইতে ডোঙ্গায় করিয়া খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণকায় কাফ্রিগণ জাহাজের নিকটে আসিল। তাহারা ডুবুরি। সিকি দোয়ানি সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে তাহারা ডুব দিয়া মুখে করিয়া তোলে।

আদেন হইতে সাক্কোনি নামক একজন ইটালীয় যুবক জেনোয়া যাইবার জন্য সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিল, এখন হইতে আমরা দুইজন হইলাম। বেলা ৮টার সময় জাহাজ ছাড়িল। ৩।।০ টার সময় বাব্ দরওয়াজা (বাবেল মাণ্ডেব প্রণালী) প্রবেশ করিলাম। ইহা লোহিত সাগর প্রবেশের দ্বার। দুই ধারে প্রবল প্রতাপ ইংরেজের দুই আড্ডা বাম দিকে পেরিম দ্বীপে রীতিমত কেল্লা। দুই দিক হইতে নিশান দ্বারা প্রশ্ন হইল, আমাদের কাপ্তেন চারি পাঁচটা নিশান উড়াইয়া আপনার জাহাজের সম্যক পরিচয় দিলেন। দেখ পথ কেমন সুরক্ষিত, কোন দিকে ফাঁক পাইবার যো নাই। যত জাহাজ লোহিত-সাগরে প্রবেশ করিবে বা উহা হইতে বাহির হইবে, সকলকে পরিচয় দিতে হইবে; এবং পরিচয় পাইবামাত্র এডেনের রেসিডেন্টের নিকট তারে সংবাদ যাইবে। ইউরোপ হইতে ভারত যাইবার পথের দ্বারগুলির চাবি সমস্ত ইংরেজের হাতে। গোপনে কাহারও যাইবার যো নাই। পেরিম একটী ক্ষুদ্র মরুদ্বীপ। শুনিলাম, অনেকগুলি বোম্বাইবাসী ওখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। পাঁচ ছয় শত লোকের বাস। প্রণালীর দুই ধারের দৃশ্য অতি ভয়ানক, ভীষণ উদাস ভাব।

পরদিন প্রাতে ৭টার সময় উঠিয়া লোহিতসাগরস্থ "সাত ভাই-এর" পাহাড় দেখিলাম। ইউরোপীয়েরা "দ্বাদশ প্রেরিত" (Twelve Apostles) নাম দিয়াছে; কিন্তু স্থানীয় আরবগণ যাহা বলিয়া ডাকে, তাহার অর্থ সাত ভাই। আমাদের পথ হইতে কিছু দূরে দক্ষিণ ধারে ছোট বড় সর্ব্বশুদ্ধ তেরটী পাহাড় দেখা যায়; অনেক চোরা পাহাড়ও আছে। এখন পথ অনেক জানা হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে বহু জাহাজ চোরা পাহাড়ে মারা গিয়াছে।

গ্রন্থাদিতে দেখিয়াছিলাম, রক্তবর্ণ কীটাণুর

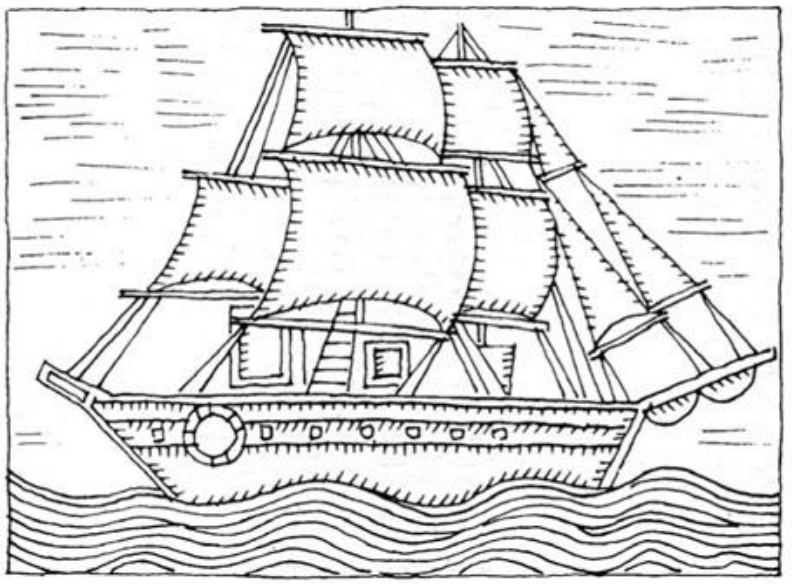

আধিক্য বশত লোহিতসাগরের জল সময়ে সময়ে খুব লাল দেখায়; কিন্তু আমাদের ভাগ্যে কোথাও সেরূপ ঘটে নাই; কেবল স্থানে স্থানে সামান্য, পাট্‌কিলে বর্ণ দেখা গিয়াছিল।

বেলা ৯টার সময় জলমধ্যস্থ একটী পাহাড়ের অতি নিকট দিয়া জাহাজ গেল। একগাছি তৃণ পর্য্যন্ত নাই, তত্রাচ একটু বিশেষ রকমের নির্জ্জনতা হেতু পাহাড়টী এক প্রকার মনোরম। কাক অপেক্ষা কিছু বড় এক শ্রেণীর সহস্রাধিক সমুদ্র-পক্ষী (Sea-gull)। জাহাজের উপর উড়িতে লাগিল। বোধ হইল, উহারা ঐ পাহাড়ে বাস করে, এবং সমুদ্রের মাছ ধরিয়া খায়।

দিবা দুই প্রহরের সময় ডেকের উপর ভারি গরম বোধ হইল। এদিকে আরব ওদিকে আফ্রিকা; দুই ধারের উত্তপ্ত বালুকা-রাশির বায়ু খুব গরম বই আর কি হইবে। এই সময়ে তিন জন ইটালীয়ের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ হইল। রোমান-কাথলিক (Roman Catholic) ধর্ম্ম ও পোপের একাধিপত্যের উপর তাহারা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে। প্রতিক্রিয়ার শ্রাদ্ধ এতদূর গড়াইয়াছে যে "সাক্রামেন্টো" Sacramento ঈশ্বর।) "যীশুকৃষ্টো' (Jesu Christo যীশু।) এবং 'স্পিরিটোসান্টো", (Spirito Santo পবিত্রাত্মা।) এ সকল নাম পর্য্যন্ত তাহারা শুনিতে চায় না। নানা প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করায় ধর্ম্ম ও ঈশ্বর স্বীকার করিল, কিন্তু "পেপাকে" (Papa-পোপ) এক তিলের জন্যও রাখিতে চায় না। পোপের জ্বালায় ও "ফাদার" "মাদারদের" অত্যাচারে রোমান-কাথলিক জগৎ অস্থির হইয়াছে। উপরে অসহ্য গ্রীষ্ম বোধ হওয়ায় কেবিনে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম।

এই দিবস রাত্রি ৮টার সময় প্রায় চারি মাইল দূরে একটা প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক আলো দেখা গেল। ১৮৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এইখানকার চোরা পাহাড়ে "পি এণ্ড ও" কোম্পানীর তিন খানি মেল জাহাজ মারা যায়। ভবিষ্যতে কাহারও ওরূপ বিপদ না ঘটে, এই জন্য উক্ত কোম্পানি সন্নিকটস্থ উচ্চতর পাহাড়ের উপর একটী বাড়ী করিয়া দিয়াছেন, ঐখানে দশ বার জন পুরুষ ও স্ত্রীলোক পালা ক্রমে তিন মাস করিয়া বাস করে; এবং প্রত্যহ নিয়মিতরূপে আলো দিয়া থাকে। উহার নাম "পি এণ্ড ও" কোম্পানীর ফনেল (Funnel)।

পরদিন বেলা ১১টার সময় আফ্রিকার আট্‌লাস্ (Atlas) পর্ব্বত দেখা গেল। তৎপর দিবস ৬ টার সময় সুয়েজে। জাহাজ কোয়ারান্টাইন নিয়মাধীন থাকাতে নামিতে পারা গেল না। ডাঙ্গা হইতে দশ বার রশি মাত্র দূরে নঙ্গর করাতে বন্দরের সমস্ত বেশ দেখা গেল। ফরাসী "সুয়েজ খাল কোম্পানীর" দ্বারা স্থানটী অতি মনোরম করা হইয়াছে। ষ্ট্রাণ্ড (Strand) ডক (Dock) গির্জা প্রভৃতির দৃশ্য অতি পরিপাটী, যেন একখানি ছবি। আসল সুয়েজ কিনারা হইতে মাইল খানেক দূরে, জাহাজ হইতে স্পষ্ট দেখা যায়, কারণ মধ্যে মরু। ঘোড়ার মত করিয়া গাধার উপর মানুষ চড়ে, এই খানে প্রথম দেখিলাম। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রাসভও ইহার পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। কোয়ারান্টাইনের জন্য সুলতানের দুইজন কর্ম্মচারী আমাদের জাহাজে উঠিয়া পোর্ট সায়েদ (Port Said) পর্য্যন্ত চলিল।

বেলা ১২টার সময় খালে প্রবেশ করা গেল। বেলা ২টার সময় অপরদিক হইতে আগত দুই খানি জাহাজকে পথ দিবার জন্য আমাদিগকে

পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইতে হইল। খালের পরিসর কম, একখানি মাত্র জাহাজ যাইতে পারে। একটী সুন্দর ষ্টেশনের সম্মুখে আমাদের জাহাজকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। ধন্য ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার লেসেপ্‌স্! (Ferdinand Lesseps) নতুবা কাহার সাধ্য এই দুরন্ত মরুভূমির মধ্য দিয়া খাল কাটে। যাবচ্চন্দ্রদিবাকর কীর্ত্তি এই খাল, ফরাসিদের বিদ্যা ও বুদ্ধিবলের সাক্ষী। খালের ব্যবস্থা অতি সুন্দর— দুধারে প্রকাণ্ড কামান পাতা; দূরতা জানিবার জন্য দুই রশি অন্তর একটী চিহ্ন, প্রত্যেক ঘণ্টায় এক একটী ষ্টেশন, জল সর্ব্বদা ঠিক রাখিবার জন্য বহু কাদা-কাটা জাহাজ ও অন্যান্য নানারূপ বন্দোবস্ত, মধ্যে মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারদের বাঙ্গালা; তাঁহারা সপরিবারে বাস করিতেছেন; স্থানে স্থানে মিসরি, আরব ও কাফ্রি মজুরেরা মাটী কাটিতেছে, উটে মাটী বহিতেছে, কোম্পানির ছোট বড় মাঝারি জাহাজ সকল এদিক ওদিক তদারক করিয়া বেড়াইতেছে; কত কি বলিব! বেলা ৩টার সময় খাল একটা হ্রদে প্রবেশ করিল। এ কয়দিন সূর্য্যদেব সমুদ্রে ডুবিতেছিলেন, আজ তাঁহাকে অসীম সাহারা মরু মধ্যে রাখিয়া গেলাম।

পরদিন বেলা ৩টার সময় হ্রদের ধারে ইশ্‌মালিয়া নগরে পঁহুছিলাম। মরু মধ্যে হ্রদ, তাহার ধারে আবার সুন্দর একটী ছোট নগর, মন্দ মজা নয়। বেলা ৫টার সময় অপর দিক হইতে আগত বাতাবিরভিমুখী সৈন্যবোঝাই এক খানি ওলন্দাজী জাহাজের সহিত সাক্ষাৎ হইল। অদ্যাই সন্ধ্যার সময় পোর্ট সায়েদ পঁহুছান যাইত, কোয়ারান্টাইন জন্য বন্দর হইতে দুই মাইল দূরে বাধ্য হইয়া থাকিতে হইল।

জাহাজ প্রাতঃকালে পোর্ট-সায়েদ নগরের নিচে লাগিল। উপর-ডেকে উঠিয়া সম্মুখে ভূমধ্যসাগর, বামে সুচারু বন্দর, দেখিয়া প্রাণ নাচিয়া উঠিল। উচ্চৈস্বরে বলিলাম "হায় রে বিধাতা! কি দেখাইলে! কাঙ্গালের উপর এত দয়া! তোমার এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে এত কাণ্ড, না জানি অক্ষয় বিশ্ব ভাণ্ডারে কত নূতন নূতন শোভা রাখিয়াছ!" হৃদয় ফুলিয়া উঠিল, থাকিতে পারিলাম না, কেবিনে নামিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলাম। বড় আরাম বোধ হইল।

আহারের পর আবার ডেকের উপর উঠিলাম। কয়লা লইবার জন্য এখানে সাত আট ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। বন্দরে কত দেশের কত রকম জাহাজ, ফরাসী, ওলন্দাজী, তুর্কী মানোয়ার, নানা প্রকার নৌকা, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বহুরূপী মানুষ; ষ্ট্রাণ্ডের বিচিত্র হর্ম্ম্যমালা স্থানটীকে স্বর্গতুল্য করিয়াছে। ধন্য ইউরোপ! মুসলমান সাম্রাজ্যের এই মিশর শহরকে কি প্রকার উন্নত করিয়াছে! সুলতান শত বর্ষেও যাহা পারিত না, ইউরোপীয় বণিকগণ অতি সহজে তাহা সম্পাদন করিয়াছে।

সুলতানের কোয়রান্টাইন ডাক্তার আমাদের জাহাজ তদারক করিয়া গেলে সুয়েজ হইতে আগত কর্ম্মচারী নামিয়া গেলেন।

বেলা ২টার সময় জাহাজ ছাড়িল। কেবিনে বসিয়া সজল-নেত্রে আশিয়ার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। যেমন ইউরোপ তেমনি তাহার সাগর। ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ অবধি বৃষ্টি ঝড়।

রাত্রি ১টা হইতে ভয়ানক তুফান আরম্ভ হইল। প্রাতঃকালে জাহাজ ফিরিয়া আসিয়া কাণ্ডিয়া (Candia or Crete) দ্বীপের সম্মুখে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বেলা ১১টার সময় আরও চারিখানি জাহাজ আসিয়া নিকটে নিকটে দাঁড়াইল। ট্রিয়েষ্ট (Trieste) হইতে আগত অষ্ট্রিয়ান জাহাজের কল খারাপ হইয়া গিয়াছে, নিশান দ্বারা জানাইল, এবং অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল। ক্রমে বিষম ব্যাপার আরম্ভ হইল, ভাবিলাম, এ আবার কি ব্যাপার! ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে, আমাদের ভাবনা বৃথা। কেশরের 'প্রার্থনা' ও ইমারসান (Emersion) পাঠ করিয়া দিন কাটাইলাম। মধ্যে মধ্যে জাহাজ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে; ঢেউ লোহার মুদগরের ন্যায় ধাক্কা মারিতেছে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টা অনবরত ঝড়ের পর সন্ধ্যার সময় একটু থামিল, জাহাজ ছাড়িল, ক্রমে এমনি নিস্তব্ধ, যেন পুষ্করিণী। ঝড়ের পর শান্তি, আজ বেশ দেখা গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সম্মুখ-ডেকের উপরে বসিয়া এই গানটী বাঁধিয়া গাইলাম।

রাগিণী ললিত-তাল আড়া।
কি জন্য আমারে প্রভু এ সংসারে পাঠাইলে।
কেন সদা এত দয়া কর মহাপাপী বলে।
জন্মেছি ভারতবর্ষে; সপ্তত্রিংশাধিক বর্ষে,
কত লীলা সেথা তুমি এ দাসেরে দেখাইলে।
এবে লয়ে যাও সমুদ্র পারে, ইংলণ্ডভূমে সুদূরে,
দেখাতে তোমার কীর্ত্তি ইউরোপীয় মণ্ডলে।।
রাখিবে সেথা কেমনে, দুর্ব্বল বঙ্গ-সন্তানে,
দুরন্ত শীতের মাঝে, যতনে আপন কোলে;
পরে কি করিবে তুমি, জানহে বিশ্বের স্বামী,
কি জানি আরও কি কত লিখে রেখেছ কপালে।

তার পরদিন সকালে দক্ষিণে ইটালি (কালাব্রিয়া Calabria প্রদেশ), বামে সিসিলি দ্বীপ, ক্রমে জাহাজ মেসিনা (Messina) প্রণালী প্রবেশ করিল। এখান হইতে ইটালি ঠিক বুটের তলার মতই দেখায়। প্রণালীর ইটালি পারে সিলার (Scylla) প্রস্তরস্তূপ, সিসিলির ধারে কারিব্‌ডিসের (Charybdis) বিপজ্জনক প্রকাণ্ড

হিমালচূড়া
অনুমোদিত বুকিং সংস্থা
হিমাচল সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, চাম্বা, খাজিয়ার, ধরমশালা, সাংলা, কল্পা, সারাহান, ছিটকুল, কাজা, নাকো, টাবো
কর্ণাটক ব্যাঙ্গালোর, মাইসোর, উটি, কোদাইকানাল, বেলুড়, হ্যালেবিদ, কুর্গ, গোল্ডেন টেম্পল, তিরুপতি ও টুরিজমের বাসে বিভিন্ন প্যাকেজ টুর ও কর্ণাটক জঙ্গল লজ অ্যান্ড রিসর্টস
ছত্তিশগড় বস্তার, চিত্রকূট তিরথগড়, কুঁমসায়ার দান্তেওয়াড়া, অচানকামার
কাশ্মীর জম্মু, শ্রীনগর, সোনমার্গ, গুলমার্গ, পহেলগাঁও, পাটনিটপ, কাটরা
কুমায়ুন নৈনিতাল, বিনসর, শীতলাখেত, কৌশানি, মুন্সিয়ারি, চৌকরি, পাতালভুবনেশ্বর, মুক্তেশ্বর
কেরালা মুন্নার, পেরিয়ার, আলেপ্পি, ভারকালা, কোভালম
উত্তরপ্রদেশ আগ্রা, বেনারস, এলাহাবাদ, লখনউ
রাজস্থান জয়পুর, যোধপুর, বিকানির, জয়সলমির, মাউন্ট আবু, আজমির, উদয়পুর
GMVN গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের প্যাকেজ
হৃষীকেশ-কেদারনাথ-বদ্রীনাথ-হৃষীকেশ বাস/গাড়ি
হৃষীকেশ-যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-কেদার-বদ্রী-হৃষীকেশ বাস/গাড়ি
এছাড়া মুসৌরি, ধনলটি, ল্যান্সডাউন, হরিদ্বার, খিরসু, আউলি, রুদ্রপ্রয়াগ, হরসিল ও অন্যান্য লজের একমাত্র বুকিং এজেন্ট
পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিঃ
দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, শান্তিনিকেতন, মুকুটমণিপুর, দীঘা
Beautiful Bengal
গোয়া, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, সিকিম সহ বিভিন্ন জায়গায় সরকারি ও বেসরকারি হোটেল ও গাড়ি বুকিং
P-263, C I T Road, Kolkata-700 010
Scheme-IV-M, Phulbagan, Beleghata
Phone: 033-2370-8004, 2363-3000 / 3366
himalchura@gmail.com

ANIK UDYOG ANIK UDYOG ANIK UDYOG
ঘরে বসে সমুদ্র উপভোগ করুন
নিজস্ব হোটেল
হোটেল বঙ্গলক্ষ্মী-পুরী
ডিলাক্স, সুপার ডিলাক্স, ইকোনমি
কনফারেন্স হল (A.C., Non A.C.)
এছাড়া হলিডে হোম ও গ্রুপ বুকিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে।
Kol. Cont.: 98317 83971
Puri Cont.: 09937649096
www.bangalaxmi.com
তৎসহ
কাশ্মীর, সিমলা, মানালি, সাংলা, কল্পা, হরিদ্বার, আগ্রা, দিল্লি, অমৃতসর, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং তৎসহ সারা ভারতে হোটেল বুকিং।
-ঃ পরিচালনায় ঃ-
ANIK UDYOG
42B, Dhiren Dhar Sarani, Kolkata-12
2225-8816, 98317 83971
ANIK UDYOG ANIK UDYOG ANIK UDYOG

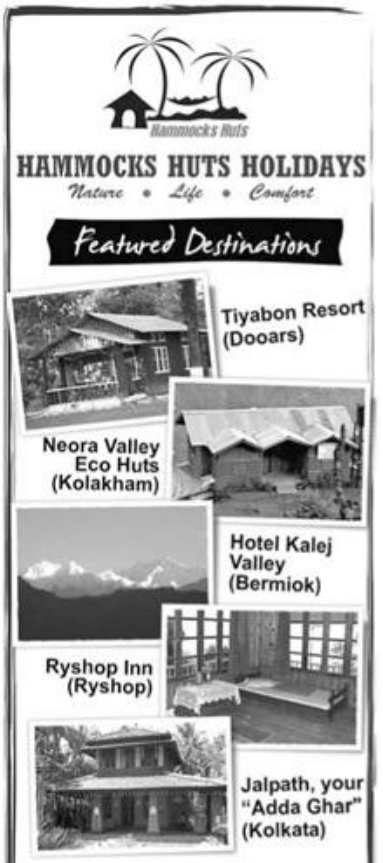

পাঁক। এ দিক দিয়া যাও ত জলের তোড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া চুর্ণবিচূর্ণ হও, অন্য দিক আশ্রয় করিলে পাঁকে ডুবিয়া মর;— এই অর্থে উভয়-সঙ্কট স্থলে ইংরাজী ভাষায় বলে "সিলা ও কারিব্‌ডিসের মধ্যে"। বিখ্যাত লাটিন কবিদ্বয় হোমর ও বার্জিল (Homer and Virgil) তাঁহাদের নায়কগণকে ইহার মধ্য দিয়া লইয়া গিয়াছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে একজন প্রসিদ্ধ ডুবুরি দুইবার এই খানে ডুব দিয়া উঠিয়া অত্রস্থ সমুদ্রগর্ভের অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচার করেন; তৃতীয়বারে নৃপতি কর্ত্তৃক প্রলোভন-হেতু নিক্ষিপ্ত সুবর্ণ পাত্রের লোভে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। মেসিনার নিচে প্রণালী চারি মাইল মাত্র পরিসর; প্রবল স্রোত।

বেলা ৭টার সময় মেসিনা বন্দরে উপনীত। বন্দরের ডাক্তার জাহাজে আসিয়া যাত্রী গণনা করিলেন। আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্ দেশীয়?" উত্তর "ভারতীয়"। মেসিনার পাহাড়ের উপর থাকে থাকে সোপান শ্রেণীর ন্যায় জলপাইয়ের গাছ। পর্ব্বতোপরি ডিউক-প্রাসাদ (Duke's castle) সহর কতক নীচে কতক পাহাড়ের উপর। তিন চারি হাজার ফুট উচ্চ অর্দ্ধচন্দ্রাকার পর্ব্বতশ্রেণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখান হইতে এট্‌না (Mount Etna) পর্ব্বত পঁচিশ ক্রোশ, বেশ দেখা যায়। পোর্ট সায়েদ হইতে আগত তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সহিত অদ্য আলাপ হইল। ইহারা বার জন পুরুষ ও স্ত্রীলোক দক্ষিণ আমেরিকার বুঞ্জায়রা (Buenos Aires) যাইতেছেন; সকলে এক দেশের নন, ছয় জন অষ্ট্রীয়ান, তিন জন গ্রীক, দুই জন জর্ম্মান, এক জন রুশ। জাহাজ বন্দরে পঁহুছিলে স্ত্রীলোকগণ নৌকা করিয়া ফলমূল বিক্রয় করিতে আসিল। নাবিকেরা বাড়ীর পত্র পাইয়া আনন্দে পড়িতে বসিল। অনেকের আত্মীয় স্বজন আসিয়া জাহাজে সাক্ষাৎ করিল।

সহযাত্রী সাক্কোনি সাহেবের সঙ্গে বোটে কিনারায় গেলাম। ঘাটে উঠিতেই প্রকাণ্ড মৎস্য, মাংস, তরকারির বাজার ও বিরাট মিউনিসিপাল আফিস। রাস্তা পথ অতি পরিষ্কার, পাথর দিয়া বাঁধান। প্রধান রাজপথগুলির সাধারণ নাম "টরেন্টি" (Torrente) অর্থাৎ স্রোত; ইহার কারণ এই যে পূর্ব্বে পশ্চাতের পাহাড় হইতে জলস্রোত এই সকল পথে বহিয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িত, কালে বন্ধ হওয়ার পর রাজপথে পরিণত হইয়াছে। পথের ধারে স্থানে স্থানে মেরী ও যীশুর প্রস্তর মূর্ত্তি। পথিকগণ অনেকে ওই সকল স্থানে মাথা হেঁট করিতেছে। মানুষগুলি অতি সুন্দর ও কোমল প্রকৃতির, কিন্তু ঘোর পৌত্তলিক ও কুসংস্কারী। নগরটী সমুদ্রের ধারে লম্বা; প্রায় দুই লক্ষ লোকের বাস।

মেসিনা প্রায় পঁচিশ শত বৎসরের প্রাচীন নগর। বিদেশীর আক্রমণ ও ভূমিকম্প দ্বারা বারম্বার বিধ্বংসিত হওয়ার পর ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রায় গোড়াপত্তন করিয়া পুনর্নির্ম্মিত হয়। ওলাউঠা প্রভৃতি মারীভয়ের উপদ্রবও এখানে কম হয় নাই। বহুকাল ক্রমান্বয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিদেশীয় জাতীয় অধীন থাকায় নগরের প্রধান গির্জাটিতে নানা জাতীয় ভাব বর্ত্তমান। এই গির্জায় যিশুমাতা মেরীর একখানি হস্তলিপি আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর একটী ছোট গির্জার দরজার উপরে আরবী লেখা আজও রহিয়াছে; এবং ইহার খিলানগুলি মুসলমানী ধরণের, মুসলমান রাজত্ব কালে ইহা মসজীদ ছিল। সিসিলি দ্বীপ ৮৩১ হইতে ১০৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসলমানদের অধীনে ছিল। প্রধান গির্জার অনতিদূরে বিশ্ববিদ্যালয়। তদন্তর্গত পুস্তকাগারে দুইলক্ষ গ্রন্থ সংগৃহীত, এবং স্থানীয় চিত্রকর আন্টোনেলোর (Antonello di Messina) হাতের কয়খানি উৎকৃষ্ট চিত্রপট রক্ষিত। ইহাকে ইটালীয় চিত্রবিদ্যার গুরু বলা যাইতে পারে। ইনি বিখ্যাত চিত্রকার এইকের (John Van Eyck) তৈলচিত্রের আবিষ্কার বার্ত্তা শ্রবণে ফ্লাণ্ডর্স্ (বর্ত্তমান বেল্‌জিয়ম) যাত্রা করত ঐ বিদ্যা শিখিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন; পরে ভিনিস (Venice) নগরে গিয়া ইটালীর চিত্রকরগণকে শিক্ষা দেন।

মেসিনা মহাত্মা গারিবাল্‌দীর (Garibaldi) লীলাক্ষেত্র:- ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নেপল্‌সের রাজার হস্ত হইতে জয় করিয়া ইটালীর রাজা ভিক্‌টর ইমানুয়েলকে (Victor Emmanuel-Vittorio Emmanuele স্থানীয় নাম) সিসিলি দ্বীপ দান করত এই খানে পার হইয়া নেপলসাভিমুখে যুদ্ধ-যাত্রা করেন। পুরাকাল হইতে এই নগরে বহু-শ্রেণীর ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহাকবি সেক্ষপীর (Shakespeare) তাঁহার একখানি নাটকে মেসিনার দৃশ্য দিয়াছেন। জুপিটরদেব (Jupiter) এট্‌না পর্ব্বতোপরি সিংহাসন স্থাপন করত এই দ্বীপে রাজত্ব করিতেন। কোন রাক্ষসকে (Enceladus), আসনের নিচে সমাধি দেওয়ায় তাহার, অগ্নিময় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন আজও আগ্নেয়গিরির ধুমোদগীরণ ও ভূমিকম্পরূপে দেখা দিতেছে। বহুকাল এখানে এই বিশ্বাস ছিল, অদ্যাপিও যে নিতান্ত মুর্খশ্রেণীর মধ্যে নাই, এমন বলা যায় না।

মেসিনার লোকগুলিকে দেখিয়া বড় সরল এবং বালকের ন্যায় আমোদপ্রিয় বোধ হইল। দোকানের ও পথের লোক অনেকে আমার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইতে লাগিল। তাহাতে সাক্কোনি আমাকে বলিলেন "ইহারা কেন তোমার দিকে তাকাইতেছে জান? ইহারা সাদা মানুষ দেখিয়াছে এবং কাল মানুষও দেখিয়াছে; কিন্তু তোমার মত

সারা বিশ্বের বিনোদন

খরচ ১ টাকারও কম

বাড়িতে রাখুন টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়ার নতুন বাংলা দৈনিক 'এই সময়'।
দিনে এক টাকারও কম খরচে। দেশ-দুনিয়ার খবর, তর্ক-বিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ, বিনোদন
ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলো - সব নিয়ে, ঝকঝকে রঙিন ব্রডশিট।
আজই যোগাযোগ করুন আপনার খবরের কাগজ বিক্রেতার সঙ্গে।
অথবা এস এম এস করুন 'ES' 58888 নম্বরে বা 033 3989 8090 নম্বরে ফোন করুন।

এই সময়
সংবাদপত্র

www.eisamay.indiatimes.com
facebook.com/eisamay.com

অর্দ্ধেক সাদা ও অর্দ্ধেক কাল মানুষ (হাল্‌ফ ব্ল্যাক হাল্‌ফ হোয়াইট— Half black half white) কখন দেখে নাই, এই জন্য।'

মেসিনার বন্দরে বৎসরে ন্যূনাধিক তেরশত ষ্টিমার ও নয় হাজার পালের জাহাজ নঙ্গর করিয়া থাকে; কিন্তু স্থানীয় ব্যবসায় বাণিজ্য সমস্তই ইংরাজ ফরাসী জর্ম্মণ ও উত্তর ইটালির লোকের হাতে। বন্দরটী সুপ্রশস্ত, সুন্দর ও সুরক্ষিত। সিসিলীয়গণ আমাদের ন্যায় উদ্যমহীন জাতি, নতুবা এমন উর্ব্বরা দেশে বাস ও এত প্রকার সুবিধা সত্ত্বেও দেশী বাণিজ্য পরের হাতে কেন যাইতে দিবে? "মুখে ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, আর হাতে পরিশ্রম কর" *(Ora et labora)*। এই মহাবাক্য শীতপ্রধান উত্তর ইউরোপের লোকেরাই বুঝে। আমাদের দেশের মত মেসিনার পথে অনেক সন্ন্যাসী ফকির (Mendicants) ঘুরিয়া বেড়ায়। যেখানে দুই চারি পয়সায় একখানা মোটা রুটি ও গোটাকতক জলপাই মিলে, যাহাতে দিনের আহার চলিয়া যায়, এবং সূর্য্যদেব যেখানে গরম কাপড়ের কাজ চালাইয়া দেন, সেখানে ত আলস্যের প্রশ্রয় হইবেই। তাই আর্কিমিডিস (Archimedes, the Great Geometrician of Antiquity) থিওক্রাইটসের (Theocritus, the Prince of Pastoral Poets) দেশের এই অবস্থা।

রাত্রিতে আর দুইটী নবাগত ইটালীয় যুবকের সহিত আহার করিলাম। ইঁহারা অতি ভদ্র ও সজ্জন। ইহাদের সহিত ভারত ও ইংরেজ সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। একজন বিশেষ দুঃখের সহিত বলিলেন, "তোমাদের দেশে আজও কেহ গারিবাল্‌দী, মাজীনি (Mazzini) হইবে না? জর্ম্মণির ভূতপূর্ব্ব সম্রাট ফ্রেডারিকের চিকিৎসা ও স্যার মোরেল মেকেঞ্জি সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। একজন হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

পরদিন প্রাতে মেসিনা ছাড়িলাম। ক্রমে সান্‌জুয়ান (San Juan) নগর পার হইয়া ইটালির অপর পার্শ্বে আসা গেল। কালাব্রিয়া প্রদেশের কথা শুনিয়া বড় দুঃখ হইল। শুনিলাম সেখানকার লোক প্রায় গণ্ডমুর্খ এবং অধিকাংশ ডাকাত ও খুনে। ইটালির ভদ্রলোক অনেকটা আমাদের মত গল্প ও আমোদ আহ্লাদ বড় ভালো বাসেন; কিছু অতিরিক্ত গোছ থুথু ফেলিতে ও গায়ে হাত দিয়া কথা কহিতে মজবুত। অনেককে এমন দেখিলাম, যদি পোষাক ছাড়িয়া আমাদের কাপড় চোপড় পরেন, ব্যবহারের কিছুমাত্র বোঝা যাইবে না যে বাঙালি নন।

ইটালির পশ্চিম ধারের সমুদ্র মধ্যে তিন চারিটী আগ্নেয়গিরি দেখা গেল। বেলা ১টার সময় একটীর খুব নিকট দিয়া আমরা গেলাম। ধূমোদগীরণ বেশ দেখা গেল। ইহার নাম স্ত্রাম্বুলী (Strambouli); সমুদ্রের মধ্যে একটী পাহাড়। যে ধার দিয়া গলিত ধাতু পড়ে, তাহার অপর দিকে একটী ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীর গ্রাম, প্রায় আড়াই হাজার লোকের বাস। মৎস্য ভিন্ন অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সপ্তাহে একবার মেসিনা হইতে আইসে। এরূপ স্থানে এমন বিপদের উপর মাথা রাখিয়া বাস না করিলেই কি নয়? অবশ্য কোন কারণ আছে। আমাদের জাহাজের জনৈক খালাসী ঐ গ্রামের লোক।

সতের ঘণ্টার পর রাত্রি ১১টার সময় নেপল্‌স (Naples-Napoli) নগরে পৌঁছিলাম। অতি নিকটে ভিসুভিয়স্ (Vesuvius, ইটালীয় নাম ভিজুভিও Vesuvio) হইতে অনবরত ধূম ও অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে, এক একবার প্রবলবেগে ধক্ ধক্ করিয়া উঠিতেছে। কি ভীষণ দৃশ্য!

প্রাতঃকালে আহারাদির পর নগর দেখিতে গেলাম। স্থানীয় নাম নাপোলি। ইংরেজরা যেমন অপর দেশের নামগুলি আপনাদের মনের মতো সংক্ষেপ করিয়া লয়, ইটালীয়গণ তেমনি তাহাদের দেশের ক্ষুদ্রনাম ইংলণ্ডকে টানিয়া বাড়াইয়া লম্বা করিয়াছে— ইংগিল্‌টেরা (Inghilterra)।

নাপোলির গির্জা অতি প্রকাণ্ড এবং অপেরা-হাউস (যাত্রা নাচ যেখানে হয়) মন্দ নয়। গির্জার মধ্যে গিয়া দেখি বৃদ্ধ পাদরি ধূপ ধূনা নৈবেদ্য পুষ্প মোটা বাতির আলো লইয়া পূজা আরম্ভ করিয়াছেন। নাপোলি খুব বড় সহর, সাত লক্ষ লোকের বাস, প্রকাণ্ড বন্দর। নিকটে ভিসুভিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে বিনষ্ট পম্পি (Pompei) নগরের ধ্বংসাবশেষ একটী মহাতীর্থরূপে বিরাজ করিতেছে। ইটালি স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে বহু বিদেশীয় রাজা এখানে রাজত্ব করেন; তাঁহাদের অনেক কীর্ত্তি আছে। এবার নেপল্‌সে দুই দিন থাকি। তার পর আর দুইবার এখানে আসি। সম্যক বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

এখান হইতে জাহাজ ছাড়িয়া তেত্রিশ ঘণ্টার পর জেনোয়া (Genoa, দেশীয় নাম Genova) বন্দরে উপনীত হই। জাহাজ নঙ্গর করিল, তখন ভোর ৪টা, বেশ অন্ধকার আছে। জাহাজ অনেকদিন পর দেশে পঁহুছিল, সকলেরই মহানন্দ; কিন্তু আমার মাথায় যেন বাজ পড়িল। প্রাতঃকাল ৮টার সময় কেবিনে বসিয়া উপাসনা প্রার্থনান্তে সাশ্রুনয়নে কেবিনের নিকট জন্মের মত বিদায় লইলাম। এই সময়ের কথা কখন ভুলিব না। জাহাজ এই পঁচিশ দিনে ঘর-বাড়ি হইয়া গিয়াছিল; পোড়া প্রাণ এত কাতর যে জাহাজ ছাড়িতে প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যদি দুই ঘণ্টা থাকিতে পাই যেন ভালো বোধ হয়। যাহা হউক চক্ষু মুছিতে মুছিতে কর্ম্মচারীগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া এক জন ইটালীয় খালাসীকে সঙ্গে লইয়া জাহাজ হইতে নামিলাম। দ্রব্যাদি সমস্ত পরমিটে (Custom House) পাশ করাইতে হইবে, কাজেই প্রথম সেখানে গেলাম; ছাড় হইলে বরাবর রেলওয়ে ষ্টেশনাভিমুখে চলিলাম। ষ্টেশনের সম্মুখে শ্বেতপ্রস্তরের সুবিখ্যাত নাবিক আমেরিকাবিষ্কর্ত্তা কলম্বসের প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি মেলট্রেন ছাড়িবার আর দশ মিনিট বিলম্ব; সুতরাং কিছু খাওয়া হইল না, অমনি গাড়িতে উঠিলাম। জেনোয়া হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর টিকিট ছিল; কেবল লগেজ (Luggage) করিতে তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি করিতে হইল। গাড়িতে উঠিয়া দেখি দুইজন যুবা ও একটি বৃদ্ধা রোম নগরে পোপ মহাত্মার চরণ স্পর্শ করিতে গিয়াছিলেন। বেলা ১।।০টার সময় টিউরিণে (Turin, আসল নাম Torino) পৌঁছিয়া শুইয়া-যাইবার গাড়ির টিকিট (Sleeping car Ticket) ক্রয় করিলাম। কলিকাতা ও বোম্বাই নগরে কিছুদিন ছিলেন, এমন একজন সাহেব ঐ গাড়ির টিকিট বিক্রয় করেন। তাঁহার নিকট অনেক সংবাদ পাইলাম। যদিও কুক্ কোম্পানির লোকের সাহায্য পাইবার কথা, কিন্তু তাঁহাদের টিকি দেখিতে পাওয়া ভার। এখানে শ্লিপিংকার ভিন্ন অন্য কোন গাড়িতে শৌচাদির ব্যবস্থা নাই; প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে পা রাখিবার জন্য গরম জল পোরা তামার চ্যাপ্টা চোঙ্গ থাকে। শ্লিপিংকারগুলি অতি আরামের জিনিস।

টিউরিন হইতে গাড়ি ২টার সময় ছাড়িল। ক্রমে তুষারাবৃত মহোচ্চ আল্পস্ (Alps) পর্ব্বত দেখা দিল। গাড়ি পাহাড়ের উপর উঠিল, নীচে-অনেক নীচে গ্রাম দেখা যাইতেছে। আমাদের দুধারে আরও উচ্চ পাহাড়। কি ভয়ানক দৃশ্য! এইখানে কবি পোপের কথা মনে পড়িল। জামালপুরের নিকট যেমন পাহাড় ফুটিয়া রেলপথ গিয়াছে, তেমন টনেল (Tunnel) যে কত পার হইতে হইল তাহার সংখ্যা নাই। সমস্ত দিন গাড়িতে আলো। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের উপর আঙ্গুরের খেত ও সুন্দর রাস্তা। মোদান (Modane) ষ্টেশনের আগেকার টনেলটী পার হইতে পনেরো মিনিট সময় লাগিল। রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত আমি একা ছিলাম, পরে একজন সুইস (Swiss) বৃদ্ধ (আমাদের বর্ত্তমান গুইকুমারের একজন বন্ধু) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাতঃকালে পারিসে পঁহুছিয়া গাড়ি বদল করিতে হইল। বেলা ৩টার সময় ক্যালে (Calais) বন্দরে জাহাজে উঠিয়া ৪টার সময় ডোভারে (Dover) পঁহুছিলাম। অতি অল্পক্ষণ পরে রেল ছাড়িল। কোন ষ্টেশনে না থামিয়া এক ঘণ্টায় লণ্ডনে পঁহুছিলাম। ঘণ্টায় ষাট মাইল হিসেবে আসিল।

বেলা ৫টার সময় লণ্ডনে উপস্থিত হইলাম।

Wandervogel adventures

কবে যাবেন... কদিনের জন্য যাবেন... কতজন যাবেন... ঠিক করে চলে আসুন আমাদের কাছে... ভারতবর্ষের যে-কোনও জায়গায়... আমরা আপনার পছন্দমতন সফরসূচি তৈরি করে দেব... পছন্দমতন রিসর্ট বা হোটেল গাড়ি বুকিং করে দেব... ট্রেন বা বিমানের টিকিট কেটে দেব... নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ুন নিজের মতন করে... গ্রুপের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ঝামেলা নেই... হইচই নেই... আপনার ছুটি কাটুক আপনার মন যেমন চায় শুধু সেইভাবে... যেখানে যতক্ষণ খুশি গাড়ি থামান... ছবি তুলুন... অনেক কষ্টে পাওয়া ছুটি... উপভোগ করুন একেবারে নিজের মতন করে... এবার পুজোয় চলুন কাস্টমাইজড বা টেলরমেড প্যাকেজে... আপনার সঙ্গে বসে আপনার সফরসূচি তৈরি করবেন আমাদের অভিজ্ঞ ট্র্যাভেল কনসালট্যান্টরা... আপনার ভ্রমণ শুরু থেকে শেষ হবার দিন পর্যন্ত সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে নজর রাখব এবং আপনার ভ্রমণের সব ঝক্কি-ঝামেলা সামলাব আমরা... আপনি শুধু বেরিয়ে পড়ুন...

এবার গরমের ছুটিতে চলুন

পূর্ব আর উত্তর-পূর্বে

● অরুণাচল প্রদেশ ● আসাম
● নাগাল্যান্ড ● ডুয়ার্স ● সিকিম
● মেঘালয় ● উত্তরবঙ্গ ● ত্রিপুরা

অনবদ্য প্রকৃতির সৌন্দর্যের খোঁজে

● গুজরাট ● মধ্যপ্রদেশ ● কেরালা
● রাজস্থান ● কর্নাটক ● তামিলনাড়ু
● গোয়া ● আন্দামান ● লাক্ষাদ্বীপ

হিমালয়ে

● কাশ্মীর ● লাদাখ
● কিন্নর লাহুল স্পিতি ● হিমাচল
● কুমায়ুন ● গাড়োয়াল

কর্নাটকে থাকুন

Jungle Lodges and Resorts-এ বুকিংয়ে স্পট ডিসকাউন্ট

Kabini, Bandipur, Devbagh, B.R.Hills, Doddamakali, Galibore, Bheemeshwari, Bannerghatta, River Tern Lodge, Dandili, Kali Adventure Camp, Blackbuck Resort

জঙ্গলে

● কানহা ● বান্ধবগড় ● করবেট
● রণথম্ভোর ● তাড়োবা ● পেঞ্চ
● কাবিনী ● বন্দিপুর ● কেওড়ি
● গির ● কচ্ছের রণ ● কাজিরাঙা
● মানস ● ডিব্রুসাইখোয়া
● মিশমি হিলস ● ঈগল নেস্ট

লাদাখ– ২২/৭, ২২/৮

Central Arunachal ১৪/৪, ১৮/৫
ইটানগর, জিরো, দাপোরিজো, পাসিঘাট, ডিব্রুগড়

কর্নাটক– ২০/৪, ২৫/৫
হাম্পি, ডাণ্ডেলী, গোকর্ণ, মুরুদেশ্বর, যোগফলস্, আগুম্বে, কুদ্রেমুখ, কেম্মানগুড্ডি, বেলুর, হ্যালেবিদ

অন্যান্য সরকারি অনুমোদন

ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
ওড়িশা ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
গুজরাট ট্যুরিজম

Wandervogel adventures

KOLKATA: 1/2 C, Ballygunge Place East, Kolkata-700 019 □ Mobile: 9007009061, 9007006794, 9007009063, 9831078347, 9007009060. E-mail: wildtoursindia@yahoo.com Website: www.wandervogeladventures.com

আমাদের কোনও শাখা নেই

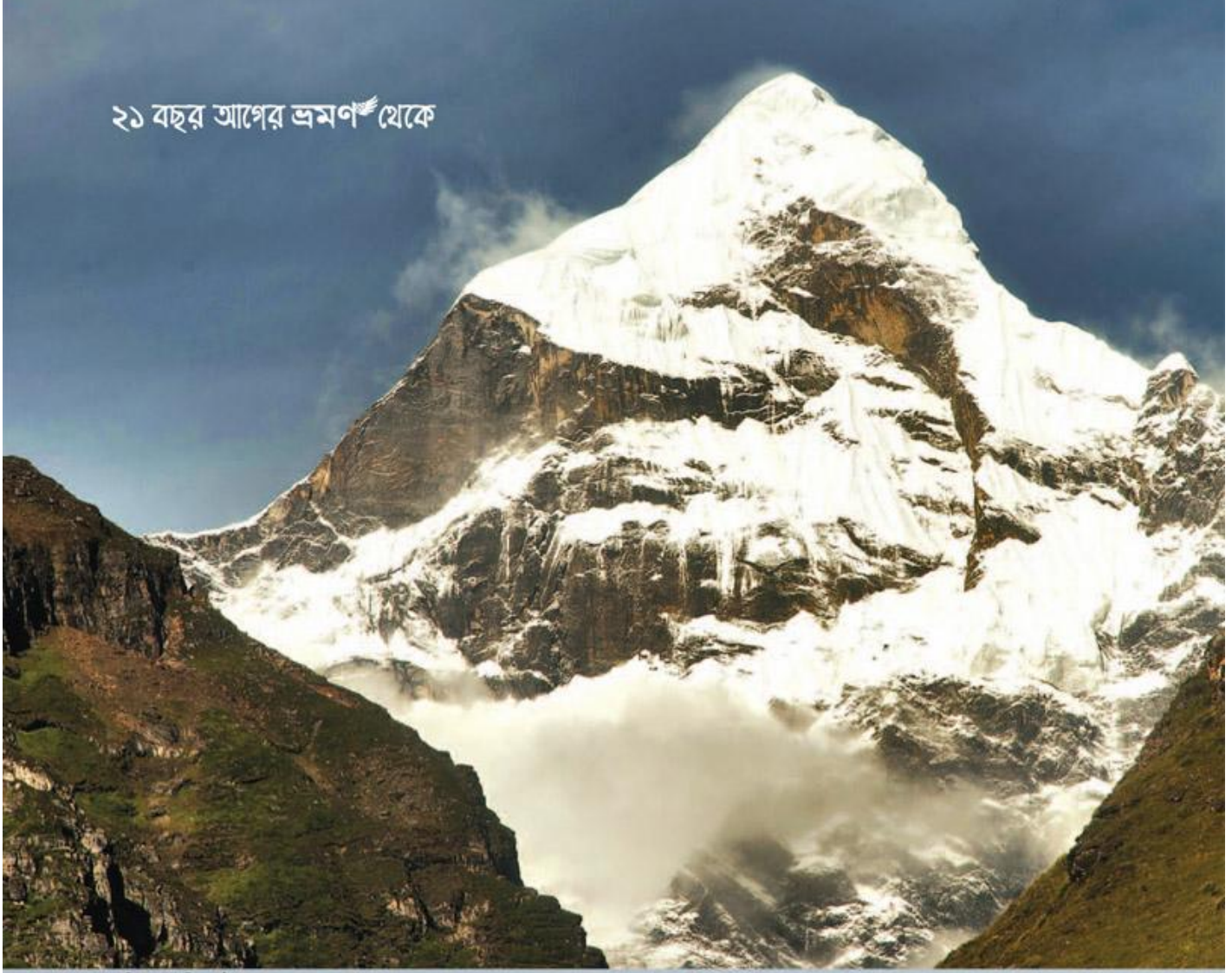

বদ্রি থেকে নীলকণ্ঠ শৃঙ্গ □ শুভময় ঘোষ

কেদার বদ্রি

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

পাহাড়িয়া মানুষরা বিশ্বাস করে যে হিমালয় ডাক দিলে সাড়া দিতেই হয়। আমার বেলা এই ডাক এসেছিল একবারেই হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধনের মতো। স্বাস্থ্যের কারণে উচ্চতা আমার আওতার বাইরেই ছিল। তাই মনের মধ্যে অঙ্কুরের মতো ইচ্ছে জাগলেও তাকে আমল দিইনি। প্রতিবেশীরা ঠিক পুজোর আগে বাইরে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করছিলেন। অনেকদিন ধরেই কেদার-বদ্রী যাওয়ার ইচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই হয়ে উঠছিল না। এবার তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে দেবদর্শনে যাবেনই। কেদার-বদ্রীর নাম শুনলে মন চঞ্চল হয় না এমন বাঙালি বোধ হয় খুব কমই আছে। আমিও কোনও কিছু না ভেবেচিন্তে ঠিক করে ফেললাম, যাবই। ডাক্তারের পরামর্শে আমার সঙ্গে যাবার জন্য সেই ছোটবেলার ফিরিওলার বাক্সের হরেকরকমবার মতো একটি ওষুধের বাক্স তৈরি হল। সবকিছু বাঁধাছাদা, বাক্সে শুধু তালাচাবিটি পড়তে বাকি। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাত।

যে ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে আমাদের যাবার কথা

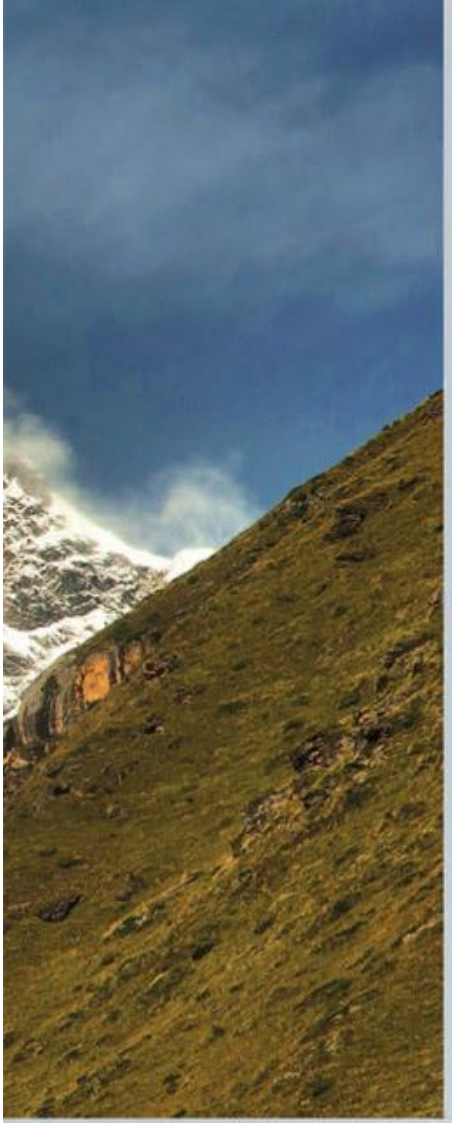

ওপরে: কেদারনাথ মন্দির নীচে: বদ্রীনাথ মন্দির

ছবি: অতীশকুমার মাইতি

রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গম ☐ সিদ্ধার্থ সমাজদার

তারা যাত্রার আগের আগের দিন টেলিফোন করে জানাল যে রান্নার লোকেরা স্ট্রাইক করায় যাত্রা বাতিল। খুবই দমে গেলাম। বুঝলাম যে ডাকটা অবেলায় এসেছিল। সব থেকে খারাপ লাগল আমার প্রতিবেশী বন্ধুদের জন্য। তাঁরা খুবই ভেঙে পড়লেন। নারায়ণ না ডাকলে নাকি এই ভাবেই সব কিছু পণ্ড হয়ে যায়। তাঁদের চাঙ্গা করতেই আমি কথাচ্ছলে বললাম, 'দরকার কি ওদের সঙ্গে যাবার। আমরা তো তিনজনে মিলেই যেতে পারি।' যেমন কথা তেমন কাজ। প্রথমেই আমরা দিল্লির টিকিট কাটলাম কারণ দেরাদুন এক্সপ্রেসে জায়গা নেই। এমনিতে এই ট্রেনে হরিদ্বার অবধি গিয়ে বাসে করে হৃষীকেশ যেতে হয়। আবার দিল্লি থেকেও বাসে যাওয়া যায়। তারপরেই আমরা গেলাম গাড়োয়াল বিকাশ নিগমের কলকাতা শাখায়। বি বা দী বাগে জি পি ও ছাড়িয়ে আরেকটু গেলেই ওদের অফিস (মহাকরণের পিছনে)। তাঁরা আমাদের আশ্বাসবাণী দিলেন যে হৃষীকেশ থেকেই আমরা পছন্দমতো ভ্রমণসূচি পেয়ে যাব।

ট্রেন যখন ছাড়ল তখনও হিমালয়ের ডাক সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। নয়াদিল্লি থেকে আমরা সোজা চলে গেলাম আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাসে। চেপে বসলাম এক অতি লজঝড় বাসে। পথে যেতে খালি মনে হচ্ছিল এই বুঝি বাস মুখ থুবড়ে পড়বে। মীরাটে যখন থামল মনে হল হিমালয় অনেক দূরে। এত নোংরা ও হতশ্রী শহর বড় একটা চোখে পড়ে না। যাই হোক মীরাট ছাড়িয়ে যাবার পর জনবসতি কমতে লাগল। দুধারে শুধু আখের খেত। দুটি খেতের মাঝে সরু পায়ে চলার পথ। রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ। বেশ কিছুক্ষণ ধরে খালি আখের খেত দেখতে দেখতে যখন একঘেয়ে লাগছে তখন হঠাৎই সবুজের গায়ে ঝলসে উঠল রঙের ছটা। ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই নীল গলা তুলে রাজকীয় ঠাটে এক খেত থেকে আরেক খেতে ঢুকে পড়ল ময়ূর। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভালো করে দেখার আগেই সে চোখের আড়াল হয়ে গেল। তখন কি জানি হিমালয়ের ডাক নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর পথের পাশ দিয়ে যাবে। কী উজ্জ্বল মসৃণ তাদের রং ও পেখম। মীরাট মুজফ্ফরনগরের সব নোংরা ও কুশ্রীতা ঢাকা পড়ে গেল রঙের ছটায়। বাসে ঘুমোতে পারি না বলে আমিই রয়ে গেলাম এই দৃশ্যের সাক্ষী। বাদবাকিরা সবাই ঘুমে নিমগ্ন।

রুরকির পর পথের দুধারে দৃশ্য ক্রমশই ছবির মতো সুন্দর হতে লাগল। দিনান্ত বেলার আলোয় দুপাশে খেত ও গাছপালা মোহময়ভাবে পাল্টে গেল। হরিদ্বার আসার আগেই অন্ধকার নেমে এল। পাহাড়ের দেশের বিকেলে একটা হিমেল হাওয়ার ছোঁয়া ছিল। যা দুপুরের গরমের পর খুবই মনোরম। এখানে অন্ধকার ঝুপ করে আসে না। শেষ বেলার আলো অনেকক্ষণ থাকে। বাসের জানলা দিয়ে যখন হরিদ্বার (স্থানীয় লোকে কিন্তু হরদোয়ার বলে) শহরের আলোগুলো দেখলাম তখন আরেকবার হিমালয়ের ডাক শুনলাম।

হৃষীকেশ পৌঁছতে আমাদের আটটা বেজে গেল। ছোট জায়গার পক্ষে বেশ রাত। বাসস্ট্যান্ডের কাছেই হোটেল পাওয়া গেল, অবশ্য শুধু থাকার জন্য। মোটামুটি পরিষ্কার। তবে সে রাত্রে খুব খাওয়ার কষ্ট হয়েছিল। কারণ কোথাও কিছু পাওয়া যায়নি শুকনো শক্ত রুটি ও ডাল ছাড়া।

আমরা সকালবেলাই ছুটলাম আসল কাজে। গাড়োয়াল বিকাশের অনেক রকমের সফরসূচি আছে। চার ধাম (কেদার-বদ্রী, গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী) দুই ধাম (কেদার-বদ্রী), পঞ্চকেদার (রুদ্রনাথ, তুঙ্গনাথ, মুক্তনাথ, ভৈরব ও কেদারনাথ)। আমরা নিজেদের পছন্দের সফরটির টিকিট কেটে নিয়ে চলে গেলাম মুনি কি রেতিতে ঘর ঠিক করতে। এই জায়গাটি হৃষীকেশের একটু বাইরে। নিরালা পরিষ্কার ও ছবির মতো সুন্দর। তখনও সেখানে অটোর ফটফটানি আরম্ভ হয়নি। টাঙাই ভরসা। বেশ মজা লাগে চড়তে। ঘোড়ার কপকপ খুরের আওয়াজের একটা নিজস্ব ছন্দ আছে।

আমাদের যাত্রা শুরুপক্ষে হওয়ায় চাঁদের আলো আমাদের রাতের সঙ্গী হয়েছিল। মুনি কি রেতি থেকে কেদারনাথ পর্যন্ত যে জ্যোৎস্নালোক দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তা কল্পনারও বাইরে, একমাত্র স্বপ্নেই সম্ভব। মুনি কি রেতির বাংলোর সামনে রাস্তা একটি পাহাড় ঘিরে চলে গেছে। কয়েক পা হাঁটলেই নদী। ওপারে লছমন ঝুলা। দশমীর জ্যোৎস্নায় আলোছায়া ঘেরা পরিবেশে একা হাঁটতে একটুও ভয় করে না। পাহাড়িরা অপরাধপ্রবণ নয়। যদিও স্থানীয় লোকেরা খুবই গরিব। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পরিশ্রমী।

আমাদের সফরসূচি সাত দিনের। মুনি কি রেতি থেকে সকাল সাতটায় যাত্রা আরম্ভ হল। রীতি অনুযায়ী আগে কেদারদর্শন তার পরে বদ্রীনাথ। দীর্ঘ চড়াই ভেঙে এক পর্বতমালার গা ঘেঁসে আরেক পর্বতমালার কাছাকাছি আসা। পিছন ফিরে নিচের দিকে তাকালে চোখে পড়ে ফেলে আসা রাস্তা মোটা অজগরের মতো পড়ে আছে। কেদার ও বদ্রীনাথের জয়ধ্বনি দিয়ে যে যাত্রার শুরু তা হিমালয়ের ডাকের মতো মনে হল।

যাত্রা পথের প্রথম বিরতি ব্যাসিতে। জায়গাটি এমনিতে সুন্দর। কিন্তু অমন সুন্দর জঙ্গল থেকে গাছপালার টাটকা নিজস্ব গন্ধের বদলে নাকে এল দুর্গন্ধ। জঙ্গলই এখানে তীর্থযাত্রীদের শৌচাগার। ব্যাসিতে ব্যাসদেবের একটি বড় মূর্তি আছে। পাহাড়ের পথে জানলার ধারে বসাটাই বেড়ানোর অর্ধেক আনন্দ। সমান্তরাল এক প্রবহমান জীবন যা আমাদের আগেও যারা এপথে গেছে দেখেছে, যারা পরে আসবে তারাও দেখবে। বড় বড় গাছে বাঁদরদের ঘরকন্না দেখার মতো। কোথাও বা চলছে পরস্পরের গা থেকে উকুন বাছা, কোথাও বা মা পরিচর্যা করছে শিশুর। তাকে গভীর মমতায় দুধ খাওয়াচ্ছে, গা-হাত-পা পরিষ্কার করে দিচ্ছে। কিছু বাঁদর দল বেঁধে ফলটা পাকুড়টা পেড়ে নিচে একটু বড় শিশুর হাতে তুলে দিচ্ছে। বিকট শব্দ করে তাদের পাশ দিয়ে বিশালকায় বাস, ট্রাক একের পর এক চলেছে, তাদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। বাঁদরদের বাঁদরামিও যে কত মজার হতে পারে তা কি দেবপ্রয়াগের এই পথে না এলে জানা যেত?

পুণ্যার্থীদের কাছে দেবপ্রয়াগের মাহাত্ম্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে অলকানন্দার গর্জন এসে মিলে যায় ভাগীরথীর কলতানের সঙ্গে। এই মিলিত যাত্রা সমতলে আসে হরিদ্বারে। এখানে পূর্বপুরুষের তর্পণ করলে তাদের নাকি অনন্ত মোক্ষলাভ হয়। অলকাপুরী হিমপ্রবাহের স্বচ্ছ জল নিয়ে প্রবাহিত অলকানন্দা মেশে গোমুখ থেকে উৎসারিত গঙ্গার গাঢ় খয়েরি জলের সঙ্গে। আমরা ফিরে যাই রামায়ণের কালে। এখানকার অতি প্রাচীন রামমন্দিরে রাম তপস্যা করেছিলেন। ব্রহ্মহত্যার পাপক্ষালনের জন্য। অর্থাৎ রাবণ হত্যার জন্য। স্থানীয় মানুষ এমনভাবে 'রামজি'র কথা বলে যে মনে হয় যেন তিনি তাদের পরিবারের অতি ঘনিষ্ঠ। এবং ঘটনাও যেন এই সেদিনকার। দেবপ্রয়াগ থেকে আরম্ভ হয় নিরামিষ খাওয়া। এর আগে হৃষীকেশে ডিমটা চলত। কেদার-বদ্রী যাত্রায় আহার ভোজন বিলাসীদের পক্ষে দুঃস্বপ্ন। অবশ্য রুদ্রপ্রয়াগের ভোরবেলায় চা ও জিলিপির স্বাদ বহুদিন স্মৃতিতে থাকে। গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগরের পথের ধারে ছোট্ট ভোজনালয়ের ডালের চাটনি তো অপূর্ব। সেইসঙ্গে দোকানের পিছনে হাত ধুতে গিয়ে আদিগন্ত ধানের খেত। শ্রীনগরের উচ্চতা ১,৭০০ ফুট। এখানে কমলেশ্বরের মন্দিরেও ঘরের মানুষ 'রামজি'র কথা শোনা গেল। কমলেশ্বর মন্দিরে শিবের আশীর্বাদপ্রার্থী রাম তাঁকে বন্দনা করেন ১,০০০টি পদ্মফুল দিয়ে। শিব যখন একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখেন তখন রাম ঘাটতি পূরণ করেন তাঁর একটি চোখ দিয়ে। কার্তিক মাসে এখানে বড়সড় মেলা বসে।

এরপরের দর্শনীয় স্থান রুদ্রপ্রয়াগ। এখানেই প্রথম হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য চোখে পড়ে।

পাথুরে রুক্ষতার সঙ্গে শ্যামলিমার মেলবন্ধন। আরেক মিলন স্থলের জন্যও জায়গাটি স্মরণীয়— স্বর্গের নদী মন্দাকিনী এখানেই মিলিত হয় অলকানন্দার সঙ্গে। পাথরের আড়ালে আড়ালে ছোট ছোট পর্ণকুটিরের দরজায় দেখা যায় রংবেরঙের পোশাকে গাড়োয়ালি নারী ও শিশু। হাত নাড়লে তারাও হেসে উত্তর দেয়। নিচের দিকে তাকালে মন্দাকিনীকে একফালি সিল্কের মতো মনে হয়। এখান থেকে রাস্তা কেদারনাথের দিকে ভাগ হয়ে যায়। পথে পড়ে গুপ্তকাশী। এখানেই আছে শিবের এবং অর্ধনারীশ্বরের বিখ্যাত মন্দির। যখন পাণ্ডবরা জ্ঞাতি-হত্যার পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য শিবের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন তখন শিব এখানে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। ৪,৫০০ ফুট উচ্চতায় বাতাস কনকনে ঠান্ডা। রোদে আছে উজ্জ্বলতা কিন্তু তাপবিহীন। অসংখ্য পাহাড়ি ঝরনা কলকলিয়ে গিয়ে মন্দাকিনীতে বিলীন হয়ে যায়। রং-বেরঙের নানা মাপের পাখি উড়তে উড়তে ঝরনার জলে তৃষ্ণা মিটিয়ে নেয়। শোনপ্রয়াগে আবার দুই নদীর মিলন— শোনগঙ্গা হারিয়ে যায় মন্দাকিনীতে। গেটবন্ধ হবার আগে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছতে হয়। কারণ রাস্তা খুবই সরু। তার আগে পড়ে ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির। এখানে শিব-পার্বতীর বিয়েতে পুরোহিত ছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা এবং সাক্ষী নারায়ণ। যে অগ্নিসাক্ষী রেখে মহাদেব পার্বতীকে নিয়ে সাত পাক ঘুরিয়েছিলেন তার আগুন এখনও জ্বলছে। কারণ প্রতি পুণ্যার্থী একটি করে কাঠ আগুনে নিক্ষেপ করেন।

দেহত্যাগ করে দক্ষকন্যা সতী হিমালয় ও মেনকার কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। উমা শিবকে স্বামী রূপে পাবার জন্য তপস্যায় বসার আগে মন্দাকিনীর জলে স্নান করেন শুদ্ধ হতে। সেই জায়গাটিতে উমাদেবীর মন্দির আছে এবং পাশেই উষ্ণকুণ্ড। ৫,৫০০ ফুট উচ্চতায় গৌরীকুণ্ড ঘিরে গভীর জঙ্গল ফার ও পাইনের। শ্যামলিমা জায়গা ছাড়তে থাকে রুক্ষতাকে। এখান থেকেই শুরু হয় ১৪ কিলোমিটার কেদারের পথ।

প্রথম পড়ে রামবাড়া। এর পরে ক্রমশই পথ চড়তে থাকে। বড় বড় ঝোপঝাড়ের কোণ ঘেঁসে ফুটে থাকে নাম না-জানা বনফুল বিভিন্ন রঙের সমারোহে। হলদে, সবুজ, লাল, গোলাপি, বেগুনি, সাদা এবং নানা রঙের নীলের জটলায় চোখ মুগ্ধ হয়ে যায়। এই ফুল হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে ভয় করে, তোলা তো দূরের কথা। মনে হয় পাহাড়ের জিনিস পাহাড়েই থাক। পথে দেখা যায় ধবধবে সাদা ঘোড়ার বাচ্চা মাটিতে গড়িয়ে খেলা করছে। বোধ হয় এরা পক্ষীরাজের ছানা। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। ঘোড়ার গলার ঘণ্টার টুং টুং ছাড়া, মাঝে মাঝে ভেসে আসে মেয়ে-গলার গান দূরের পাহাড় থেকে।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে গরুড়চটির বাঁক নিলেই দূরে কেদারনাথের মন্দির দেখা যায়। বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর বাহন নাদেশ্বর। পাণ্ডবদের চোখে ধুলো দিয়ে গুপ্তকাশী থেকে শিব এখানে মোষের ছদ্মবেশ ধরে লুকিয়ে পড়েন। ভীম তাঁর চাতুরি ধরতে পেরে নিজেকে অনেকখানি বাড়িয়ে নিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়ান যাতে সব মোষকে তাঁর পায়ের ফাঁক দিয়ে যেতে হয়। সব মোষই পার হল, একটি ছাড়া। সেই মোষ লুকোবার জন্য পাতালে ঢুকতে গেলে ভীম তার পিছনের পা দুটি চেপে ধরেন। তখন তাঁদের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব পাণ্ডবদের জ্ঞাতি-হত্যার পাপ থেকে মুক্ত করেন। ১১,৬৭৩ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কোনও ব্যবধান নেই। হীরের নাকছাবি শোভিত গুজরাটি গিন্নি এবং রাজস্থান গুজরাটের গ্রামের দরিদ্র নারীপুরুষ সবাই লিঙ্গ স্পর্শ করে জীবন ধন্য করে। পথশ্রমের কষ্ট তাদের সার্থক হয়।

কেদারে রাত্রিবাস এক অনন্য অভিজ্ঞতা। গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের লজ ও হোটেল হিমলোক মন্দিরের ঘিঞ্জি পরিবেশের বাইরে অবস্থিত। মধ্যরাতে হাড়-কাঁপানো শীতকে জয় করে বাইরে এসে দাঁড়ালে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া মন্দির ও পরিবেশ মনে হয় এ জগতের নয়। এই সৌন্দর্য রমণীয় নয়। কিন্তু নৈঃশব্দ্যে ও গাম্ভীর্যে অসাধারণ। পাহাড়ের সূর্য লুকোচুরি খেলতে ওস্তাদ। চোখে চাঁদ নিয়ে আমরা শুতে গেলাম। সকালে উঠে দেখি মুষলধারায় বৃষ্টি। তারই মাঝখানে ছাতায় প্লাস্টিকে নিজেকে মুড়ে নিচে নামা খুবই কষ্টকর। ভিজে কাক হয়ে বাধ্য হয়ে আমরা আশ্রয় নিলাম একটি ছোট চায়ের দোকানে। আমাদের সঙ্গী হল বিরাটকায় পাহাড়ি কুকুর। এদের আকারের সঙ্গে প্রকৃতির কোনও মিল নেই— এত নিরীহ আর শান্ত।

বৃষ্টির মধ্যেই আমরা রওনা হলাম। রাত কাটবে শোনপ্রয়াগের তাঁবুতে, মন্দাকিনীর ধারে। সেখানে মস্ত বড় রান্নাঘরে উনুনের গরমের আরামে দেখা পাওয়া গেল বাংলা বলা এক রাঁধুনির সঙ্গে। সে চমৎকার খিচুড়ি রাঁধতে জানে।

সকালে আবার চারদিক রোদে ঝলমল। বৃষ্টির কোনও চিহ্নই নেই। এবার যাত্রাপথ বদ্রীনাথের দ্বারে। পথে পড়ল কর্ণপ্রয়াগ। এখানেই সূর্যদেব কর্ণকে কবচ ও কুণ্ডল দান করেছিলেন। দুই নদীর সঙ্গমস্থল কর্ণপ্রয়াগ (২,২০০ ফুট)। পিণ্ডারগঙ্গা ও অলকানন্দা নদীর এখানে ভয়াল রূপ। বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে সগর্জনে ধেয়ে চলেছে। ফেরার পথে এখানেই নদীর ধারে বাংলোয় রাতের ব্যবস্থা হয়েছিল। আরেকটু উঁচুতে (২,৫০০ ফুট) নন্দপ্রয়াগ, সমাহিত সুন্দর। এক সাধক নন্দবাবার নামে জায়গার নাম।

বদ্রীনাথের ঠিক আগে রাতের জন্য আমরা থামলাম যোশিমঠে। ৫,০০০ ফুট উঁচুতে এক বটবৃক্ষের নিচে বসে আদি শংকরাচার্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বৃক্ষটিকে স্থানীয় মানুষ কল্পবৃক্ষ বলে। শীতে যখন বদ্রীনাথে মন্দির বন্ধ হয়ে যায় তখন স্থানীয় নরসিং মন্দিরে তাঁর ঠাঁই হয়।

বদ্রীনাথের উচ্চতা ১০,৪০০ ফুট। মন্দিরটি পথের যেখান থেকে দেখা যায় সেই জায়গাটিকে বলে দেওদেখনি। খাঁটি ভক্ত যিনি, তিনি এখানে নেমে পড়ে বাকি পথটুকু হেঁটে যান। অবশ্য ৩০/৩৫ বছর আগে পুরো পথই হেঁটে উঠতে হত। সেই পাকদণ্ডীটি এখনও আছে। হরিদ্বার থেকে কেদারের দূরত্ব ছিল ২৪৮ কিলোমিটার এবং বদ্রীনাথের ৩৩২ কিলোমিটার। বদ্রীনাথের পথের দুপাশে সাদা না গলা বরফের টুকরোগুলিকে Ice Bridge বলা হয়। স্থানীয় লোকেরা বলে 'বুঢ়া বরফ'। দুপাশের ধস তাদের বর্ণনায় 'পাহাড় গিরা হায়'। নরনারায়ণ পর্বতের গায়ে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা আদি শংকরাচার্য। বিষ্ণু ধ্যানস্থ হলে লক্ষ্মী কুল বনের (বদ্রী) রূপ ধরে তাঁকে আড়াল করেন। বদ্রীনাথেই আছে ব্রহ্মকুণ্ড। এখানে স্নান করতেই হয়।

আমাদের সাতদিন প্রায় শেষ হবার মুখে। এখানেও গাড়োয়াল নিগমের চমৎকার লজ ও হোটেল আছে— দেবলোক। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পরের দিন সকালে রওনা হয়ে আমরা দুপুর নাগাদ যখন যোশিমঠে থামলাম, এক পাহাড়ি শালওলা আমার পরনে তিব্বতি বাকু দেখে ছলছল চোখে তার ছেড়ে আসা দেশের কথা বলল ও আমায় অবিশ্বাস্য কম দামে শাল বিক্রি করল। যোশিমঠের এক বাঁক থেকে শেষবারের মতো হিমালয় দেখে আমরা কর্ণপ্রয়াগ রওনা হলাম। হিমালয় সবারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। ভক্ত পায় তার দেবতাকে, ভ্রমণপিয়াসী উপভোগ করে নতুন জায়গা আর প্রকৃতিপ্রেমী হারিয়ে ফেলে নিজেকে। এত প্রবাদ, কিংবদন্তী, গল্পকথা আর অন্য কোনও স্থানকে এইভাবে জড়িয়ে নেই। আমাদের মহাকাব্য জীবন্ত হয়ে ওঠে। পৌরাণিক চরিত্রও রক্তমাংসের রূপ পায়। তাঁদের কথা স্থানীয় মানুষ এমনভাবে বলে যেন তাদের সঙ্গে ওদের ওঠাবসা আছে। বিকেলবেলায় মুনি কি রেতিতে যখন এলাম মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। আবার কি হিমালয় ডাকবে?

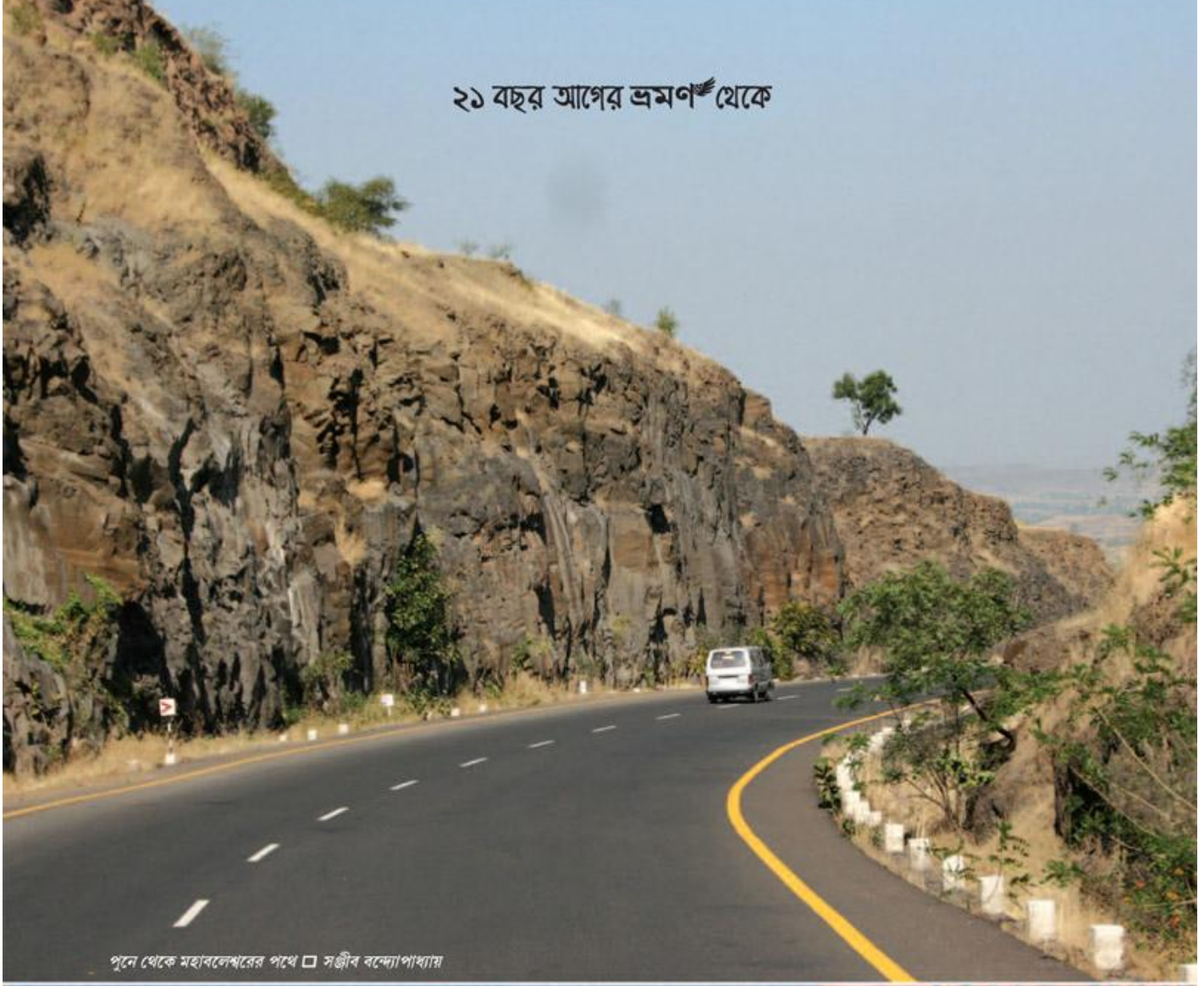

পুনে থেকে মহাবলেশ্বরের পথে □ সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়

মহারাষ্ট্রের হিল স্টেশন

প্রতাপকুমার রায়

মহাবলেশ্বরে কৃষ্ণা নদী □ সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাবলেশ্বরে এলিফ্যান্ট রক ভিউ পয়েন্ট □ সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়

বম্বে শহরের অনেক অবগুণ সত্ত্বেও একটা বড় গুণ হল, ওই কংক্রীট আর কাচের সুউচ্চ জঙ্গল থেকে অতি সহজে ও অতি অল্প সময়ে প্রায় অবিনষ্ট প্রকৃতির মধ্যে পৌঁছনো যায়। তখন ওই সদা-ব্যস্ত, অতি-আলোকিত, অতি-আধুনিক শহরের জাঁতাকল থেকে অবিশ্বাস্য মুক্তি।

শহরটার সুবিধা অনেক। তার পশ্চিমে আরব সাগর, পুবে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। সেই পর্বতমালার শুরু বম্বে থেকে একশো কিলোমিটারের মধ্যে। দু-এক টুকরো পাহাড় ওই পর্বতমালার শৃঙ্খল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল সৃষ্টির আদিমকালে। তেমনই এক বিচ্ছিন্ন পাহাড় মাথেরন। বম্বে থেকে আশি কিলোমিটার মাত্র। শহর থেকে ট্রেনে নেরাল স্টেশন, ঘণ্টা দুয়েকের পথ। তারপর একটা দেশলাই বাক্স ট্রেনে চেপে দু'ঘণ্টায় কুড়ি কিলোমিটার চড়াই উঠলেই মাথেরান। প্রাচীন গাছে গাছে ঢাকা বম্বের নিকটতম হিলস্টেশন। লালমাটি আর গাছ। এখন মানুষ বাড়ছে, গাছ কমছে। আক্ষেপ করে লাভ নেই। সর্বত্রই তাই। তবু নিসর্গের স্বাদ আজও আলাদা। চার ঘণ্টায় যেন অন্য দেশে। আগে মনে হত অন্য কালে। মাথেরান বম্বে-পুনা রোডের ধারে চৌক গ্রাম

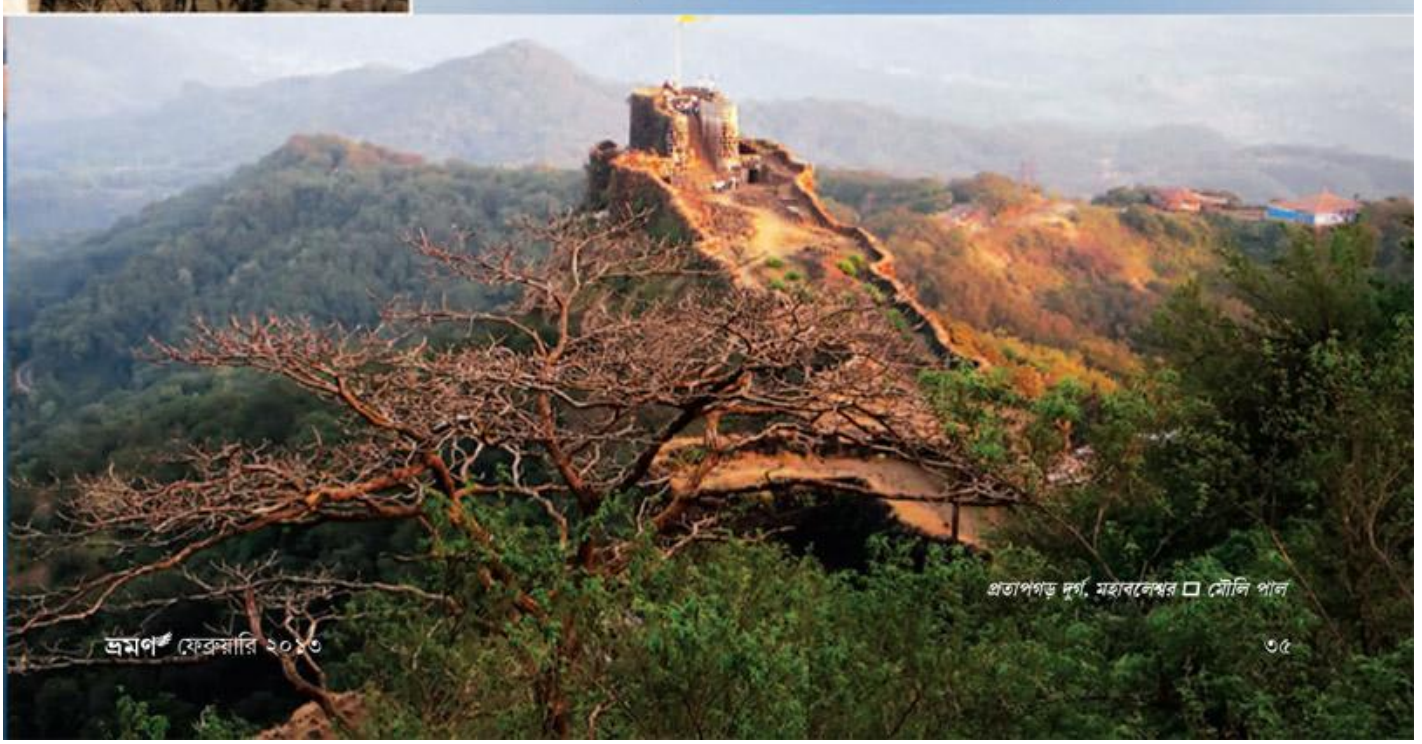

প্রতাপগড় দুর্গ, মহাবলেশ্বর □ মৌলি পাল

থেকেও যাওয়া যায়। পদব্রজে। দু ঘণ্টার চড়াই। কিন্তু তা না গিয়ে ওই পথে আরও কিছু দূর এগিয়ে গেলে, পাহাড়ের ছায়ায় যে জায়গাটা পড়বে তার নাম খপোলি। দোকানপাটের বহর দেখে মনে হবে মস্ত একটা পত্তন বুঝি। কিন্তু তা নয়। যারাই পুনার পথে গাড়ি অথবা বাসে করে যায়, তারা সবাই এখানে ক্ষণেকের বেশি দাঁড়ায়। তাই এত আয়োজন। খপোলির পরেই আচমকা পাহাড়ের চড়াই। গাড়ির তেল-জল দেখে নিতে হয়। তদুপরি রমাকান্ত ভুবনের বটাটা বড়ার জন্য লাইনও একটু দিতে হয়। দেবভোগ্য ওই পদার্থটি অবশ্যই স্বাদ নেবার যোগ্য।

এখান থেকে সাত-আট কিলোমিটার চড়তে পারলেই খান্ডালা, দু হাজার ফুট উচ্চতায়, আর তার গায়ে গা লাগিয়ে লোনাভালা। মনোরম জায়গা দুটিই। একদিকে অনেক নিচে থাকে জেলার সমভূমি। অন্যদিকে প্রায় সমতল, যতদূর দেখা যায় ডেকান প্লেটো, দাক্ষিণাত্যের অধিত্যকা, বাঙ্গালোর পর্যন্ত। মাঝেমাঝে ছোট বড় পাহাড়। লোনাভালা, খান্ডালা— হিলস্টেশন, পিকনিক স্পট, কিছুক্ষণের জন্য স্থানান্তর, যাই বলি মুগ্ধ করে রাখে। তার ওপর যদি বর্ষাকাল হয়, আকাশ জুড়ে আধো আঁধার, কুয়াশা উঠছে নিচ থেকে, গা শিরশির ঠান্ডা-কালো শাদায় আঁকা গগন ঠাকুরের রহস্যময় ছবির মতো। অনেক কাল আগে, আমি যেবার প্রথম পুনা যাই আমাদের ট্রেন পৌঁছেছিল বর্ষার এক সকালে। লোনাভালার কুয়াশা একটু সরে যেতেই দেখি আদিগন্ত গভীর সবুজ। মাঝে মাঝে ঝরনার শ্বেতধারা— সে ছবিটা চল্লিশ বছর পরে আজও আমার মনে আঁকা হয়ে আছে।

লোনাভালা থেকে মাইল চল্লিশেক গেলেই পুনা— এখন যার নাম পুনে। পথে আর একটা অপূর্ব স্থান পড়বে, তলেগাঁও। তার কাছে ছোট পাহাড়ের ওপর বৌদ্ধযুগের দুটো ঐতিহাসিক গুহাশ্রেণী আছে— কারলা এবং ভাজা কেভ্‌স্‌। আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড়কে ঘুমোতে আমি এখানেই দেখেছি। রোদওঠা প্রান্তরে দিগন্ত অনেক দূরে সরে গেছে, হঠাৎ দেখি একটা ছোট পাহাড় আকাশে মাথা রেখে আলস্যে নিদ্রামগ্ন। সমস্ত চরাচর স্থির, নিস্তব্ধ।

পুনা এবং খান্ডালার উচ্চতায় বিশেষ তফাৎ নেই। পুনা স্বয়ংই বেড়াতে যাবার জায়গা। বম্বে থেকে ট্রেন, বাস অথবা শেয়ার ট্যাক্সিতে দিন রাতের যে কোনও সময় সাড়ে তিন ঘণ্টায় পৌঁছনো যায়। কলকাতার মতো এখানেও বুদ্ধিজীবীদের রবরবা। ডেকান জিমখানা অঞ্চলে, এরা বলে ডেকান, কফি আর চায়ের পেয়ালা নিয়ে মারাঠি ছেলেমেয়েরা তর্কের ঝড় তোলে। কাছেই খড়কভাসলা— মিলিটারি একাডেমি। অপূর্ব সুন্দর এক উপত্যকার মধ্যে পৌঁছে বিশ্বাস হয় না এখানে মানুষ আদৌ অস্ত্রের কথা, যুদ্ধের কথা ভাবতে পারে।

পুনা থেকে বাস ছাড়ে পাঁচগনির এবং মহাবলেশ্বরের। মহারাষ্ট্রের অন্যতম এবং সত্যিকারের হিলস্টেশন। পুনা থেকে পাঁচগনি একশো কিলোমিটারের একটু বেশি। ওয়াই নামের একটি প্রাচীন জনপদ পড়বে পথে, তার একটু পরে পাহাড়ে ওঠার শুরু। অধিকাংশ সময় রাস্তাটা পাহাড়ের গা বেয়ে চড়তে থাকে যার একদিকে পুনার বিস্তৃত প্লেন্‌স্‌ বা সমতল। ক্রমে সেই ডানদিকে দু-একটা পাহাড় দেখা যায়। তারাই যেন কখন অজান্তে সারের পিছনে সার দিয়ে সমুদ্রের অগুনতি ঢেউ-এর আকার নেয়। হঠাৎ মনে হবে সমুদ্র বুঝি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঢেউগুলি নিশ্চল। এক একটি পাহাড়ের শ্রেণির এক-এক রকম রং। সমুদ্র কখন নীল হয়ে যায়, নীল থেকে ধূসর হয়ে আকাশকে ছুঁয়ে থাকে। মনে হবে পাহাড়ের ঢেউ বুঝি অনন্তকে ছুঁয়ে আছে।

পাঁচগনির উচ্চতা ১২০০ মিটার বা ৪০০০ ফুট। শীতকালে বেশ ঠান্ডা পড়ে। অন্য সময় দিনে একটু গরমই হয়। সন্ধ্যার পর একটা সোয়েটার হলে ভালো। বৃষ্টিও বেশি হয় না। সুতরাং সারা বছর মানুষ থাকতে পারে। মূলত আবহাওয়ার কারণেই এখানে কয়েকটি আবাসিক স্কুল আছে। বম্বের, পুনার সম্পন্ন নাগরিকদের ছেলে-মেয়েরা পাঁচগনির স্কুলে পড়তে আসে। শহরের বাজার অঞ্চলটাতেই জন-সমাগম। বাজারের ওপরের পাহাড়ের গায়ে গাছপালার ফাঁকে নতুন পুরানো বাড়ি। স্থানীয় দীর্ঘকালের অধিবাসী এবং কিছু আদিবাসী শহরের স্থায়ী বাসিন্দা।

যে পাহাড়ের ওপর পাঁচগনি, সেই পাহাড়ই পাঁচগনির প্রধান দ্রষ্টব্য। মনে হবে পাহাড়ের চূড়া কেউ যেন ছুরি দিয়ে কেটে সমতল করে দিয়েছে। এটা একটা প্রাকৃতিক ঘটনা, মানুষের করা নয়। শহর থেকে ওপরে উঠলে পাহাড়ের মাথায় প্রকাণ্ড সমতল জায়গা, দু চারটে ফুটবলের মাঠ হতে পারে। দেখেছি ফুটবল খেলাও হচ্ছে।

ছোট শহরে যেমন হয়, দোকানপাট বেশি নেই। পণ্যসম্ভারও সামান্য। তবে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত, বিলিতি ধাঁচের আবাসিক স্কুল আছে বলে টিনের খাদ্যাদি এবং কিছু সৌখিন জিনিসও পাওয়া যায়। বৃষ্টিপাত বেশি হয় না আগেই বলেছি। ৬০ ইঞ্চি। প্রকৃতির নিয়মকানুন সব সময়েই মানুষের কীর্তিকলাপকে হার মানায়। মাত্র ১২ মাইল বা কুড়ি কিলোমিটার দূরে ওই পর্বতশ্রেণীর ওপর মহাবলেশ্বর শহরে বৃষ্টি হয় বছরে ৩৫০ ইঞ্চি। অথচ মহাবলেশ্বরের উচ্চতাও তেমন বেশি নয়। সাড়ে চার হাজার ফুট।।

পাঁচগনি থেকে মহাবলেশ্বর যাবার পথটি বড় মনোরম। বাস অথবা গাড়িতে যেতে হবে। কখনও বাঁপাশে, কখনও ডানপাশে গভীর খাদ। বাঁপাশে খাদের ওপারে লিঙ্গমালা ফলস্‌, জলের দীর্ঘ ধারা পাহাড়ের বুকে ব্রাহ্মণের পুষ্টপৈতের মতো দেখায়। মাঝে মাঝে দুদিকেই সমভূমিতে স্ট্রবেরির চাষ। এই সুমিষ্ট, লোভনীয় ফলের গুল্ম শতবর্ষ আগে কোন এক সাহেব বিদেশ থেকে আমদানি করেছিলেন। ঠিক ঋতুতে পৌঁছলে রাস্তাতে তার স্বাদও নেওয়া যায়। দূরে হঠাৎ দিগন্ত জুড়ে ঘন সবুজের ছোপ দেখা যাবে। মহাবলেশ্বর। বাড়িঘর দেখা যায় না। শুধু গাছ। অল্পই সময় লাগে পৌঁছতে, আধঘণ্টা।

মহাবলেশ্বর একদা বম্বের প্রাদেশিক সরকারের গ্রীষ্মাবাস ছিল। আমাদের যেমন দার্জিলিং। গরমের সময় বিশেষ ঠান্ডা হয় না। যদিও সাহেবদের রীতি অনুসরণ করে বম্বে পুনার ধনাঢ্যেরা এপ্রিল মে-তে মহাবলেশ্বরে ভিড় জমান। শহরে ঢোকবার মুখেই একটি ছোট লেক। ওই সময় জল বেশি থাকে না। তবুও তার চারপাশে সকাল বিকাল অনেক ভ্রমণকারী জড়ো হন প্রতিদিন।

শহর মহাবলেশ্বর ছায়া-শীতল। গাছের আড়ালে বাড়িগুলো সব দেখা যায় না। বর্ষার অব্যবহিত পরে গেলে পথঘাটও নির্জন। বড় শহর থেকে গেলে খুব স্বাদবদল হয়। অসংখ্য হোটেল মহাবলেশ্বরে। নানা মূল্যের, নানা শ্রেণীর। নিরামিষাশীদের জন্য কয়েকটি বিশিষ্ট হোটেল আছে। সব হোটেলে মাছ-মাংস নাও পাওয়া যেতে পারে।

মহাবলেশ্বরে বাজারটা আরও ছোট। বাইরে থেকে যাঁরা আসেন, তাঁদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পুনা-বম্বে থেকে সঙ্গে আসে। এখানে স্থায়ী বাসিন্দা খুব সামান্য। কারণ বৃষ্টির দৌরাত্ম্যে সারা বছর মহাবলেশ্বরে বাস করাই যায় না। বর্ষার আগেই সব বাড়ির দরজা জানালা সীল হয়ে যায়। আমি একবার বর্ষান্তের রূপ দেখতে গিয়েছিলাম। তখনও হাওয়ায় শীত, লেকটা জলে টৈটুম্বুর। প্রাচীন বৃক্ষের সারির পাতাগুলো আলাদা করে চেনা যায় না— একটা ঘন, জমাট সবুজ। শহরে জনপ্রাণী নেই মনে হয়। বাজারে দুটি তিনটি দোকান খোলা। যাদের কোথাও যাবার নেই তেমন দু-চারশো মানুষ বর্ষার প্রবল ধারাবর্ষণ সহ্য করেছে দু-মাস। আর আছে বড় বড় বাড়ির মালি ও পাহারাদার। পাহারা দেবার কিছু নেই। কিন্তু ঘরগুলোকে বাসযোগ্য রাখতে মাঝে-মাঝে ভেতরে আগুন জ্বালাতে হয়, নইলে স্যাঁতস্যাঁতে, ভিজে ক্ষয়ের রোগ সব কিছু নিঃশব্দে ধ্বংস করতে থাকে।

মহাবলেশ্বরে দেখার মধ্যে কয়েকটি উচ্চ চূড়া বা পীক। এবং নানা পয়েন্ট, যেখান দিয়ে দূর

পাহাড় বা কাছের প্রান্তর বা অনেকদূরের পুনার আলো কিংবা সাতারার সমতল দেখা যায়। সব পাহাড়েই যেমন থাকে। এক এক পয়েন্ট থেকে এক এক রকম দৃশ্য। মহাবলেশ্বরের বৈশিষ্ট্য হল তার ওয়াক্‌স্— বা ভ্রমণের পথগুলি। দীর্ঘ বিশাল বনস্পতির ছায়ায় ঘেরা এই নির্জন পথগুলি দিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়ানো যায়। সমস্তক্ষণ গাছে গাছে ঝিঁঝি-র ঐকতান। শুনতে শুনতে এক সময় শব্দ ও দৃশ্য মিলে মিশে একাকার, একটু বুঝি নেশাও ধরে।

কিছুকাল আগেও এমনই এক নির্জন পথ ধরে পুরানো মহাবলেশ্বর যাওয়া যেত। এখনও যায়। কিন্তু পথের সেই শোভা নেই। আলো-ছায়ায় আঁকা অরণ্য পথ, মাঝে মাঝে গাছের জটলা গভীর। দুপাশে দেখা যেত অজস্র কাঠগোলাপ ফুটে আছে। এই অঞ্চলে বন্য কাঠগোলাপের প্রাচুর্য। আর, সমস্তক্ষণ অবিরাম ঝিঁঝি-র গুঞ্জন। চার পাঁচ কিলোমিটারের পথ। পুরানো মহাবলেশ্বর গ্রামটি ছোট। এখানে মহাবলেশ্বর ও অতিবলেশ্বরের মন্দির। একটি দেবীমন্দিরও আছে। প্রচলিত লোককথা বলে, এই পৃথিবীতে ঘোর ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী অসীম বলশালী দুই ভাই ছিলেন। তাঁদের নাম মহাবলেশ্বর ও অতিবলেশ্বর। দুজনেই ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। দুই ভাইয়ের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে শিব মহাবলেশ্বর নাম গ্রহণ করেন। সেই নামে শিবমন্দির। তেমনি অতিবলেশ্বর নাম নিয়েছিলেন বিষ্ণু। সেই নামে বিষ্ণুমন্দির।

মহাবলেশ্বরে দ্রষ্টব্য পয়েন্টগুলি দেখার পর একদিন প্রতাপগড় দুর্গে যাওয়া যেতে পারে। মহাবলেশ্বর থেকে আট-মাইল দূরে। ট্যাক্সি ও বাস চলে। মহাড়ের পথে খানিকটা নিচে দুর্গের পাদদেশে একটি গ্রাম। আবার খানিকটা ওপরে উঠলে প্রতাপগড় দুর্গ— সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচুতে। শিবাজি এই দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে। দুর্গের প্রথম তোরণ পার হয়ে একটি নাতি-উচ্চ স্তম্ভ। তার নাম আবদাল্লার স্তম্ভ। বিজাপুরের সেনাপতি আফজল খাঁ-র আর একটা নাম আবদাল্লা। ১৬৫৯ সালে আফজল খাঁ শিবাজিকে শায়েস্তা করবার জন্য দুর্গের পাদদেশে এসে পৌঁছন। স্থির হয় দুজনে আলোচনা করে মীমাংসায় আসবেন। দুর্গের নিচে আলোচনার সময় শিবাজি বিখ্যাত বাঘনখ অস্ত্র দিয়ে আফজল খাঁকে হত্যা করেন। ঘটনাটি সম্বন্ধে দ্বিমত আছে। অনেকে বলেন, আফজল খাঁই প্রথমে শিবাজিকে আক্রমণ করেছিলেন। শিবাজি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আফজলকেই বধ করেন। দুর্গে ওঠবার পথের বাঁদিকে ওই ঐতিহাসিক ঘটনার স্থানে আফজল খাঁ-র স্মৃতিসৌধ আছে। দুর্গের ভেতরে যেখানে আফজল খাঁ সমাধিস্থ, সেখানে নির্মিত হয় আবদাল্লা স্তম্ভ।

এই দুর্গে দর্শনীয় স্থান শিবাজির আরাধ্যা দেবী ভবানীর মন্দির। মন্দিরের অনেক গভীরে, নীরন্ধ্র অন্ধকারে দেবীমূর্তি দেখতে পাওয়া যায় না। বাইরে থেকে গবাক্ষ পথে আরসি দিয়ে সূর্যের প্রতিফলিত আলোয় বিগ্রহ দেখতে হয়। প্রায় আধিদৈবিক দৃশ্যের অভিজ্ঞতা।

মহাবলেশ্বরে কিছু আদিবাসী আছে। তাদের হাতের বিশেষ কোনও কাজ বিক্রি হতে দেখিনি। ঝুড়ি, চুপড়ি জাতীয় কিছু জিনিস পাওয়া যায়। কয়েক ঘর চামড়ার কারিগর আছে। অনেকে জুতা তৈরি করান, কেনেন। মহাবলেশ্বরের বিশিষ্ট উৎপাদন হল মধু। বড় মৌমাছি-পালন কেন্দ্র আছে। নানা সৌরভের, জাম, জামরুল ইত্যাদি, তাজা সুস্বাদু মধু সঙ্গে নিয়ে আসবার মতো।

অনুকূল ঋতুতে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) ছোট ছুটি কাটাবার প্রশস্ত স্থান পাঁচগনি, মহাবলেশ্বর। হোটেল ও আহারাদির দাম সহনীয়। বিশেষ করে যদি বম্বে-পুনার আশেপাশে এসে থাকেন। নইলে এখান থেকে রেলভাড়া দিতে হলে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে।

কন্টিনেন্টাল
172, Lenin Sarani, Kol-700 013.
Ph: 2212-7715/4090
Mobile: 98311 25446/98303 08705
সরকারি/বেসরকারি হোটেল বুকিং

কাশ্মীর	সিকিম
পশ্চিমবঙ্গ	কুমায়ুন
রাজস্থান	মধ্যপ্রদেশ
কেরালা	মেঘালয়
অরুণাচল	গাড়োয়াল
হিমাচল প্রদেশ	তামিলনাড়ু
লে-লাদাখ	অন্ধ্রপ্রদেশ
ওড়িশা	অসম
দক্ষিণ ভারত	গুজরাট
উত্তরপ্রদেশ	মহারাষ্ট্র-গোয়া

Spl. Discount
ON LINE BOOKING
www.continentaltravels.co.in
-: Branch :-
Lalbazar-9831125446
Gariahat-9830111999 Kasba-2415 0032
Jadavpur-9883205816 Belghoria-8420057891
Krishnanagar-9233972873 Naihati-9874763053
Kalyani-9433351219 Budge Budge-9831735373
Kalna-9932252423 Durgapur-9851105701
Jamshedpur-9835183717 Raigunge-9434120910
Siliguri-9836006067 Jalpaiguri-9800311833

SKY HIGH RESORTS
13A, BAG BAZAR STREET, KOL-700003
NEAR GIRIS MANCHA
M: 9836020731/9836739437/9830078453
WEBSITE - www.skyhigh-resorts.com
OUR OWN HOTEL AT
ZULUK-CHUNG CHUNG HOTEL
LUNGTHUNG-CHUNG CHUNG HOTEL
RISHYAP-BLUE SKY HOTEL
TINCHULEY-TINCHULEY RETREAT
SILLERY GAON-WIBA ECO RESORT
RESHI KHOLA-RESHI RIVER CAMP
ALSO HOTEL BOOKING AT
LAVA, LOLEGAON, KALIMPONG, KOLAKHAM, ENTIRE SIKKIM, DOORS, DIGHA, PURI, MANDARMONI, TAJPUR.
PACKAGE TOUR
KASHMIR, RAJASTHAN, VIZAG, ARUNACHAL PRADESH, SHILONG.

GLACIER TRAVELS Govt. Regd.
SUDIPTA : 9432014650/9331613734
GOUTAM : 9433305726
প্রতিদিন ফ্যামিলি প্যাকেজ/হোটেল ও গাড়ি
OLD SILK ROUTE & GURUDONGMAR
সিলারি, রেশি, আরিটার, জুলুক, থাম্বি, নাথাং, এলিফ্যান্ট লেক, কুপুপ, গ্যাংটক, ইয়ুমথাং, গুরুদোমার
NEPAL
কাঠমান্ডু, পোখরা, চিতওয়ান, নাগারকোট, লুম্বিনি, মুক্তিনাথ (By Road/Air)
PRISTINE SIKKIM
ওখরে, বার্সে, হিলে, রিনচেনপং, উত্তরে, কালুক, হি, বারমিওক
DOOARS
গরুমারা, জলদাপাড়া, সামসিং, সুনতালেখোলা, ঝালং, বিন্দু, বক্সা, জয়ন্তী, চিলাপাতা
BHUTAN
থিম্পু, পারো, পুনাখা, বুমথাং
KASHMIR
জম্মু, শ্রীনগর, সোনমার্গ, গুলমার্গ, পহেলগাঁও, পাটনিটপ, কাটরা
GOA | ASSAM | MANAS
Hotel Booking: দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, নৈনিতাল, রানিখেত, কৌশানি, হরিদ্বার, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, পাটনিটপ, দিল্লি, আগ্রা, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, বিকানির, পুষ্কর, মাঃ আবু, জয়সলমির, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর সহ সমগ্র ভারত
286, B.B.Ganguly Street, 1st Floor, Kolkata-700 012
glacier_travel@yahoo.co.in
www.glaciertravels.com

২১ বছর আগের ভ্রমণ থেকে

শঙ্কু মহারাজ

মহাদেবের পদতলে

গঙ্গোত্রী মন্দির □ ভাস্করণ ভট্টাচার্য

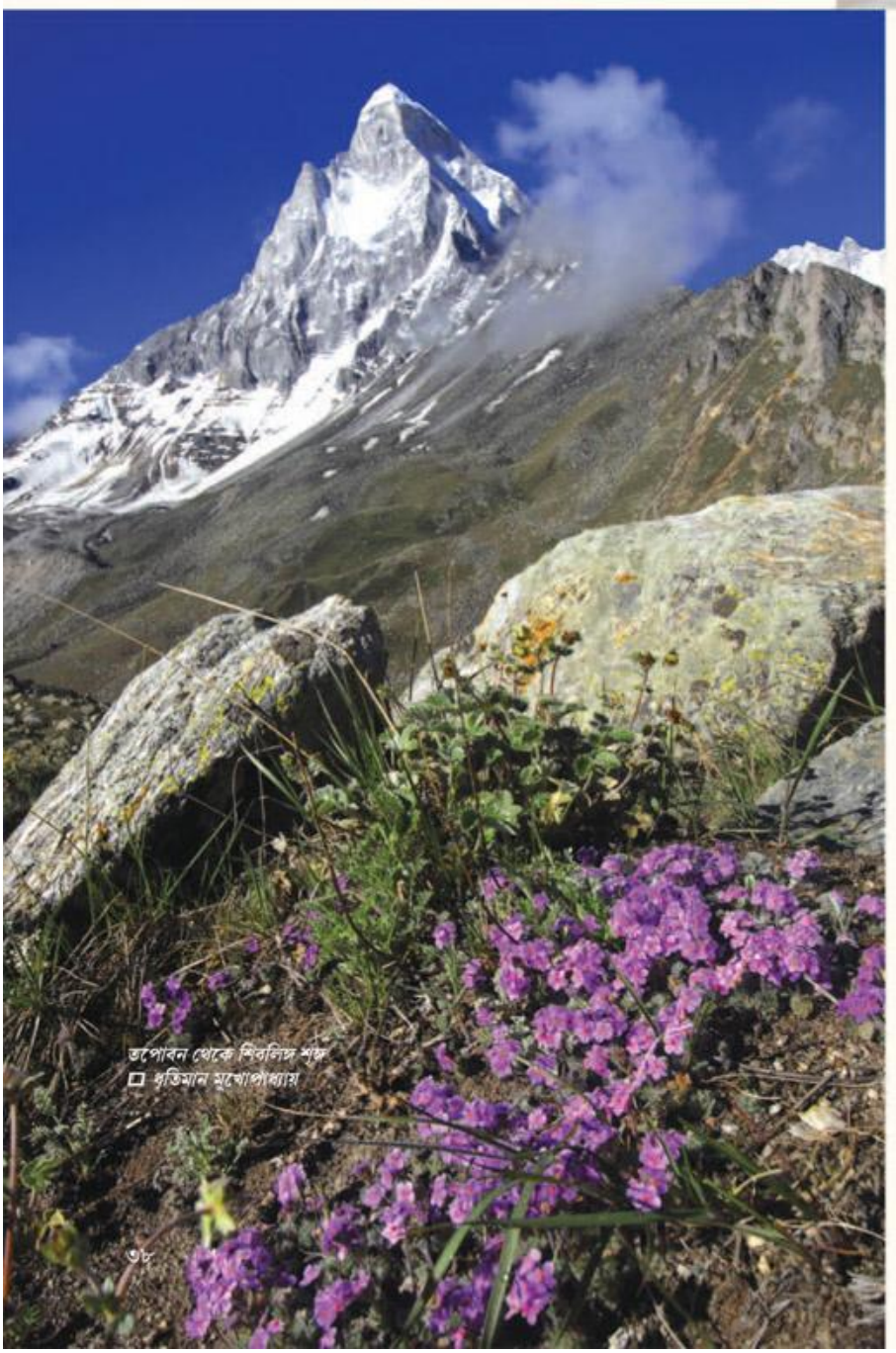

তপোবন থেকে শিবলিঙ্গ শৃঙ্গ
□ ধৃতিমান মুখোপাধ্যায়

ভ্রমণের আরেক নাম জীবন। জীবনের মতো ভ্রমণেও যেমন আনন্দ আছে, তেমনি আছে বেদনা। জীবনের মতো সুখ আর দুঃখকে নিয়েই ভ্রমণ। ভ্রমণের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য মানুষের অকালে জীবনাবসান হয়েছে। তবু ভ্রমণের প্রতি মানুষের আকর্ষণ কিছুমাত্র কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে।

ভ্রমণ দূরকে নিকট করে, পরকে আপন করে, দুর্গমকে সুগম করে। ভ্রমণ মনের সংকীর্ণতা দূর করে মানুষকে আরও উদার আরও মহৎ করে তোলে। তবু কেউ কেউ বলেন ভ্রমণ একটা নেশা, একটা বাতিক কিংবা একপ্রকার রোগ। কথাগুলো বোধকরি মিথ্যে নয়। কারণ একবার যে ভ্রমণের আনন্দ আস্বাদন করেছে, তাকে আর ঘরের মায়া বন্দী করতে পারে না। সকল প্রতিকূলতার মাঝেও সে পথে বেরিয়ে পড়ে।

ভ্রমণ বলতে আমাদের দেশে আমরা আজকাল প্রধানত চার রকমের পরিক্রমা বুঝে থাকি। প্রমোদ-ভ্রমণ, তীর্থভ্রমণ, পদযাত্রা ও অভিযান। হিমালয়ের কোনো শৈলাবাস থেকে সমতলের যেকোনো রমণীয় স্থান দর্শনই প্রমোদ-ভ্রমণ। লাদাখের হেমিস অথবা কাশ্মীরের অমরনাথ থেকে কন্যাকুমারী, কিম্বা কামাখ্যা থেকে বেটদ্বারকা পর্যন্ত যেকোনো ধর্মের যেকোনো তীর্থ দর্শনকেই তীর্থভ্রমণ বলা হয়। হিমালয়ে কিম্বা সমতলে পায়ে হেঁটে বেড়ানোকে আমরা বলি পদযাত্রা। গঙ্গোত্রী থেকে তপোবন, গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথ যেমন পদযাত্রা, তেমনি শ্রীরামপুর থেকে তারকেশ্বর যাওয়াও পদযাত্রা। তবে পদযাত্রার পথটি দুর্গম হলে তার সঙ্গে অভিযানের কিছু রোমাঞ্চ মিশ্রিত থাকে।

অভিযান বলতে আমরা কোনো বিপদসঙ্কুল দুর্গম যাত্রাকে বুঝে থাকি। যেমন ছোট একখানি নৌকো করে দুটি মানুষ যদি কলকাতা থেকে আন্দামান পাড়ি দেন কিম্বা কয়েকজন মানুষ তাঁবু আর রসদ সম্বল করে রাজস্থানের

গোমুখ থেকে ভাগীরথী শৃঙ্গ □ ভাস্বরণ ভট্টাচার্য

মনুষ্যবসতিহীন মরুভূমিতে অথবা হিমালয়ের পথহীন অঞ্চলে গিয়ে নতুন কিছু জেনে আসেন, তাহলে আমরা সেই যাত্রাকে অভিযান বা 'এক্সপিডিশান' বলে থাকি। কিন্তু অভিযান বললে আমরা সাধারণত পর্বতাভিযানকেই বুঝি। এবং বলাবাহুল্য পর্বত মানে হিমালয় পর্বতমালা।

পর্বতাভিযান এখন আমাদের দেশে একটি জনপ্রিয় স্পোর্টস। স্বাধীন ভারত এ পর্যন্ত মাত্র একটি অলিম্পিক স্বর্ণপদক লাভ করেছে, কিন্তু ভারতের অভিযাত্রীরা কয়েকবার বিশ্বের উচ্চতম পর্বতশিখর এভারেস্ট-এ জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেছেন।

সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগে এখন আমাদের দেশে প্রতিবছর প্রায় অর্ধশতাধিক পর্বতাভিযান আয়োজিত হচ্ছে এবং প্রতিবছরই সেই অজানাকে জানা ও দুর্গমকে জয় করার জন্য দু-চারটি করে তাজা প্রাণ আমাদের হিমালয়কে বলি দিতে হচ্ছে। কিন্তু সেইসব দুর্ঘটনা পর্বতারোহণের প্রতি অভিযাত্রীদের আকর্ষণ কিছুমাত্র কমাতে পারেনি। কারণ জীবনে একবার যে হিমালয়ের অন্তহীন বিচিত্র-সুন্দর ভয়ঙ্কর রূপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, সে আর তার আর্কষণ-মুক্ত হতে পারে না। তাই সব ভ্রমণের মধ্যে হিমালয়ের পথ পেরোনোই সবচেয়ে বড় নেশা। হিমালয় ছাড়া আর কেউ হিমালয়-রোগের চিকিৎসা করতে পারে না।

পর্বতাভিযান সম্পর্কে এত প্রস্তাবনার পরেও বলব, আমি কিন্তু আজ কোনো পর্বতাভিযানের কথা লিখতে বসিনি। আমি একটা সহজ-সরল পদযাত্রার কথা বলতে বসেছি। আপনারা সবাই জানেন আজকাল হরিদ্বার কিম্বা ঋষিকেশ থেকে গঙ্গোত্রী যেতে পদযাত্রার প্রয়োজন পড়ে না। বাসে বসেই গঙ্গোত্রী পৌঁছনো যায়।

গঙ্গোত্রী কেবল পুণ্যভূমি নয়, হিমালয়ের একটি রমণীয়তম উপত্যকা। বাস-টার্মিনাস, দোকানপাট ও অসংখ্য যাত্রীর আসা-যাওয়া সত্ত্বেও গঙ্গোত্রী এখনো সবুজ-সুন্দর দেবভূমি। কেদারগঙ্গা এখানে এসে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। উচ্চতা ১০,৩০০ ফুট। আছে ধর্মশালা, ডাকবাংলো, বনবিশ্রাম গৃহ, যাত্রীনিবাস আর সাধুমহারাজদের আশ্রম। আছে ডাক ও তারঘর আর মন্দির। মন্দির ছাড়া আরও অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে গিরিতীর্থ গঙ্গোত্রীতে— ভগীরথ শিলা, সূর্যকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড, শিবের জটা ও ভৈরব মন্দির প্রভৃতি।

তীর্থের নিয়মানুযায়ী, তিন রাত গঙ্গোত্রীতে বাস করতে হয়। ফেরার পথে একরাত থাকতে হবে বলে, দুটি রাত কাটিয়ে তৃতীয়দিন সকালেই আপনি গোমুখের পথে বেরিয়ে পড়বেন। গোমুখী পর্যন্ত যাবার জন্য যেমন পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন নেই, তেমনই দরকার নেই মালবাহকের। কারণ ভুজবাসায় স্বামী লালবিহারীজীর ধর্মশালা কিম্বা ডাকবাংলোয় রাত্রিবাসের জন্য বিছানাপত্র সবই পাওয়া যাবে। কিন্তু আপনি তো তীর্থযাত্রী নন, আপনি তো গোমুখী পৌঁছেই যাত্রার যতি টানছেন না! আপনি হচ্ছেন পদযাত্রী। আপনি যে গোমুখী ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবেন। গঙ্গোত্রী হিমবাহের ওপরে পদচারণা করে আপনাকে যেতে হবে তপোবনে। তাই আপনাকে একজন মালবাহক-কাম-পদপ্রদর্শককে সঙ্গে নিতে হবে। নিতে হবে কম্বল অথবা স্লীপিং ব্যাগ এবং কিছু খাবার।

মালবাহক তথা পথপ্রদর্শক আপনি গঙ্গোত্রীতেই পেয়ে যাবেন। তাকে নিয়েই তৃতীয়দিন সকালে বেরিয়ে পড়বেন ভাগীরথীর উৎস গোমুখীর পথে। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখী ১৯ কিলোমিটার। গোমুখীর উচ্চতা ১২,৭৭০ ফুট। পথে ভুজবাসায় রাত কাটাতে হবে। গঙ্গোত্রী থেকে ভুজবাসা ১৪ কিলোমিটার। ভুজবাসার উচ্চতা ১২,৪০০ ফুট। সুতরাং চড়াই পথ, কিন্তু তেমন দুর্গম নয়। সকালে রওনা হয়ে বিকেল নাগাদ আপনি ভুজবাসা পৌঁছে যাবেন।

পরদিন কিন্তু সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়তে হবে। ভাগীরথীর তীরে তীরে চলবেন এগিয়ে। আজকের পথ আর তেমন চড়াই নয়। কারণ ভুজবাসা থেকে গোমুখী মাত্র ৩৭০ ফুট উঁচু। কিন্তু পাথর ডিঙিয়ে পথ চলতে হবে বলে কিছু পরিশ্রম হবে আর খানিকটা সময়ও লেগে যাবে। তাহলেও, সকাল সাতটা নাগাদ যদি ভুজবাসা থেকে বেরিয়ে পড়তে পারেন, তাহলে ৫ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে গোমুখী পৌঁছতে বড়জোর বেলা দশটা। তার বেশি লাগতেই পারে না। অবশ্য যদি ঝড় না ওঠে অথবা বরফ না পড়ে। কিন্তু আপনি তো যাবেন সেপ্টেম্বরের শেষে কিম্বা অক্টোবরের প্রথমে। তখন আকাশ পরিষ্কার থাকারই কথা। বিশেষ করে বিকেলের আগে ঝড় কিম্বা তুষারপাতের সম্ভাবনা খুবই কম। অতএব আশা করতে পারেন যে বেলা

দশটার আগেই আপনি পৌঁছে যাবেন গোমুখী।

গোমুখী হল গঙ্গোত্রী হিমবাহের 'স্নাউট' বা নাসিকা। এটি গঙ্গার প্রধান ধারা ভাগীরথীর উৎস। প্রকৃতপক্ষে দেবপ্রয়াগই গঙ্গার জন্মভূমি। কারণ ভাগীরথী ও অলকানন্দা সেখানে মিলিত হবার পরেই সেই মিলিতধারার নাম হয়েছে গঙ্গা। তবু গঙ্গার উৎস বলতে আমরা ভাগীরথীর উৎস গোমুখীকেই বুঝে থাকি।

যাক গে, যেকথা বলছিলাম। গঙ্গার উৎস গোমুখী পরম পবিত্র স্থান। সুতরাং আপনি পদযাত্রী হলেও সেখানে আপনাকে তীর্থযাত্রীর কিছু কাজ করতেই হবে। তর্পণ করতে পারলে ভাল হয়, না পারলেও পিতৃপুরুষদের জল দিতেই হবে। করতে হবে গঙ্গাপূজা। সম্ভব হলে গঙ্গা স্নান করে নেবেন। না হলে অন্তত জলস্পর্শ করে, গায়ে-মাথায় জল ছিটিয়ে নিতে হবে।

তারপরেও কিছু কাজ থাকবে— যেমন গোমুখী ও গঙ্গোত্রী হিমাবাহের ছবি তোলা আর কিছুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম করা, কিছু খেয়ে নিয়ে ওয়াটার বটলে জল ভরে নেওয়া। তারপরে শুরু হবে পদযাত্রা, হিমালয়ের অন্তরলোকে প্রবেশ করার পদচারণা।

গোমুখীতে তীর্থযাত্রীর পথ শেষ হয়েছে কিন্তু পদযাত্রী ও পর্বতাভিযাত্রীর পথ হয়েছে শুরু। গোমুখীতে যেমন গঙ্গোত্রী হিমবাহের শেষ, তেমনি এখানে তীর্থপথও শেষ হল। আর এখান থেকেই শুরু পর্বতাভিযাত্রী ও পদযাত্রীদের যাত্রাপথ। গোমুখী, গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের প্রবেশতোরণ।

গঙ্গোত্রী হিমবাহ ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ, এটি গাড়োয়াল হিমালয়ের বৃহত্তম হিমবাহ। এই হিমবাহ অঞ্চলে বিশ হাজার ফুটের চেয়ে উঁচু অর্ধশতাধিক পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু চৌখাম্বা, ২৩,৪২০ ফুট। আর চৌখাম্বা থেকেই শুরু হয়েছে গঙ্গোত্রী হিমবাহ।

গোমুখীর কাজকর্ম শেষ করে আপনাকে আবার চলে আসতে হবে সেই পাথুরে সমতলের বাঁদিকে। দেখতে পাবেন আপনার সামনে একটা পাথরবোঝাই ঢাল। আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গিয়েছে। গোমুখীকে ডানদিকে রেখে এই ঢাল বেয়ে আপনাকে ওপরে ওঠা শুরু করতে হবে। আগেই বলেছি, এটা তীর্থযাত্রীর পথ নয়, পদযাত্রী কিম্বা পর্বতাভিযাত্রীদের পথ। হিমালয়ের অন্তরলোকে প্রবেশ করার প্রথম তোরণ। অতএব দেখে-শুনে সাবধানে এগোতে হবে। প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই দম ফুরিয়ে আসতে চাইবে। তাই মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়ে চড়াই ভাঙতে হবে আপনাকে। কিছুক্ষণ বাদে দেখতে পাবেন আপনি উঠে এসেছেন ওপরে, গঙ্গোত্রী হিমবাহের গ্রাবরেখায় আর সেইসঙ্গে আপনার দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে হিমালয়ের অন্তরলোকে, একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত।

গোমুখীতে দাঁড়িয়ে যে শিবলিঙ্গ পর্বতের (২৩,৪৬৬ ফুট) শুধু শিখরটি দেখতে পাচ্ছিলেন, সে এখন তার সম্পূর্ণ দেহটি নিয়ে আপনার ডাইনে দাঁড়িয়ে। তার দিকে তাকিয়েই আপনি মনে মনে বলে উঠবেন সার্থকনামা শিবলিঙ্গ। সত্যিই তাই। এত খাড়া ও এমন বরফ ছাড়া এত উঁচু পাহাড় পৃথিবীতে আর নেই। কেবল তার মাথায় একটুখানি জায়গা জুড়ে একফালি শাদা আস্তরণ। যেন সাদা পাগড়ি মাথায় বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেবাদিদেব।

কিন্তু কেবল তো তার দিকে তাকিয়ে থাকলেই চলবে না, আপনাকে যে সামনেও তাকাতে হবে একবার। আর তাকিয়েই দেখতে পাবেন ভাগীরথী পর্বতশ্রেণীকে। একটি নয়, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তিনটি তুষারাবৃত পর্বতশিখর। উচ্চতা যথাক্রমে ২২,৪৯৫, ২১,৩৬৪ ও ২১,১৭৬ ফুট। ডানদিকে এক, বাঁদিকে দু নম্বর আর মাঝখানে তিন নম্বর। ফলে ওদের আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

আপনি আজ সকালে ভুজবাসা থেকেই দেখতে পাচ্ছিলেন ওদের। তবে ওদের সঙ্গে দেখেছেন ২১,৩৫০ ফুট উঁচু সুদর্শন পর্বতকেও। আপনার বাঁয়ে। তাকে কিন্তু এখন আর দেখতে পাবেন না। কারণ বাঁদিকের একটা পাথরের দেয়াল তাকে আড়াল করে রেখেছে।

পাথর তো চারিদিকেই। বিরাট বিরাট পাথর। দিগন্তবিস্তৃত ঢেউ খেলানো প্রস্তর প্রবাহ। আপনি দেখছেন পাথর, শুধুই পাথর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এই প্রস্তরপ্রবাহের নিচে বরফ রয়েছে। সেই বরফগলা জল এই প্রস্তরপ্রবাহ অর্থাৎ গ্রাবরেখার তলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গোমুখী গুহামুখ দিয়ে নির্গত হচ্ছে। সৃষ্টি করছে ভাগীরথী-গঙ্গা। আর গঙ্গোত্রী হিমবাহের এই গ্রাবরেখা-রূপ শেষাংশ দুপাশের পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া প্রস্তররাশিকে বুকে ধারণ করে আছে। তারই ওপর দিয়ে আপনার পথ। সেই পথ বেয়ে আপনি চলেছেন এগিয়ে। গঙ্গোত্রী হিমবাহের পূর্বপ্রান্তিক গ্রাবরেখার ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে।

কিছুক্ষণ পথচলার পরেই পাথরের আকার ছোট হতে থাকবে। গ্রাবরেখা দেখবেন অপেক্ষাকৃত সমতল হয়েছে। তখন আপনাকে ডানদিকে মোড় ফিরে আড়াআড়ি ভাবে গঙ্গোত্রী হিমবাহকে অতিক্রম করতে হবে। কাজটা কিন্তু সহজ নয়। কারণ গঙ্গোত্রী হিমবাহ এখানে প্রায় আট কিলোমিটার চওড়া।

তবে সাবধানে পথ চলে, আপনি অনায়াসে হিমবাহের অপরতীরে পৌঁছে যাবেন একসময়। আর সেখানেই দেখবেন হিমবাহের খাড়া পাড় বেয়ে একটি ঝরণা এসেছে নেমে। সেই ঝরণার তীরে তীরে চড়াই বেয়ে মাত্র শ'তিনেক ফুট ওপরে উঠতে হবে।

ব্যাস! আপনি পৌঁছে গেলেন শিবলিঙ্গ পর্বতের পাদদেশে— তপোবনে। জায়গাটার উচ্চতা ১৪,২৮০ ফুট। নরম মাটি আর সবুজ ঘাস। কঠিন পাথুরে পর্বতের পাদদেশে আর চিরতুষারাবৃত হিমবাহ অঞ্চলের সামান্য ওপরে এক বিস্ময়কর প্রায়-সমতল প্রান্তর। তিন কিলোমিটার দীর্ঘ ও প্রায় এক কিলোমিটার প্রশস্ত অতি রমণীয় স্থান। পদযাত্রীদের পরমানন্দ নিকেতন।

এই উচ্চতায়, পাথর আর তুষারের রাজ্যে, এমন নরম মাটি আর এতবড় সবুজ সমতল পৃথিবীতে বোধকরি খুব কমই আছে। কেবল সবুজ নয়, সেই সঙ্গে নানা রঙের ছোট ছোট ফুল আর কয়েকটি সদাচঞ্চল ঝরণা। শিবলিঙ্গের গা বেয়ে তারা নেমে আসছে অবিরত। সবুজ তপোবনকে সিক্ত ও সতেজ করে, গঙ্গোত্রী হিমবাহের বুকে আশ্রয় নিচ্ছে। মহাদেবের জটা থেকে গঙ্গা মর্তে অবতরণ করছেন।

শুনেছি বছর তিরিশ আগে জনৈক সন্ন্যাসী গ্রীষ্মকালে এখানে স্থায়ীভাবে বাস করতেন। সবাই বলেন তিনি এখানে তপস্যা করতেন। তপস্যা করবার উপযুক্ত স্থানই বটে। কিন্তু তখনকার দিনে, যখন খুবই কম পদযাত্রী এখানে আসতেন, তখন তিনি কী খেয়ে প্রাণধারণ করতেন, তা আজও একটা প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে।

যাক গে, সেই মহাযোগী সন্ন্যাসীর তপোভূমি বলেই গঙ্গোত্রীর মানুষ এ জায়গাটাকে তপোবন বলতে শুরু করেন, এবং সেই নামে সে আজ সুপরিচিত। সন্ন্যাসী এখন নেই, কিন্তু আছে তাঁর তপোবন।

আর আছে তাঁর গুহাটি। সেটিকেও তিনি পাথর-টাথর দিয়ে বাসোপযোগী করে তুলেছিলেন। আজও তাই দু-তিনজনের পদযাত্রীদল অনায়াসে তাঁবু ছাড়াই চলে আসতে পারেন তপোবনে। দু-একটা রাত এই গুহায় বাস করে শিবলিঙ্গ ও ভাগীরথী শৃঙ্গ সহ গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করে ঘরে ফিরে যেতে পারেন।

তপোবন পদযাত্রীদের পরমার্থনিকেতন কিন্তু পর্বতাভিযাত্রী-পরিত্যক্তও নয়। উত্তরকাশী পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা প্রতিবছর কয়েকবার করে এখানে শিবির স্থাপন করে পর্বতারোহণের প্রশিক্ষণ নিয়ে যান। তাঁরা সাধারণত ১৪,২৮০ ফুট উঁচু তপোবনের উত্তরপ্রান্তে অর্থাৎ তপোবন-সন্ন্যাসীর যে গুহায় আপনি রাত কাটাবেন, তারই কাছটিতে, ঝরণার তীরে শিবির স্থাপন করেন।

কেবল পর্বতারোহণ শিক্ষার্থীরা নন, পর্বতাভিযাত্রীদের কাছেও তপোবনের আকর্ষণ

কিছু কম নয়। শিবলিঙ্গ, ভৃগুপন্থ (২২,২১৮ ফুট), মেরু (২২,৫৫২ ফুট), কীর্তিস্তম্ভ (২০,৫১০ ফুট), ভাতৃখুন্টা (২১৫৮০ ফুট), কেদারনাথ ডোম (২২,৪১০ ফুট) ও কেদারনাথ শৃঙ্গ (২২,৭৭০ ফুট) প্রভৃতি পর্বতাভিযানের অভিযাত্রীদের, তপোবনেই মূল-শিবির স্থাপন করতে হয়।

আমাদেরও তাই করতে হয়েছিল, কেদারনাথ পর্বতাভিযানের সময়। পর্বতাভিযাত্রী না হয়েও আমি একদল পর্বতাভিযাত্রীর সঙ্গেই প্রথম তপোবনে এসেছি। প্রখ্যাত পর্বতারোহী অমূল্য সেন ছিলেন সেই অভিযানের নেতা। অভিযাত্রীরা কেদারনাথ ডোম শিখরে আরোহণ করেন কিন্তু আবহাওয়া হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যায়ে তাদের কেদারনাথ শৃঙ্গ থেকে ফিরে আসতে হয়।

এই অভিযানের সময় আমাকে প্রায় পনেরোদিন তপোবনে বাস করতে হয়েছে। আর সেটি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের এক মধুরতম স্মৃতি। সেই অভিজ্ঞতার সামান্য স্মৃতিচারণ করে আজকের এই ভ্রমণকথায় যতি টানব।

আপনি যেখানে রাত কাটাবেন অর্থাৎ তপোবন-সন্ন্যাসীর সেই গুহার কাছে কিন্তু আমরা মূল-শিবির করিনি। আগেই বলেছি তপোবনের প্রান্তরটি লম্বায় প্রায় তিন কিলোমিটার। তারই উত্তরাংশে গুহা, উচ্চতা ১৪,২৮০ ফুট। প্রস্তরটি শিবলিঙ্গের পাদদেশ জুড়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহের বাঁ তীর ধরে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত। আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে গিয়েছে। আমরা মূল-শিবির করেছিলাম একেবারে সেই দক্ষিণসীমায়, জায়গাটার উচ্চতা ১৫,৫৪২ ফুট। আমরা বাসা বেঁধেছিলাম শিবলিঙ্গের পূর্বদিকে। আমাদের শিবিরের ঠিক উল্টোদিকে গঙ্গোত্রী হিমবাহের অপর পারে ভাগীরথী পর্বতমালা। তার তিনটি তুষারাবৃত শৃঙ্গকেই দেখা যেত সেখান থেকে। আর সে দেখা জীবনের এক সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন।

গঙ্গোত্রী হিমবাহ সেখানে প্রায় সাত কিলোমিটার চওড়া। কিন্তু শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হত, হাত বাড়ালেই বুঝি বা ধরা যাবে ভাগীরথীকে।

কিন্তু ভাগীরথীর কথা পরে হবে, আগে শিবলিঙ্গের কথা একটু বলে নিই। শিবলিঙ্গ ভয়ঙ্কর ও সুন্দর। তাকে 'ম্যাটারহর্ন অব ইন্ডিয়া' বলা হয়। বোধকরি ইউরোপের পর্বতপ্রেমীদের বোঝাবার জন্য। নইলে ম্যাটারহর্নের উচ্চতা যেখানে মাত্র ১৪,৭১৩ ফুট, শিবলিঙ্গ সেখানে ২১,৪৬৬ ফুট। আমি আল্পস পর্বতমালার ম্যাটারহর্ন শৃঙ্গ দেখেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, ম্যাটারহর্নকেই 'শিবলিঙ্গ অব দা আল্পস' বলা উচিত।

পাহাড় বললে আমরা সাধারণত একটি ত্রিভুজাকৃতি পাথর আর বরফের সুউচ্চ স্তূপ বুঝে থাকি। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পাহাড় সিকিমের সিনিয়লচু শৃঙ্গটিকেও (২২,৬০০ ফুট) আমি দেখেছি। তারও আকার একই রকম। কিন্তু শিবলিঙ্গকে দেখলে পাহাড় সম্পর্কে আমাদের সেই সহজাত ধারণাটি যায় হারিয়ে। প্রায় সাড়ে একুশ হাজার ফুট উঁচু একটি পর্বতশিখর যে এমন খাড়া, এত পাথরে বোঝাই আর তুষারহীন হতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সে সত্যই শিবলিঙ্গ। সেবারে আমি পনেরোটা দিন প্রকৃতপক্ষেই মহাদেবের পদতলে অতিবাহিত করেছি।

তবে আমাদের শিবির থেকে শিবলিঙ্গকে দেখতে হত ঘাড় উঁচু করে। কারণ আমি যে রয়েছি তাঁরই পদতলে। আর চোখ মেলে সামনে তাকালেই ভাগীরথী। অতএব তাঁকেই দেখতাম সারাদিন ধরে।

আমি ছিলাম অভিযানের ম্যানেজার অর্থাৎ দলের সর্দার। মূল-শিবির স্থাপিত হবার পর থেকে ধীরে ধীরে ডাক্তার সহ সমস্ত পর্বতারোহী সদস্যরা ওপরে চলে গেল। মূল-শিবিরে কেবল রয়ে গেলাম আমি ও তিনজন বটানিস্ট ও কয়েকজন মালবাহক। প্রতিদিন বিকেলে ওপর থেকে চিঠি আসত। তাতে থাকত অভিযাত্রীদের অগ্রগতির বিবরণ আর পরের দিন কোন কোন সাজসরঞ্জাম ও খাবার ওপরে পাঠাতে হবে, তারই তালিকা।

পরদিন সকালে মালবাহকরা রুটি-তরকারী তৈরি করে ফেলত। তাই দিয়েই সবার 'ব্রেকফাস্ট' হত। আর খানিকটা করে সঙ্গে নিয়ে কয়েকজন মালবাহক প্রয়োজনীয় মাল নিয়ে ওপরে চলে যেত। বাকিরা যেত নিচে, রক্তবরণ হিমবাহে, জ্বালানী কাঠ নিয়ে আসতে। আর বটানিস্টরাও 'প্যাক-লাঞ্চ' নিয়ে সংগ্রহে চলে যেতেন। সারাদিন সেই শিবির আগলাতে হত আমাকে আর মণিরামকে। বছর পনেরো বয়সের একটি নেপালি ছেলে। নেতা তাকে আমার ব্যক্তিগত পরিচারক করে দিয়ে গিয়েছে।

সঙ্গী হিসেবে মণিরাম মন্দ ছিল না। তবে আমরা দুজনেই হিন্দী-বিশারদ হবার জন্য মাঝে মাঝেই ভাষা বিভ্রাটের শিকার হতাম। আর মণিরাম রান্না করতে পারত না। আমিও এ কাজটা কোনদিনই রপ্ত করতে পারি নি। সকালের খাবার থেকে মণিরাম তার দুপুরের খাবার রেখে দিত। কিন্তু সাড়ে পনেরো হাজার ফুট উঁচু তুষার-শীতল প্রান্তরে আমি সকালের রুটি দুপুরে খেতে পারতাম না। তাই বিস্কুট আর চা কিম্বা কফি দিয়েই কোনো কোনো সময় আমি লাঞ্চ সেরে নিতাম। মণিরাম কোনোরকমে সারাদিনে আমাকে বারদুয়েক চা কিম্বা কফি বানিয়ে দিত। আর বিস্কুট কোম্পানিদের উদারতায় সেবারে আমরা প্রচুর বিস্কুট পেয়েছিলাম।

মণিরামের সঙ্গে গল্প করে বেশি সময় কাটানো সম্ভব ছিল না। তার ওপরে দিবানিদ্রার প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল ওর। তাই সকালে মালবাহক ও বটানিস্টরা কাজে চলে যাবার পরে আমি চিঠিপত্র রিপোর্ট পাঠানো এবং ডায়েরী ও হিসেব লেখা নিয়ে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিতাম। তারপরে আমার অফুরন্ত অবসর এবং আমি তখন একা।

না, না। আমি মোটেই একা ছিলাম না। ভাগীরথী সর্বদা সঙ্গে রয়েছে আমার। তার দিকে তাকালেই মনে হয়েছে স্বয়ং বিশ্বকর্মা বাটালি দিয়ে বরফ খোদাই করে বহু যত্নে সৃষ্টি করেছেন তাকে। সেখানেই শেষ নয়। তার সারা গায়ে সারাদিন রামধনুর খেলা। মেঘের আনাগোনায় আলোর তারতম্য আর তাতে তার শরীরে দিনভর রঙের বিবর্তন। একই সঙ্গে নানা রঙ, এবং তা অবিরত পরিবর্তনশীল। মনে হয়েছে কোনো অদৃশ্য মহাশিল্পী অনবরত তুলি বুলিয়ে চলেছেন।

জনহীন সৈকতে বসে সদাচঞ্চল সাগরকে দেখতে ভাল লাগে। ভাল লাগে কোনো বনবিশ্রাম গৃহের অলিন্দে বসে ঘনসবুজ বনের দিকে তাকিয়ে থাকতে। কিন্তু তাই বলে দিনের পর দিন সেই একই দৃশ্য দেখা যায় না। কয়েকদিনের মধ্যে তাকে একঘেয়ে বলে মনে হয়।

কিন্তু মহাদেবের পদতলে বসে পনেরোটি দিন ধরে সারাদিন তুষারমৌলি হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে আমি কিছুমাত্র ক্লান্ত হয়ে পড়িনি। বরং দিনগুলো আমার স্বপ্নের মতো কেটে গিয়েছে। সেই স্বপ্নমুখর দিনগুলো আজও আমার মানসপটে উজ্জ্বল।

তপোবনের সেই সঙ্গীহীন দিনগুলোয় প্রায় প্রতি মুহূর্তে আমি ঐ অদৃশ্য চিত্রকরের সুমধুর স্পর্শ অনুভব করেছি আমার সর্বসত্তা দিয়ে। অবাক হয়ে ভেবেছি তাঁর সীমাহীন শক্তির কথা। মানুষ যে তাঁর কাছে কতো ছোট তাও উপলব্ধি করেছি প্রতিক্ষণে— আর বার বার মনে হয়েছে আমি ধন্য, ধন্য আমার জীবন। যাঁকে পাবার জন্য জগতে এতো জপ-তপ, এতো পূজা-পার্বণ, এতো আকুলতা, আমি বিনা তপস্যায় তাঁকে এমন মধুরভাবে প্রত্যক্ষ করে গেলাম। মহাদেবের পদতলে বসে পরমেশ্বরের পরম করুণা লাভ করতে সমর্থ হলাম।

অতএব অনুরোধ করি, আপনিও দু-একটা দিন কাটিয়ে আসুন তপোবনে। কারণ এতো সহজে ঈশ্বরের এমন সুনিবিড় সান্নিধ্য জীবনের এক পরম পাওয়া। যে পাওয়া জীবনকে মহাজীবনে রূপান্তরিত করে।

২১ বছর আগের ভ্রমণ থেকে

মালয়েশিয়া

নিমাই ভট্টাচার্য

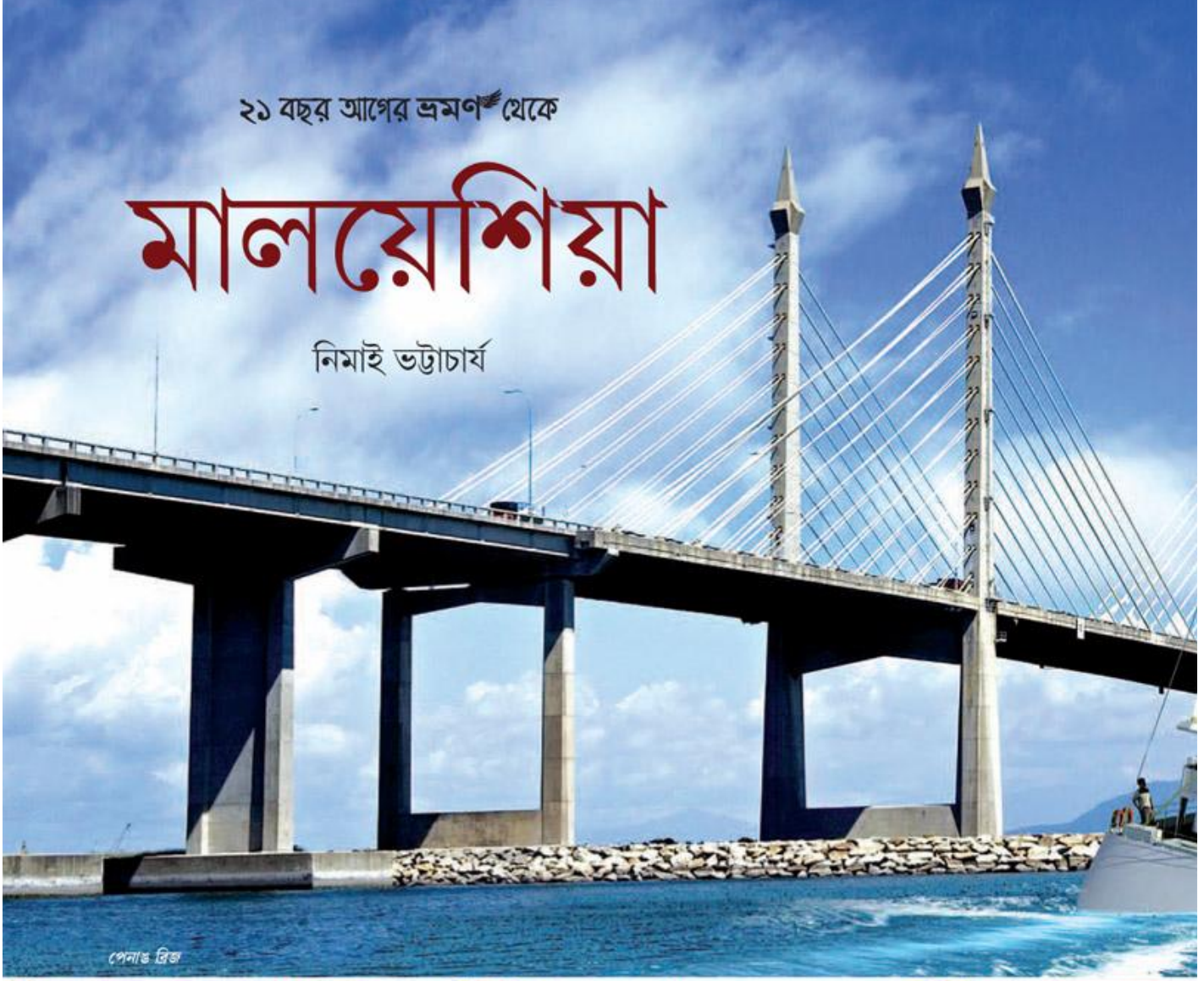

পেনাঙ ব্রিজ

পেনাঙের বুদ্ধমন্দির

সাড়ে তিন বছর বয়সে শুধু মাকেই হারালাম না, সেই সঙ্গে হারিয়ে গেল ঘরের আকর্ষণ। ঘরের কোণের ছোট্ট প্রদীপের মঙ্গল শিখায় অদৃষ্টের খেয়াঘাট খুঁজে পাবার সম্ভাবনা চিরদিনের মত বিলীন হয়ে গেল। তাই তো আকাশ-ভরা-সূর্য-তারার আলোয় কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি হিমালয়ের আনাচে-কানাচে, গভীর অরণ্যের আলোয় ছায়ায়, বারমের-জৈসালমেরের রুক্ষ প্রান্তরে; দেখেছি কত শত সহস্র গ্রাম-গঞ্জ শহর-নগর আর মন্দির-মসজিদ-রাজপ্রাসাদ। আবার শৈলশহর থেকে নির্জন সমুদ্র সৈকতে কাটিয়েছি কত আনন্দ মধুময় সন্ধ্যা। আরো, আরো কত কি!

প্রথম যৌবনের সোনালী আলোয় নেহরু আর কৃষ্ণ মেননের সান্নিধ্যে প্রথম পরিচয় হলো ইউরোপের সঙ্গে। দেখলাম অ্যাক্রোপলিস পাহাড়ের পার্থেনন থেকে বাকিংহাম প্যালেস; গোণ্ডলায় চড়ে ভেসে বেড়ালাম ভেনিসের ক্যানালে;

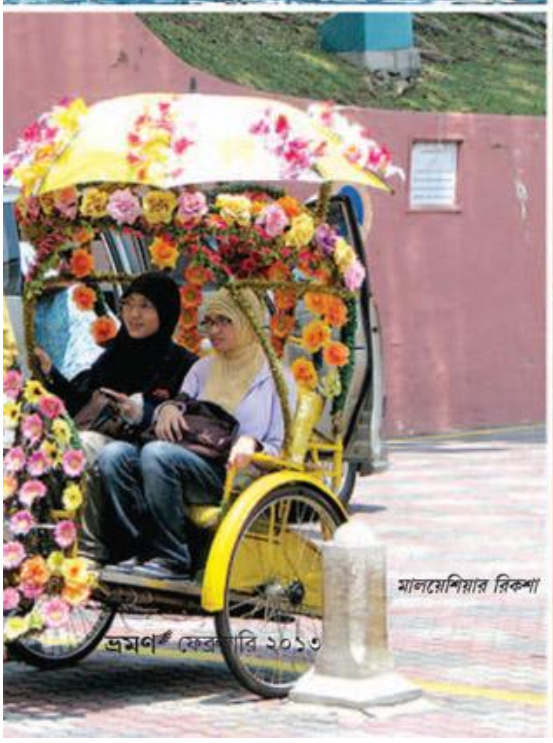

মালয়েশিয়ার রিকশা

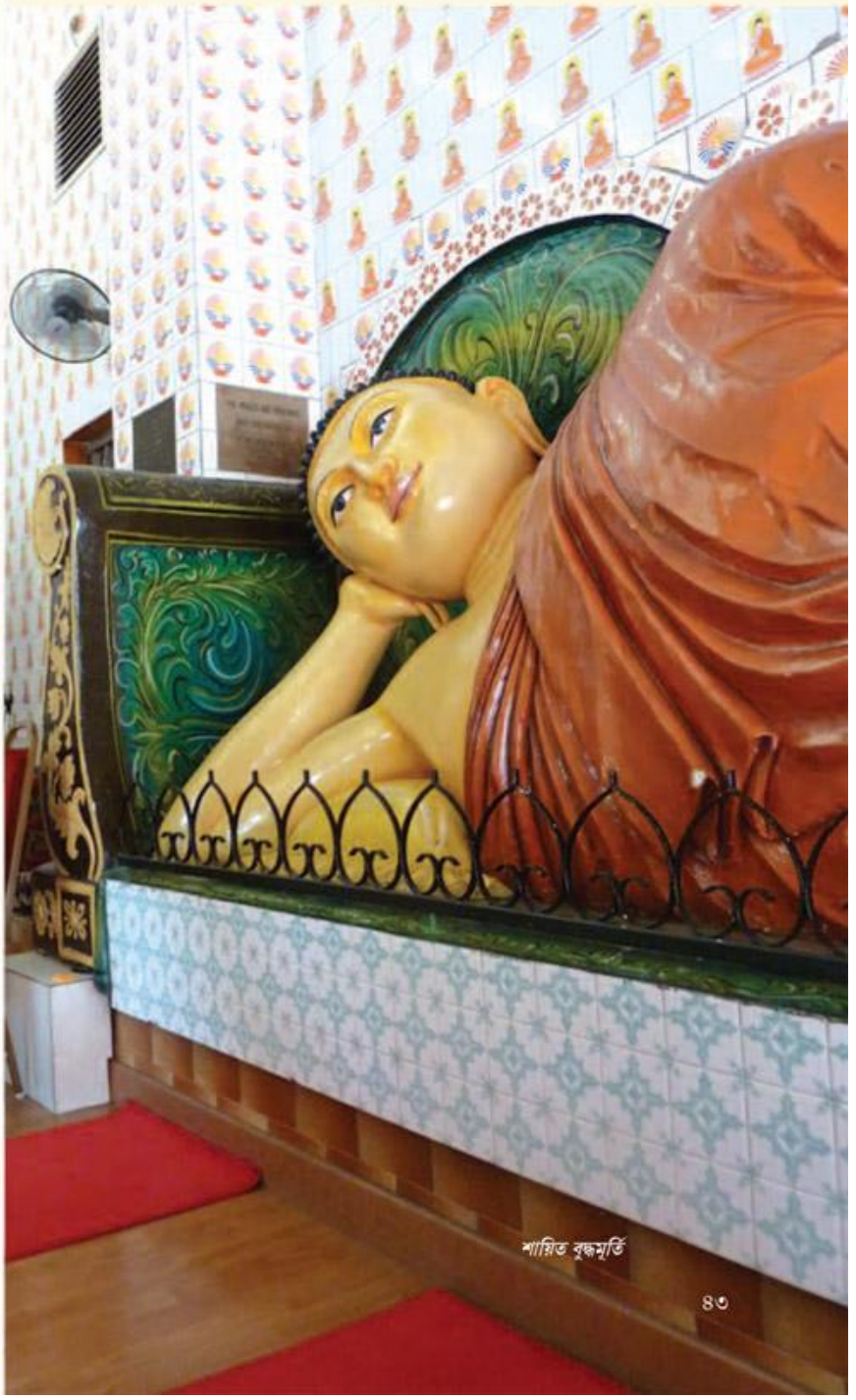

শায়িত বুদ্ধমূর্তি

জেনিভার লেকের পাড়ে বসে স্বপ্ন দেখি আমার চিরদিনের চিরকালের স্বপনচারিণীকে; প্যারিসের হোটেলে স্যাম্পেন খেতে খেতে শুনি ন্যাটোর এক মার্কিনী মেজর সাহেবের ফরাসি রক্ষিতার বিচিত্র কাহিনী; ফ্লিট স্ট্রিটের পাব-এ বীয়র-এর মাগ-এ চুমুক দিতে দিতে বিশ্ব পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করি অন্তরঙ্গ বন্ধু গার্ডিয়ান-ইকনমিস্টের মাইকেল ওয়াল-এর সঙ্গে। দর্শন করি মহামান্য পোপকে।

আর?

বেইরুটের সমুদ্র সৈকতে দেখলাম সম্পদ-সম্ভোগের আনন্দ মেলা, মিশরের পিরামিড, কিং ফারুকের কুব্বা প্যালেস। দিল্লি প্রত্যাবর্তনের আগের সন্ধ্যায় করাচির ক্লিফটন বীচ্-এর এক নিভৃত প্রান্তে ঢাকার আনোয়ারা খাতুন শোনাল—

না রে, না রে, ভয় করব না
বিদায় বেদনারে।
আপন সুধা দিয়ে
ভরে দেব তারে।।

তারপর মাঝে মাঝেই টাইপরাইটার নিয়ে আরব সাগর ডিঙিয়ে ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে চলে গেছি অতলান্তিক মহাসাগরের পাড়ের দেশে দেশে। অথবা হিন্দুকুশ-কারাকোরাম পেরিয়ে তাসখন্দ-ইরেভান-কিয়েভ-লেনিনগ্রাদ-মস্কো। রেড স্কোয়ারে লেনিনকে শ্রদ্ধা জানাই, বিস্মিত হই ক্রেমলিন দেখে, মুগ্ধ হই বলশয় থিয়েটারে ব্যালে দেখে। ইন্দিরা-সান্নিধ্যে দেখি জর্জ ওয়াশিংটন-আব্রাহাম লিঙ্কন-কেনেডির দেশ। ঘুরে আসি স্বামীজির অবিস্মরণীয় স্মৃতি বিজড়িত শিকাগো আর বিস্ময়ের বিস্ময় নায়েগ্রা জলপ্রপাত।

পার্লামেন্ট প্রেস গ্যালারি থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েও চার দেয়ালের মধ্যে বেশি দিন বন্দী থাকতে পারি না। শান্তিনিকেতনের হাতছানি, সবুজ শ্যামল উত্তর বাংলার আমন্ত্রণ, সমুদ্র সৈকতের উদার সীমাহীন আকাশ, বণ্ডা হিলস্ বা জৈসালমেরের রোমাঞ্চ উপেক্ষা করে কি ঘরে থাকা যায়?

চরৈবেতি।

বেরিয়ে পড়ি বার বার। তবে বিদেশে নয়, ভারততীর্থেই ঘোরাঘুরি করে দিন কাটাই মহানন্দে।

এয়ার ইন্ডিয়ার দিল্লি অফিসে বসে আড্ডা দিতে দিতে হঠাৎ এক বন্ধু বলল, তুমি তো আমাদের একটা কমপ্লিমেন্টারি টিকিট পাবে।...

বিনা পয়সায় প্লেনের টিকিট!

আমার বিস্ময় কাটার আগেই বন্ধুবর বলল, পশ্চিমে তো বহুবার গিয়েছ; এবার গো ইস্ট। ব্যাংকক-হংকং ঘুরে এসো।

ও আবার বলল, কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর বা সিঙ্গাপুর থেকে হংকং যাবার জন্য আমাদের কোন ফ্লাইট নেই। তুমি একটা টিকিট কেটে ব্যাংকক থেকে সিঙ্গাপুর ঘুরে এসো।

কপালগুণে কিছুদিন পর মালয়েশিয়া এয়ার লাইন্সের সৌজন্যমূলক টিকিট জুটে গেল কুয়ালালামপুর-সিঙ্গাপুর-পেনাঙ-ব্যাংককের।

হাজার হোক পরাধীন ভারতে জন্মেছি। ছোট বেলায় হাঁ করে বিলেত-ফেরত দেখতাম। ইংল্যান্ডের রাজার জন্মদিনে স্কুল ছুটি থাকতো। সারা বছর চিড়ে-মুড়ি খেতাম, কিন্তু ব্যতিক্রম হতো নিউ ইয়ার্স ডে'তে। সেদিন অন্তত সন্তোষ বিস্কুট কোম্পানির এক টুকরো কেক গিলতেই হতো। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, উঠতে বসতে বিলেতের চিন্তা কিছুতেই দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হতো না। নেহাত জার্মানির তৈরি লণ্ঠনের আলোয় লেখাপড়া করতে হতো বলে জার্মানির নাম জানা ছিল, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশের নাম-ধাম-খবর জানার প্রয়োজনও বোধ করিনি। ট্রম্যান সাহেব নাগাশাকি-হিরোসিমায় আণবিক বোমা ফাটিয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ থামিয়ে দেবার পর আমাদের দৃষ্টি বিস্তারিত হলো মার্কিন মুল্লুকের দিকে! রবি ঠাকুরের লেখাপত্তর পড়ে আর নেহরু-রাধাকৃষ্ণণ-কৃষ্ণ মেননের জমানায় ও সান্নিধ্যে সাংবাদিকতা করায়, চোখের দৃষ্টি আরো একটু এদিক-ওদিক গেলেও মন পশ্চিমমুখীই থেকে গেছে। ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সংযোজন করায় সোভিয়েট ইউনিয়ন আর চীন জোর করেই দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত জাপান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ম্যাজিক দেখিয়ে বিশ্ববাসীকে চমকে দিলেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। তাইতো পুব দিকে যাবার আগ্রহ থাকলেও উৎসাহের অভাব নিশ্চয়ই ছিল। তা না হলে দুটো বিমান কোম্পানির দুটো সৌজন্যমূলক টিকিট প্রায় তিন বছর আলমারি বন্দী থাকে?

সত্যি কথা বলতে কি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক চক্কর দেবার পরিকল্পনা করার প্রথম পর্বে মালয়েশিয়া যাবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। ভেবেছিলাম থাইল্যান্ড থেকে সোজা চলে যাবো সিঙ্গাপুর। তারপর হংকং। সম্ভব হলে চীনের কিছু অঞ্চল। ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলেও অর্থ ও সময়ের অভাবের জন্য ভিয়েতনাম আর কোরিয়া দেখার পরিকল্পনা করিনি। তবু মূর্খের মতো ভেবেছিলাম থাইল্যান্ড-সিঙ্গাপুর-হংকং দেখলেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে বেশ একটা স্পষ্ট ধারণা হবে। এখন স্বীকার করছি, মালয়েশিয়া না দেখলে আমি জানতেই পারতাম না, কী দুর্বার গতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উন্নতি করছে।

দেশে-বিদেশে বার বার ভ্রমণ করতে করতে বুঝেছি, যে কোনো দেশের বিমানে উঠলেই সেই দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। এরোফ্লোটের বিমানের কর্মীরা কর্তব্য পালন করলেও আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার তাদের কাছে যাত্রীরা কখনোই পাবেন না। ওদের বিমানে উঠলেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে বিদেশিদের ওরা ঠিক পছন্দ করে না, বিশ্বাসও করে না। সুইস এয়ার বা লুফ্থান্সা বিমানে উঠলে ঠিক বিপরীত অভিজ্ঞতা হবে। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনালের বিমানে ভ্রমণ করলেই বুঝতে পারবেন, ওদের দেশে মেয়েদের কি অবস্থা। ইসলামি রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিমানে উঠলেই বুঝতে পারবেন সে দেশের শিক্ষিত মেয়েরা পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার পায়। বিমান কর্মীদের ব্যবহার দেখেই বোঝা যায়, কোন দেশের পরিবেশ কত খোলামেলা। আমাদের এয়ার ইন্ডিয়া বা ইন্ডিয়া এয়ারলাইন্সের আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে আমাদের টাকা অচল, কিন্তু থাই, মালয়েশিয়া বা সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে ওদের ওইসব দেশের মুদ্রা ডলার-পাউন্ড স্টার্লিং-ডয়েস মার্ক-ইয়েনের সমমর্যাদা পায়। দেখেই বুঝতে পারবেন, থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরের মুদ্রা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় টাকার চাইতে কত বেশি কদর পায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি না হলে কি মুদ্রার এই সম্মান বা মর্যাদা লাভ সম্ভব?

ব্যাংকক থেকে কুয়ালালামপুর বিমান যাত্রায় সময় নেয় দু'ঘণ্টা। তারই মধ্যে ভুরি ভোজের ব্যবস্থা। সঙ্গে এক গেলাস বীয়র বা ওয়াইন। এয়ার ইন্ডিয়া বা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে ইকনমি ক্লাসের যাত্রীদের এই সৌজন্য থেকে বঞ্চিত রাখা হলেও মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের বিমানসেবিকা বিনা অনুরোধেই গেলাসে বার বার ওয়াইন ঢেলে দিলেন। দেখেই বুঝতে পারলাম, নিজের দেশের রীতি-নীতি যাই হোক পৃথিবীর বিখ্যাত বিমান কোম্পানিগুলির মত ওঁরা সব শ্রেণীর যাত্রীদেরই খুশি করতে জানেন। আমাদের দেশের বিমান কোম্পানিগুলির মত ওঁরা ছুৎমার্গের শিকার হননি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের টাইম টেবিল হাতে তুলে নিলাম এবং একবার চোখ বুলিয়ে নিতেই অবাক হয়ে যাই। তেরোটি প্রদেশ নিয়ে মালয়েশিয়া এবং তারই একটি পেনাঙ। রাজধানী কুয়ালালামপুর ও পেনাঙের মধ্যে শুধু মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স সপ্তাহে একশ' দশটি ফ্লাইট চালায়। অর্থাৎ প্রতিদিন পনেরটিরও বেশি। আর আমাদের দিল্লি-বোম্বাইয়ের মধ্যে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স সপ্তাহে মাত্র ৩৫টি ফ্লাইট চালায়। কুয়ালালামপুর ও প্রতিবেশী সিঙ্গাপুরের মধ্যে মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের ১৫৬টি ফ্লাইট প্রতি সপ্তাহে যাতায়াত করে। ভাবতে পারেন, কলকাতা-ঢাকা বা বোম্বাই-করাচি বা মাদ্রাজ-কলম্বোর মধ্যে

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স প্রতিদিন এগারোটি ফ্লাইট চালাচ্ছে?

শুধু এই টাইম টেবিল দেখেই বুঝতে পারি, এইসব দেশগুলির মানুষের জীবনযাত্রার মান কত উন্নত, অর্থনৈতিক অবস্থা কত মজবুত ও সর্বোপরি এইসব দেশগুলির মধ্যে কত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।

পর্যটকদের উৎসাহিত করার জন্য মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের নানা ধরনের ছাড় দেবার ব্যবস্থার কথাও জানতে পারলাম এই টাইম টেবিলের পাতা উল্টে। ৫৫ বছর বা তার বেশি বয়সের সব নাগরিকরা অর্ধেক ভাড়ায় দেশের সর্বত্র যেতে পারেন। আমাদের দেশের প্রবীণরা কি কোনদিন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কাছে এই সৌজন্য পাবেন?

কুয়ালালামপুরের সুবাং ইন্টারন্যাশনাল বিমান বন্দরে নেমেই স্পষ্ট হলো, এ দেশ হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে না; এক এক লাফে এক এক শতাব্দী পার হচ্ছে। ব্যাংকক-সিঙ্গাপুর-হংকং বিমানবন্দরের মতো বিশাল না হলেও নিঃসন্দেহে যেমন বড় তেমনি সুন্দর। সবকিছু ঝকঝক তকতক করছে। শত শত কর্মীরা কাজ করছেন কিন্তু কোথাও কোনো উত্তেজনা বা হৈ চৈ হচ্ছে না। দোকানগুলি সারা পৃথিবীর নানা সম্ভারে সাজানো।

আমাদের দেশের বিমানবন্দরের হোটেল কাউন্টারে শুধু তিন-চার-পাঁচ তারার হোটেলের খবর জানা যায় বা বুকিং করা যায়। ওখানে তা নয়। সাধারণ মধ্যবিত্তের উপযুক্ত অনেক হোটেলেরই খবর ওই কাউন্টার থেকে পাবার পর ওয়াই-এম-সি-এতে ঘরের ব্যবস্থা করে নিলাম। সুবাং ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দর থেকে কুয়ালালামপুর শহরটির দূরত্ব সাড়ে বাইশ কিলোমিটার। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে পথঘাট আর আশেপাশের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যাই। যাঁরা দিল্লির পথঘাট আর গাছপালা-বাগান দেখে গর্ব করেন, এখানকার দৃশ্য দেখে তাঁদের চক্ষুস্থির হয়ে যাবে। পূর্ব ইউরোপের কথা বাদই দিচ্ছি। পশ্চিম ইউরোপের শুধু জার্মানি-সুইডেনের মতো উন্নত দেশেই এই ধরনের রাস্তা দেখা যাবে। তাছাড়া দু'পাশে কী সবুজের সমারোহ! কুয়ালালামপুর পৌঁছে দেখলাম, এই সবুজের সমারোহ শুধু উপকণ্ঠে নয়, সারা শহরেই ছড়িয়ে আছে।

পৃথিবীর সব মহানগরীর মধ্যেই একটা সাদৃশ্য আছে। নিউইয়র্ক-লন্ডন-প্যারিস-হংকং-টোকিও বা আমাদের কলকাতা-বোম্বাই সর্বত্রই গাড়ি-ঘোড়া-মানুষের ভিড় ও ব্যস্ততা। কুয়ালালামপুর নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রম। মালয়েশিয়া রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রধান কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও কুয়ালালামপুরে নেই অন্যান্য মহানগরীর মতো ভিড়, ব্যস্ততা বা নোংরামি। তাছাড়া এত সবুজের মেলা বোধহয় আর কোনো মহানগরীতে দেখা যাবে না।

আজকের ইসলামিক রাষ্ট্র মালয়েশিয়ার অতীত ইতিহাস এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন; তবে অষ্টম-নবম শতাব্দী থেকে প্রায় পাঁচ শ' বছর এই অঞ্চল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শ্রী বিজয়ন সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ওই সাম্রাজ্য জাভার মাজাপাহিত ও থাই সাম্রাজ্যের অধীনে আসে ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব স্তিমিত হতে শুরু করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই সমগ্র অঞ্চলের মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেন।

পাশ্চাত্যের সঙ্গে আজকের মালয়েশিয়ার প্রথম প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শুরু হয় ষোড়শ' শতাব্দীর গোড়ায়। ১৫১১ সালে মলাক্কা পর্তুগিজদের দখলে আসে। একশ' তিরিশ বছর পর (১৬৪১) পর্তুগিজদের কাছ থেকে মলাক্কা ছিনিয়ে নেয় ওলন্দাজরা। ভারতবর্ষে মোটামুটি পাকাপাকি ঘাঁটি তৈরি করার পর ১৭৮৬'তে ইংরেজ দখল করল পিনাঙ দ্বীপ। ১৮১৯-এ ইংরেজ জোহবের সুলতানের কাছ থেকে সিঙ্গাপুর ছিনিয়ে নেয়। ১৮২৪-এ ইংরেজ ওলন্দাজদের কাছ থেকে মালয়কে নিয়ে বিনিময়ে সুমাত্রার বেনকুলেন ওদের দিয়ে দেয়। ইংরেজ যেভাবে ভারতবর্ষের এক একটি দেশীয় রাজ্যকে গ্রাস করে সমগ্র দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, এখানেও সেই একই ভাবে ইংরেজ সমগ্র মালয় দখল করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বিজয় অভিযানে আশেপাশের অন্যান্য দেশগুলির মতো আজকের মালয়েশিয়াও জাপানিদের দখলে আসে। জাপান বছর পাঁচেক এই দেশ দখল করে ছিল এবং সে সময় তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েই মালয়ের জনগণ আত্মসমর্পণ করার পর আবার এখানে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তত দিনে মালয়ের মানুষ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত অনেক টানাপোড়েনের পর ১৯৫৭ সালে এই দেশ স্বাধীন হয়।

কেদার সুলতানের ষষ্ঠ স্ত্রীর সপ্তম সন্তান টুঙ্কু আবদুল রহমান মালয়েশিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। অনন্য এই জাতীয়তাবাদী নেতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও তাঁর গোষ্ঠি-নিরপেক্ষ আন্দোলনের অত্যন্ত উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে টুঙ্কু আব্দুল রহমানের মত ভারত-হিতৈষী ভারত-বন্ধু আমরা বোধহয় আর বিশেষ পাইনি। মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম এবং সেজন্য সে আন্তর্জাতিক ইসলামি সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও মালয়েশিয়ায় হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্মের পূজা-পার্বন-উৎসব পালনে ষোলআনা স্বাধীনতা আছে। দীর্ঘদিন বা স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য কোন ভারতীয়ই মালয়েশিয়া সরকারের অনুমতি পাবেন না, কিন্তু হিন্দু মন্দিরের পুরোহিতকে ভারত থেকে আনতে হলে তাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে নেই।

মালয়েশিয়া এখনও গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী ও গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ আন্দোলনের উৎসাহী অংশীদার। তাছাড়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সংহতি, সহযোগিতা ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) ১৯৬৭ সালে ছ'টি দেশের (মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ব্রুনেই) সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে, সে ব্যাপারে আজও ওঁরা সমানভাবে উৎসাহী। এই 'আসিয়ান' দেশগুলির মধ্যে বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তান বা আরব দেশগুলির কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য। এই বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ফলে এই ছ'টি দেশ ঝড়ের বেগে উন্নতি করছে এবং আগামী দিনগুলিতে জাপান-দক্ষিণ কোরিয়া ছাড়াও এই 'আসিয়ান' দেশগুলি যে ইউরোপ-আমেরিকার বহু দেশের ঈর্ষার কারণ হবে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত এখনই পাওয়া যাচ্ছে। সেই বিস্ময়কর উন্নতির একটি জ্বলন্ত নিদর্শন মালয়েশিয়া। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (IMF) শুধু মার্কিন ডলার, ব্রিটেনের স্টার্লিং পাউন্ড, জার্মান ডয়েস মার্ক বা জাপানি ইয়েনেই বিভিন্ন দেশকে অর্থ সাহায্য করে না; আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার মালয়েশিয়ার রিঙ্গেত অর্থাৎ মালয়েশিয়ার ডলারেও বহু দেশকে অর্থ সাহায্য করে। মালয়েশিয়ায় অর্থনৈতিক অবস্থার সুদৃঢ় বুনিয়াদ না থাকলে কি ওঁদের ডলার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সম্মান লাভ করতো?

অর্থনৈতিক ব্যাপারের পরই ওরা শিক্ষাকে সব চাইতে গুরুত্ব দেয়। জাতীয় বাজেটের সাড়ে সতের ভাগ অর্থ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়। শিক্ষিতের হার প্রায় আশি। আমাদের দেশে যেমন গোবর গণেশের দলও বি. এ-এম. এ পড়ে বা কোনো মতে নোটবই মুখস্ত করে বা টোকাটুকি করে একখানা সার্টিফিকেট জোগাড় করে স্কুল-কলেজ অফিস-আদালতে গদি দখল করে বেশ সুখেই জীবন কাটিয়ে দেয়, ওখানে তা হতে পারে না। ছ'বছর বয়সে ওখানে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়; তার আগে কখনই নয়। ছ'বছর প্রাথমিক শিক্ষার পর উপযুক্ত নম্বর পেলেই ছেলেমেয়েরা তিন বছর নিম্ন মাধ্যমিক পড়ে। জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হলেই দু'বছরের উচ্চ মাধ্যমিক। তারপর আবার

কাপিতান কেলিং মসজিদ, পেনাঙ

জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় বেশ ভাল নম্বর পেয়ে পাশ না করলে কলেজে ভর্তি হওয়া যায় না। অর্থাৎ ভাল ছাত্রছাত্রী না হলে কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করা যায় না। অন্যান্যদের জন্য ব্যাপক কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় মাঝারি ধরনের ছাত্রছাত্রীরাও কোনো ক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

প্রাথমিক স্তরের ছেলেমেয়েদের ভাষা মালয়েশিয়া ও ইংরেজি পড়তেই হয়। এছাড়া চীনা বা তামিল ভাষাও তারা পড়তে পারে।

সুবাং আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরটি কুয়ালালামপুর শহরের সাড়ে বাইশ কিলোমিটার দক্ষিণে। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সিতে মিনিট পনেরোর মধ্যেই শহরের দক্ষিণ দিকের জালান ব্রিকফিল্ড এলাকার YMCAতে পৌঁছলাম। এক তলায় লাইব্রেরি, জিমন্যাসিয়াম, ইন্ডোর গেমস ও রেস্তোরাঁ। পাশেই টেনিস কোর্ট। দোতলা-তিনতলায় থাকার ব্যবস্থা। দু'ডলার দিয়ে অস্থায়ী সদস্য হয়ে সাড়ে বারো ডলারে চার শয্যা বিশিষ্ট ঘরে একটা শয্যা পেলাম। বাথরুম ঘরের সংলগ্ন না হলেও কোনো অসুবিধা হয়নি। ঘরদোর বাথরুম-পায়খানা সবকিছুই অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সংখ্যায় যথেষ্ট।

ব্রিকফিল্ড এলাকাটি শহরের দক্ষিণ প্রান্তে হলেও মধ্যবিত্ত ভারতীয় ট্যুরিস্টদের পক্ষে এই অঞ্চলের YMCA বা অন্য কোনো হোটেলে থাকার অনেক অসুবিধা আছে। কুয়ালালামপুর শহরের অধিকাংশ ভারতীয়ই এই অঞ্চলে থাকেন এবং অনেক ভারতীয় রেস্তোরাঁও এখানে আছে। তাছাড়া সস্তায় ভালো চাইনিজ খাবারের অঢেল ব্যবস্থা। সব ভারতীয় ও চাইনিজ রেস্তোরাঁতেই সব রকমের ড্রিঙ্কসও বেশ ন্যায্য দামে পাওয়া যায়। তাছাড়া এই ব্রিকফিল্ড এলাকা থেকে পায়ে হেঁটেই অনেক কিছু দেখা যায়। YMCA থেকে মিনিট পনেরো হেঁটে দক্ষিণ দিকে গেলেই আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ প্যাগোডা দেখা যাবে। এই আট-কোণা প্যাগোডাটির একদিকে পবিত্র বোধি বৃক্ষ ও অন্যদিকে সিংহলের বৌদ্ধদের তৈরি শতবর্ষের পুরনো বৌদ্ধ মন্দির। এখানে তিনটি অত্যন্ত প্রাচীন ও বিশাল বুদ্ধ মূর্তি ছাড়াও পৃথিবীর নানা দেশের বহু বুদ্ধ মূর্তিও দেখা যাবে।

ভূত উৎসবের মুখোশ

কুয়ালালামপুরের দর্শনীয় স্থানগুলির অধিকাংশই এই দক্ষিণাঞ্চলে। শহরের কেন্দ্রবিন্দুটিও বেশি দূরে নয়। ব্রিকফিল্ড থেকে উত্তর দিকে কিছুদূর গেলেই চোখে পড়বে কুয়ালালামপুর রেল স্টেশন। স্টেশনের সামনের দিকটি ইসলামিক স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন হলেও ভিতর দিকে লন্ডন ভিক্টোরিয়া স্টেশনের মতো ইস্পাত ও কাচ দিয়ে ছাউনি দেওয়া আছে। পৃথিবীর খুব বেশি দেশে রেল স্টেশন বিদেশি পর্যটকদের দ্রষ্টব্য হয় না। সেদিক থেকে মালয়েশিয়ার রাজধানী নিশ্চয়ই গর্ব করতে পারে। এই স্টেশন থেকেই ট্রেনে উত্তরে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক ও দক্ষিণে সিঙ্গাপুর যাওয়া যায়। এই স্টেশনের পাশেই রেল দপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও কুয়ালালামপুর স্টেশন হোটেল। এই দুটিও সমান আকর্ষণীয়।

রেল স্টেশনের সামান্য পুব দিকেই শিল্পী ও শিল্পরসিকদের অবশ্য দর্শনীয় ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি। অতীত দিনের সম্পদ-সম্ভোগের লীলাভূমি হোটেল ম্যাজেস্টিক ভবনটিই বর্তমানে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি। মালয়েশিয়ার সমস্ত বিখ্যাত শিল্পীদের অনন্য শিল্পকীর্তি ছাড়াও পৃথিবীর নানা দেশের যশস্বী শিল্পীদের নিত্য অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীও এখানে দেখা যায়।

আরো একটু উত্তর দিকে এগুলেই যে আকাশচুম্বী মিনারটি চোখে পড়বে সেটি মালয়েশিয়ার জাতীয় মসজিদ— মসজিদ নেগারার। ঠিক যে ধরনের মসজিদ আমরা আমাদের দেশে দেখি, এটি সেরকম নয়। মসজিদ নেগারা ইসলামিক স্থাপত্যের সঙ্গে আধুনিকতার সংমিশ্রণে তৈরি। মসজিদের মিনারটি প্রায় দু'শ পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু। মসজিদের প্রধান হলঘরে হাজার হাজার ভক্ত এক সঙ্গে নমাজ পড়তে পারেন। এই হলের চারধারে পবিত্র কোরাণ লেখা আছে। এই মসজিদের মধ্যেই সম্মেলন কক্ষ, আনুষ্ঠানিক উৎসব কক্ষ, বিশাল লাইব্রেরি, অফিস ছাড়াও বিরাট কারখানাও আছে। দর্শকদের জুতো খুলেই মসজিদে প্রবেশ করতে হয়। কুরুচিপূর্ণ পোশাক পরিহিতা মেয়েদের এখানে প্রবেশ নিষেধ।

এবার ডান দিকে এগুতে হবে। দেখতে পাবেন চায়না টাউন। চায়না টাউন আসলে চীনা

কুয়ালা লামপুরের 'লিটল ইন্ডিয়া'

বাজার। তবে এখানে শুধু চীনাদের তৈরি জিনিসই পাবেন না, পাবেন আরো অনেক কিছু। বহু প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় জিনিসপত্রই এখানকার দোকানে ও হকারদের কাছে পাওয়া যায়। তবে একটু দরদাম করে জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে পারলে বেশ লাভই হয়।

চায়না টাউনে ঢুকতে ও বেরুতে গেলেই অনেকটা মীনাক্ষী মন্দিরের মত যে বিরাট মন্দির দেখতে পাবেন, সেটাই এখানকার বিখ্যাত শ্রী মারিয়াম্মান মন্দির। ১৮৭৩ সালে কুয়ালালামপুর শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এই বিশাল মন্দিরটি সুদূর ইতালি ও স্পেনের পাথর দিয়ে তৈরি হয়। এছাড়া অসংখ্য মূল্যবান পাথর ও সোনার কাজ দিয়ে মন্দিরটি সাজানো হয়েছে। মন্দিরের বহিরঙ্গ অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তিতে শোভিত। মালয়েশিয়া ট্যুরিস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সব প্রচার পুস্তিকাতেই এই মন্দিরের ছবি দেখা যাবে। এই মন্দিরের মধ্যে একটা বিরাট রথ আছে। বছরের একটি বিশেষ উৎসবের দিনে বিগ্রহকে রথে বসিয়ে শহরের নানা পথ পরিক্রমা করা হয়। পৃথিবীর নানা দেশের অসংখ্য পর্যটক নিত্য এই মন্দিরটি দেখতে আসেন।

কুয়ালালামপুর শহরের অন্য এক প্রান্তে পাহাড়ের চূড়ায় গুহার মধ্যে অবস্থিত বিষ্ণু মন্দিরটিও সবাই দেখতে আসেন।

শহরের ঠিক মাঝখানে সুলতান আবদুল সামাদ বিল্ডিং। ১৮৯৪-৯৭ সালে তৈরি এই বিশাল প্রাসাদোপম বাড়িটি মালয় স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন। অতীত দিনে এই বাড়িটিই ছিল প্রধান সরকারি দপ্তর; বর্তমানে আছে আইন বিভাগ ও হাইকোর্ট। সারা পৃথিবীর পর্যটকেরা এই বাড়িটির ছবি না তুলে কুয়ালালামপুর ত্যাগ করেন না।

সুলতান আবদুল সামাদ বিল্ডিং-এর প্রায় উল্টো দিকেই জামে মসজিদ। ক্লাংগ ও গোম্বাক নদীর মোহনার পাশে এই মসজিদটির ঐতিহ্য ও গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। এই জায়গাটিও অত্যন্ত ঐতিহাসিক। সুদূর অতীতে কুয়ালালামপুরের আদিমতম বাসিন্দারা অজানা গ্রাম-গঞ্জ থেকে এসে এখানেই প্রথম আস্তানা বসিয়েছিলেন।

কুয়ালালামপুরে আরো অনেক কিছু দেখার আছে। বিশেষ করে এখানকার লেক ও উদ্যানগুলি অবশ্য দ্রষ্টব্য। সবার আগে দেখুন লেক গার্ডেন্স। নির্মল আনন্দ ও চিত্তবিনোদনের এমন শান্ত স্নিগ্ধ শ্যামল পরিবেশ যে কোনো মহানগরীরই গর্বের বস্তু। ছুটির দিনে শহরের অসংখ্য মানুষ সপরিবারে এখানে আসেন পিকনিক করতে, বিশ্রাম আর আনন্দ উপভোগের জন্য।

লেক গার্ডেন্সকে ঘিরে যে বিরাট সবুজের চত্বর, তার এ পাশে দেখতে পাবেন মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী টুন আবদুল রাজাকের স্মৃতি-ভবন। দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনটিই এখন তাঁর স্মৃতি-ভবন। এই দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীর আমলেই মালয়েশিয়ার বিস্ময়কর উন্নতির শুরু হয়। সেই সময়ের অনেক মূল্যবান স্মৃতি ও ঐতিহাসিক দলিল এখানে দেখা যাবে।

এই স্মৃতি-ভবনের পাশেই অর্কিড গার্ডেন। অসংখ্য অর্কিড ও মালয়েশিয়ার বিচিত্র বর্ণময় গাছপালার এই জীবন্ত প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। এশিয়ার মধ্যে জাপান ছাড়া এমন উদ্যান বোধহয় আর কোথাও নেই।

এখান থেকে দশ-পনেরো মিনিট উত্তরের দিকে হাঁটলেই দেখতে পাবেন জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ ও আসিয়ান গার্ডেন। বীর সৈনিকদের প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতার নিদর্শন এই জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ। আশিয়ান গার্ডেনে দেখতে পাবেন ছ'টি আসিয়ান দেশের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের অপূর্ব সমারোহ। এই গার্ডেন দেখলেই বুঝবেন, আসিয়ান দেশগুলির মৈত্রী-সহযোগিতার বন্ধন শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়— সে মৈত্রী ও সহযোগিতা সর্বব্যাপী।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশেই বহু চীনারা যুগ যুগ ধরে বসবাস করছেন এবং বাঙালীরা যেমন সর্বত্র কালিবাড়ি আর নাটকের দল গড়ে তোলেন, চীনারাও সেইরকম সর্বত্র নিজেদের মন্দির তৈরি করেন। সব চীনা মন্দিরই যেমন বর্ণময়, সেইরকমই কারুকার্য মণ্ডিত। কুয়ালালামপুরের দুটি চীনা মন্দির— চান শী সু ইউয়েন ও তিয়েন হাউ দর্শকরা নিশ্চয়ই মুগ্ধ হয়ে দেখবেন। ইসলামিক সেন্টারটিও অপূর্ব।

এখানকার পার্লামেন্ট হাউস ও বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র দেখতেও ভুলবেন না। আমরা যারা দিল্লির

কেকলোক সি-র বুদ্ধমন্দির

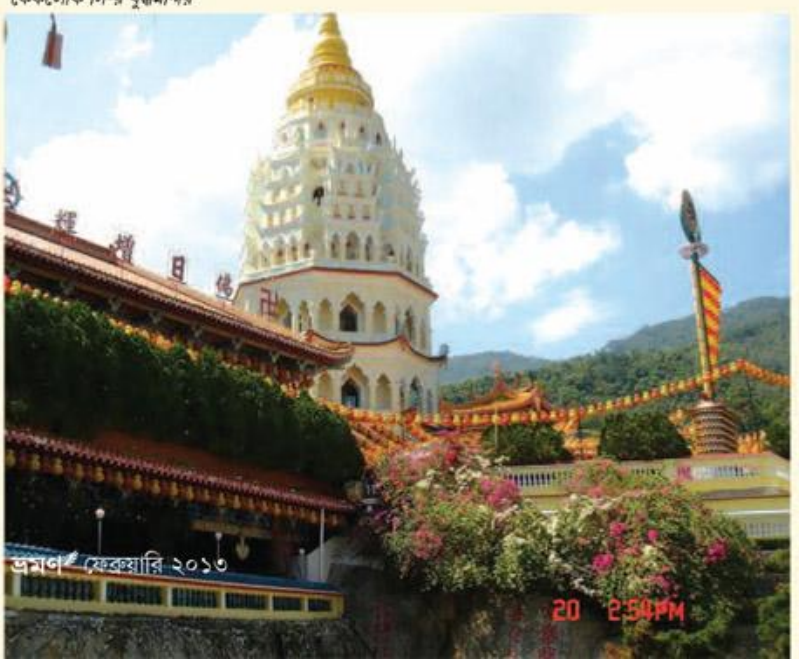

প্রগতি ময়দান ও তার 'হল অব নেশনস্' দেখে মুগ্ধ হই তারা কুয়ালালামপুরের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র দেখে হতবাক হয়ে যাবেন।

নিউ ইয়র্ক-লন্ডন বা সিঙ্গাপুর-হংকং-এর মতো এখানে একই অঞ্চলে অধিকাংশ বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ভিড় নেই। সারা শহরের সর্বত্র সব আধুনিক ও বড় বড় বাড়িতেই আছে কোন না কোন বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। তাছাড়া বিদেশি পর্যটকদের জন্য শহরের মধ্যেই বেশ কয়েকটি ডিউটি ফ্রি শপ আছে। আর কামপুক্ষ ভারু-তে আছে নৈশ বাজার।

তবে ধনী-মধ্যবিত্ত-দরিদ্র, দেশি-বিদেশি সবার কাছে সমানভাবে আকর্ষণীয় হল সেন্ট্রাল মার্কেট। শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এই মার্কেটটি সত্যি আমাকে মুগ্ধ করেছে। প্রবেশ পথের এক দিকে হাজার হাজার গাড়ি রাখার ব্যবস্থা; অন্যদিকে বিরাট চাতালে ঘোরাঘুরি ও বসার জায়গা। বিরাট একটা হল ঘরের মধ্যে এই মার্কেটে সহস্রাধিক দোকান আছে। কী কিনতে চান? সম্বর পাউডার? তেল-মশলা-লাড্ডু-জিলেপি? গোলাপ জল? মাইশোর স্যান্ডাল সাবান? ভিক্কো বজ্রদন্তি টুথপেস্ট? সদ্যোজাত শিশু থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জামাকাপড়? রেডিও-টি. ভি- ভি. সি. আর-কম্পিউটার? ফিল্ম-ক্যামেরা-গ্যাস লাইটার-ঘড়ি-ফাউন্টেন-পেন? সবকিছু পাবেন।

কী বললেন? পত্র-পত্রিকা-বই? হ্যাঁ, তাও পাবেন। নিউইয়র্ক হেরল্ড ট্রিবিউন-টাইম-নিউজউইক-ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ থেকে কেরালা কৌমুদী-মালায়ালা মনোরমা-মাতৃভূমি-ইন্ডিয়া টুডে পর্যন্ত সবই পাবেন।

আর পাবেন অতি সাধারণ থেকে বেশ ভাল রেস্তোরাঁ ও পানশালা।

এখানেই শেষ নয়। আরো অনেক কিছু পাবেন এখানে। পাবেন বিখ্যাত ও সাধারণ শিল্পীদের ছবি ভাস্কর্য। ইচ্ছা করলে কোন এক শিল্পীর স্টলে বসে নিজের পোর্ট্রেট আঁকিয়ে নিতে পারেন। অনেক রকম হস্তশিল্পের স্টলও এখানে আছে। অনেক শিল্পীকে এখানে বসেই কাজ করতে দেখবেন।

সব মিলিয়ে সেন্ট্রাল মার্কেট কয়েক হাজার হকার ও ছোট ছোট স্টলের সুন্দর রুচি সম্পন্ন ও সর্বোপরি শিল্পময় সমাবেশ। হকার-বিধ্বস্ত কলকাতায় কি এই ধরনের মার্কেট তৈরি করা যায় না?

চায়না টাউন ও শ্রী মারিয়াম্মান মন্দিরের সামান্য পূর্ব দিকেই এই মহানগরীর সব বিখ্যাত স্টেডিয়ামগুলি দেখা যাবে। এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক মার্দেকা (অর্থাৎ স্বাধীনতা) স্টেডিয়ামেই ১৯৫৭ সালে মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।

কোনো পর্যটকের পক্ষেই কোনো শহরের সবকিছু দেখা বা জানা সম্ভব নয়। তবু যে কোনো শহরের পথেঘাটে ঘুরে, মন্দির-মসজিদ-প্রাসাদ দেখে, হাটে-বাজারে কিছু কেনাকাটা করে, সাধারণ ও মাঝারি হোটেল-রেস্তোরাঁয় থেকে-খেয়ে এবং সর্বোপরি স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথাবার্তা বললেই সেই শহর, সেই দেশ সম্পর্কে আপনার একটা সুস্পষ্ট ধারণা হবে। কুয়ালালামপুরে কয়েক দিন এইভাবে কাটালেই বুঝতে পারবেন, দেশটি কত সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ। বুঝতে পারবেন, এ দেশের মানুষ কত শৃঙ্খলাপরায়ণ ও দেশটি কি দুর্বার গতিতে উন্নতি করছে। প্রতি মুহূর্তে অনুভব করলাম, এ দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম হলেও কোনো গোঁড়ামি নেই। তাইতো মালয়েশিয়ার ভারতীয় ও চীনা নাগরিক এবং বিদেশিদের প্রকাশ্য হোটেল-রেস্তোরাঁয় সুরাপানে বিধি-নিষেধ নেই। শুধু তাই নয়। এখানে আছে নাইট ক্লাব ও ক্যাবারে নাচের আসর; আছে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ ও ক্লাবে জুয়া খেলার ব্যবস্থা।

জেনে রাখুন, সিঙ্গাপুরের মত মালয়েশিয়াতেও পাকিস্তানি, বাংলাদেশী ও সিংহলের লোকজন এখানে ভারতীয় বলে পরিচিত। আর জেনে রাখুন, এই দেশে সর্দারজিরা বাঙালি বলে পরিচিত। কেন জানেন? অষ্টাদশ শতাব্দিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পর ঊনবিংশ শতাব্দির শুরুতেই সিঙ্গাপুর ও মালয় উপদ্বীপ এলাকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ শুরু করে। সে সময় ইংরেজ এই অঞ্চলে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সদ্যোজাত আধিপত্য রক্ষার জন্য কলকাতা থেকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের শিখ সৈন্যদের ওখানে নিয়ে যায়। একে কলকাতা থেকে এসেছে তার উপর বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য! সুতরাং বাঙালি হতে বাধ্য। সেই ধারণার জন্য ওইসব শিখ সৈন্যদের বংশধররা ও পরবর্তীকালে আগত শিখরা এখনও বাঙালি বলে পরিচিত।

পেনাঙ

কেন্দ্রীয় শাসিত রাজধানী কুয়ালালামপুর ছাড়া মোট ১৩টি প্রদেশ নিয়ে মালয়েশিয়া গঠিত। এর মধ্যে দুটি প্রদেশ— সারাওয়াক ও সাবা রাজধানী কুয়ালালামপুর থেকে দেড় হাজার-দু'হাজার কিলোমিটার দূরে। মাঝখানে হাজার-বারো শ' কিলোমিটার ব্যাপী দক্ষিণ চীন সাগর। তবে অর্থনৈতিক কারণে ও পর্যটকদের দৃষ্টিতে কুয়ালালামপুরের পরই পেনাঙ সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয়।

পেনাঙ ইংরেজি নাম। মালয়েশিয়ার মানুষ বলে পুলাউ পিনাঙ অর্থাৎ পানের সুপারি। এটি ছোট্ট একটি দ্বীপ। মাঝখানে সাড়ে আট কিলোমিটার সমুদ্র। স্ট্রেট অব মালাক্কা।

সহস্র বছর আগে ভারতীয় বণিকরা সমুদ্র পথে জাভা-সুমাত্রা যাবার পথে নিয়মিত এখানে এসেছেন। পরবর্তী কালে এসেছে পর্তুগিজ-ওলন্দাজ-ইংরেজ। ১৭৮৬ সালের ১১ আগস্ট ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফ্রান্সিস লাইট এই দ্বীপটি দখল করেন এবং দূর প্রাচ্যে ইংরেজদের প্রথম ঘাঁটি গড়ে তোলেন। ফ্রান্সিস লাইট ইংল্যান্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ এর নামানুসারে এই দ্বীপের নামকরণ করেন 'প্রিন্স অব ওয়েলস দ্বীপ' এবং তদানীন্তন সম্রাট তৃতীয় জর্জের নামানুসারে রাজধানীর নামকরণ করেন জর্জ টাউন। এখনও পেনাঙের রাজধানীর নাম জর্জ টাউন।

পেনাঙ শুধু মালয়েশিয়ার নয়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যতম ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। মালয়েশিয়ার টিন, রবার, পেট্রল, পাম অয়েল, কাঠ ইত্যাদি সারা পৃথিবীতে যায় এই বন্দর থেকেই।

পেনাঙ ও তার রাজধানী খুবই বর্ণময়। গুরুত্বপূর্ণ বন্দর-নগর বলে যেমন আধুনিক বাণিজ্য কেন্দ্র, সেইরকমই ঐতিহ্যপূর্ণ। অতীত দিনের বহু বর্ণময় ও আকর্ষণীয় জিনিসপত্র, বিধি-ব্যবস্থা এখনও ওখানে সমাদৃত। তাইতো বহু পর্যটক শুধু পেনাঙ দেখার জন্যই মালয়েশিয়া আসেন অস্ট্রেলিয়া-সিঙ্গাপুর যাতায়াতের পথে।

কুয়ালালামপুর থেকে প্লেনে, ট্রেনে ও গাড়িতে পেনাঙ যাওয়া যায়। সাড়ে তেরো কিলোমিটার লম্বা পেনাঙ ব্রিজটিই মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। এই ব্রিজটির সাড়ে আট কিলোমিটার সমুদ্রের উপর এবং মাঝখানের উচ্চতা ২২৫ মিটার। ৫০ হাজার টনের জাহাজ অনায়াসে এর নিচ দিয়ে যাতায়াত করে। এই ব্রিজটি ঠিক আমাদের দ্বিতীয় হুগলি সেতুর মতো। দ্বিতীয় হুগলি সেতুর মূল অংশের দশ গুণ বড় এই ব্রিজটি তৈরি করতে মাত্র ৩৯ মাস সময় লেগেছিল। রাত্রে আলোকিত এই ব্রিজটি দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

কুয়ালালামপুর রাজধানী হলেও এখানে প্রধানত মালয়বাসীদেরই চোখে পড়বে। তবে ওখানে প্রচুর চীনা ও ভারতীয়রাও থাকেন। কুয়ালালামপুরের ভারতীয়দের বোধহয় বারো আনাই তামিল ভাষাভাষী। তামিল ভাষাভাষীদের পরই দেখতে পাবেন সর্দারজীদের। বাঙালি নেই বললেই চলে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সত্যি, বেশ কিছু বাঙালি ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়াররা মালয়েশিয়ার নানা শহরে ছড়িয়ে আছেন। কুয়ালালামপুরে পর্তুগিজ-

ওলন্দাজ বংশোদ্ভূতদের চোখেও পড়বে না। পেনাঙে অনেক বেশি ভাষাভাষীর মানুষ বাস করছেন যুগ যুগ ধরে। প্রায় পাঁচ-ছ'শ বছর আগে যে পর্তুগিজরা এ দেশে আসেন, তাঁদের বেশ কিছু বংশধরেরা এখনও পেনাঙে বাস করছেন। বাস করছেন ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকদের বংশধররাও। ইংরেজ আমলের সময় যে সব বাঙালি, শিখ ও সিংহলীরা সামান্য চাকরি-বাকরি নিয়ে এখানে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আর দেশে ফিরে যাননি। তাঁদের বেশ কিছু বংশধর এখন পেনাঙে ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানা পেশায় নিয়োজিত। তবে একটা কথা জানা দরকার যে এঁদের অনেকেই নানা সম্প্রদায় ও জাতির সঙ্গে বিয়ে করে একটা নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি করেছেন। তাইতো মিঃ থেসেইরার ঘরে যেমন বাঙালি গৃহিণী পাওয়া যাবে, সেই রকম বলবন্ত সিং এর ঘরে মিঃ রোডরিগের নাতনিকে পাওয়া যাবে। তবে মালয়ের মানুষদের পরেই এখানে সব চাইতে বেশি থাকেন চীনারা।

পেনাঙে এলে সর্বাগ্রে পেনাঙ মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারি দেখা কর্তব্য। শত শত বছরের পুরনো ছবি আর ম্যাপ ছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফ্রান্সিস লাইটের দলিলটি দেখতে ভুলবেন না। আর দেখবেন ক্যাপিটান ক্লিঙ মসজিদ ও আচিন স্ট্রিট মসজিদ। মালয়েশিয়ার মসজিদগুলি শুধু ধর্মপিপাসুদের দ্রষ্টব্য নয়, শিল্প-স্থাপত্য ও প্রকৃতিপ্রেমীদেরও অবশ্য দর্শনীয়। দেখতে হবে চীনাদের কুয়ান ইন মন্দির আর শ্রী মারিয়াম্মান মন্দির। কুয়ালালামপুর বা পেনাঙের শ্রী মারিয়াম্মান মন্দির চত্বরে এলে মনে হবে, আপনি মাদ্রাজ বা মাদুরাতেই আছেন। দেখবেন ১৮১৮ সালে বন্দি শ্রমিকদের দিয়ে তৈরি সেই জর্জস্ চার্চ। তবে পেনাঙের সব চাইতে কারুকার্যময় হচ্ছে চীনাদের ড্রাগন মাউন্টেন হল। রাজপুতানার ঐতিহাসিক প্রাসাদগুলির মতো এখানেও অবিশ্বাস্য সূক্ষ্ম ও বর্ণময় কাজ দেখবেন সারা বাড়িতে। সিটি হল ও ক্লক টাওয়ার তো নিশ্চয়ই চোখে পড়বে। ক্লান্ত অবসন্ন হলেও আপনাকে দেখতে হবে কোমটার বিল্ডিং। ৬৫ তলা উঁচু এই গোলাকৃতি বাড়িটি পেনাঙের আধুনিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন। সরকারি-বেসরকারি অফিস, আন্তর্জাতিক ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, অসংখ্য দোকান ও রেস্তোরাঁ রয়েছে এই বাড়িতে।

যদি পারেন তাহলে রাজধানী জর্জ টাউনের বাইরেও যাবেন। দেখতে হবে ফরেস্ট মিউজিয়াম, রাষ্ট্রীয় মসজিদ, কেক লোক সী মন্দির, সাপের মন্দির, বুদ্ধ মন্দির। লোরোং বার্মার এই বুদ্ধ মন্দিরে পৃথিবীর দীর্ঘতম শায়িত (১০০ ফুট) বুদ্ধ মূর্তি আছে। আর পেনাঙ ব্রিজ না দেখলে পেনাঙ ভ্রমণ কখনই সম্পূর্ণ হবে না।

এত ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হবার পর পেনাঙের সমুদ্রতীরের আনন্দমেলায় অন্তত একটি দিন কাটাতে পারলে আর কোন দুঃখ থাকবে না।

মালয়েশিয়ার আরো অনেক কিছু দেখার আছে কিন্তু সময় ও অর্থ সীমিত থাকলে কুয়ালালামপুর আর পেনাঙ দেখলেই এই বর্ণময় ঐতিহ্যময় দেশের অনেক কিছুই জানা যাবে। আজকাল আমাদের দেশের হাজার হাজার মানুষ ব্যাংকক-সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন। অনেকে আবার হংকং পর্যন্তও ঘুরে আসছেন। দুঃখের বিষয় এঁদের অনেকেই ব্যাংকক-সিঙ্গাপুরের মধ্যবর্তী মালয়েশিয়া দেখছেন না। তাঁরা যে কত কিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তা জানেন না।

ভুললে চলবে না পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ খুব বেশি দিনের নয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পাকাপাকিভাবে আমাদের দেশে ঘাঁটি করে বসার পরই আমরা পাশ্চাত্যকে দেখেছি, জেনেছি, কিন্তু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ শত সহস্র বছরের। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সব দেশেই ভারতীয় সংস্কৃতির কম-বেশি প্রভাব আজও অম্লান রয়েছে। এখানকার সব দেশেই রয়েছে অসংখ্য ভারতীয়। ভারতবর্ষকে জানতে হলে তাঁদের কথা, তাঁদের দেশের কথাও নিশ্চয়ই জানতে হবে।

ইন্ডিয়ান হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি লাঞ্চের আসরে আমাকে বললেন, পৃথিবীর যেসব দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম, তার মধ্যে মালয়েশিয়ায় অন্য ধর্মাবলম্বীরা যে স্বাধীনতা ও পৃষ্ঠপোষকতা পায়, তা সত্যি দুর্লভ।

এয়ার ইন্ডিয়ার ম্যানেজার মিঃ সুন্দরেশনও একদিন মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেই মধ্যাহ্নভোজের আসরে অনেক গল্প-গুজবের পর আমি বললাম, আপনি তো কর্মসূত্রে পৃথিবীর বহু দেশেই বছরের পর বছর কাটিয়েছেন। এই দেশ আপনার কেমন লাগে?

উনি একটু হেসে বললেন, মিঃ ভটচাজ্, আমি চাই না আমার আর কোথাও বদলি হোক। এমন শান্তিপূর্ণ, সবুজ ও উন্নত দেশ ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাই না।

মালয়েশিয়া আমাকে নিত্য হাতছানি দেয়। সুযোগ পেলেই আমি আবার ছুটে যাবো। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার এমন অপূর্ব সমন্বয় তো আর কোথাও বিশেষ দেখব না।

মালয়েশিয়া ভ্রমণার্থীদের জ্ঞাতার্থে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

ওখানকার কারুর মাথায় হাত দেবেন না বা আঙুল তুলে কথা বলবেন না।

ধর্মস্থানে ও স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়িতে জুতো পরে ঢুকবেন না।

নিষিদ্ধ ড্রাগ সঙ্গে থাকলে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

বিধি নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া প্রকাশ্যে বা ঘরের মধ্যে জুয়া খেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

সিনেমা, থিয়েটার, সরকারি ও অন্যান্য অনেক জায়গায় ধূমপান নিষিদ্ধ। ঐসব জায়গায় ধূমপান করলে ২০০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে যেখানে সেখানে সিগারেটের টুকরো বা কোনও ধরনের আজেবাজে কাগজ, সিগারেটের প্যাকেট, খাবার-দাবারের মোড়ক ইত্যাদি ফেললেই ৫০০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

কুয়ালালামপুরের কয়েকটি টেলিফোন নম্বর

সুবাঙ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর— 03-7461833

ট্যুরিস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন— 03-2935188

এয়ার ইন্ডিয়া— 03-2420166

মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স— 03-2610555

সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স— 03-2923122

YMCA— 03-2741439

ভারতীয় দূতাবাস— 03-2617000

বিঃ দ্রঃ কুয়ালালামপুরের কোন টেলিফোন থেকে এই সব নম্বরে ফোন করতে হলে '০৩' ডায়াল করার দরকার নেই।

দিবা-রাত্রি ট্যাক্সি

রেডিও ট্যাক্সি— 03-2936211

লাক্সারি ট্যাক্সি— 03-7330507

টেলিক্যাব— 03-2211011

কুয়ালালামপুর ট্যাক্সি ড্রাইভার্স অ্যাসোসিয়েশন— 03-2222252

ট্যাক্সি ভাড়া

প্রথম ১.৬ কিমি— ৭০ সেন্ট

পরবর্তী প্রত্যেক ০.৮ কিমি— ৩০ সেন্ট

প্রতি ৮ মিনিট অপেক্ষা করার চার্জ— ৩০ সেন্ট

এয়ার-কন্ডিশনড্ ট্যাক্সির সারচার্জ— ২০%

দু'জনের বেশি যাত্রী উঠলে প্রতি অতিরিক্ত যাত্রীর জন্য চার্জ— ১০ সেন্ট

রাত্রি ১২টা থেকে ভোর ৬টা— ৫০% অতিরিক্ত

বাস-মিনিবাস

কুয়ালালামপুর-এ মোট ১০টি বাস ডিপো আছে। এক এক ডিপো থেকে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলেই বাস যায়। কেলাঙ বাস স্টেশনটি ব্রিকফিল্ডের কাছেই। এখান থেকে অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলের বাস ছাড়াও সুবাং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাবার বাস পাওয়া যায়।

বাস ভাড়া প্রতি কিমি— ২০ সেন্ট

পরবর্তী প্রতি কিমি— ৫ সেন্ট

মিনি বাস শুধু নির্দিষ্ট পথেই এক এক চক্কর দেয়; অর্থাৎ যেখান থেকে ছাড়ে, সেখানেই

সুলতান আবদুল সামাদ বিল্ডিং

ফিরে আসে। যে কোন দূরত্বের জন্য একই ভাড়া— ৫০ সেন্ট। তাছাড়া মনে রাখবেন, অধিকাংশ মিনিবাসেই কন্ডাক্টর থাকে না। যাত্রীদের বাসে উঠেই ড্রাইভারকে ভাড়া দিতে হয়।

প্রধান শপিং কমপ্লেক্স

THE MALL, JALAN PUTRA
YOW CHUAN PLAZA, JALAN AMPANG
AMPANG PARK SHOPPING COMPLEX, JALAN AMPANG
SUNGEI WANG PLAZA, JALAN SULTAN ISMAIL
BUKIT BINTANG PLAZA, JALAN BUKIT BINTANG
KL PLAZA, JALAN BUKIT BINTANG
IMBI PLAZA, JALAN IMBI
JALAN MASJID INDIA

জেনে রাখুন মালয়েশিয়ায় ফিল্ম, ক্যামেরা, ঘড়ি, গ্যাস লাইটার ও ফাউন্টেন পেন সম্পূর্ণ শুল্ক মুক্ত। তাই এই জিনিসগুলি সেখানে অসম্ভব সস্তা।

উল্লেখযোগ্য ভারতীয় ও পাকিস্তানি রেস্তোরাঁ

BANGLES 60A, JALAN TUANKU ABDUL RAHMAN টেলিফোন : 03-2983780
BILAL 33, JALAN AMPANG টেলিফোন : 03-2380804
DEVI ANNAPOORNA 94, LORONG MAAROF টেলিফোন : 03-2556443
SIMLA 95, JALAN AMPANG টেলিফোন : 03-2328539
SHIRAZ 1, JALAN MEDAN TUANKU টেলিফোন : 03-2910035

কয়েকটি প্রয়োজনীয় মালয় ভাষার কথা

আপনি কেমন আছেন— আপা খবর
সুপ্রভাত— সেলামত পাগি
শুভরাত্রি— সেলামত মালাম
আমি— সায়া
আপনি— সিক (কুমারী মেয়ে), এনসিক (পুরুষ)
পুয়ান (বিবাহিতা মহিলা)
আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন? - বোলেকা এনসিক তোলোঙ সায়া
এটা কী?— আপাকা ইনি
ওটা কী?— আপাকা ইতু
গরুর মাংস— দাগিং লেম্বু
চিকেন— আয়াম
মাছ— ইকান
ফল— বুয়া
হ্যাঁ— ইয়া
না— টিডাক
আমি দুঃখিত— সায়া মিনটা মাফ
চিংড়ি মাছ— উডাঙ
লবণ— গরম
দোকান— কেদাই
উত্তর দিক— উতরা
দক্ষিণ দিক— সেলাটন
পূর্ব দিক— টিমুর
পশ্চিমদিক— বরট

পেনাঙ

বায়ান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর— 830811
ট্যুরিস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন— 619067, 620066
পেনাঙ ট্যুরিস্ট অ্যাসোসিয়েশন— 616663
মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স— 830811 (এয়ারপোর্ট) 620011 (কেন্দ্রীয় অফিস)
সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স— 363201, 363413
YMCA
211, JALAN MACALISTER- 362690
YOUTH HOSTEL- 360558

বিমানভাড়া

মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সে কলকাতা থেকে ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, পেনাঙ ও কুয়ালালামপুর হয়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসার এক্সকার্সান বিমানভাড়া ৯৫৭৭ টাকা। তাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরের ভিসা কলকাতাতেই পাওয়া যাবে। কিন্তু মালয়েশিয়ার ভিসা নিতে হবে দিল্লি থেকে। যে ট্রাভেল এজেন্টের কাছ থেকে টিকিট কাটবেন ভিসার ব্যবস্থা তাঁরাই করে দিতে পারেন।

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনী

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। ₹৭৫

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

কবির দেখা কবির লেখা
একগুচ্ছ অসাধারণ
ভ্রমণকথার সংকলন।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹১৫০

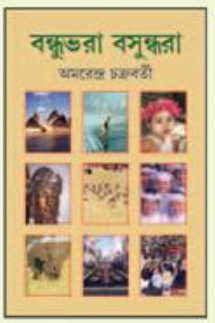

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর
আন্তরিক আলেখ্য।
সঙ্গে রঙিন ছবি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০

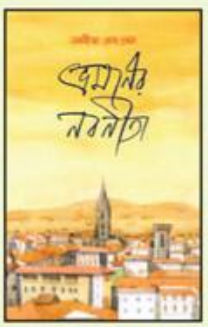

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

নানা মহাদেশের মাটির
জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

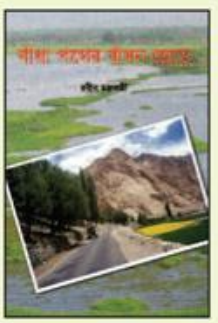

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ
ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই
পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি
দরকারি তথ্য।
₹৬০

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

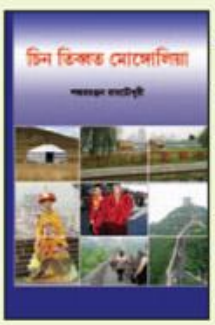

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া—
ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র
প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে
বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। ₹৬০

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

রামচন্দ্রের বনবাসের পথ পরিক্রমা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কথা

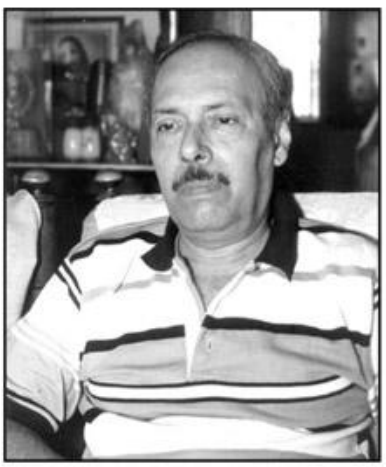

বছর দশ-বারো আগে আমাকে যেতে হয়েছিল রামচন্দ্রের বনবাসের পথ পরিক্রমায়। অযোধ্যা থেকে শুরু করে দুই পর্যায়ে আমি ধনুষ্কোটি পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

সাধারণ ভাবে ঘুরে বেড়াতে আমার যে খুব ভালো লাগে তা নয়। ঘুরে বেড়াবার নেশা যাকে বলে, তেমন কোনও নেশা আমার নেই। তবে, বিভিন্ন কাজে আমাকে বহু জায়গাতেই যেতে হয়েছে এবং সেই যাওয়া যে খুব খারাপ লেগেছে এমনও নয়। বনবাসে বিসর্জিত হবার পর রামচন্দ্র যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছিলেন— চিহ্ন ধরে ধরে আবার সেই পথটিকে পুনরাবিষ্কার— এই কাজটির মধ্যে রোমাঞ্চ ছিল, কিছু অ্যাডভেঞ্চারও ছিল।

মুশকিল হল, রামচন্দ্র বলে সত্যিই কেউ ছিলেন কি না, তিনি সত্যিই বনবাসে গিয়েছিলেন কি না, কোন পথে গিয়েছিলেন, এ সমস্ত নিয়ে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। বাস্তবে কী ঘটেছিল তা তো আমার জানা নেই। তবে, এই পথ পরিক্রমায় বেরনোর আগে আমাকে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করতে হয়েছিল।

যাত্রা শুরু করেছিলাম অযোধ্যা থেকে। এখন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে খারাপ লাগছে না, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল অযোধ্যাবাস খুব সুখের হবে না। একেই তো শহরটা ভীষণ ঘিঞ্জি। তার ওপর সেদিন রামনবমীর জন্য অসম্ভব ভিড়। আমি এক সাধুর আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলাম। হোটেল টোটেল ইত্যাদির ভালো ব্যবস্থা অযোধ্যায় ছিল না, কাজেই সাধুর আশ্রমটি খুব ভালো না হলেও চলে গিয়েছিল। অযোধ্যা থেকে শুরু করে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম— অর্থাৎ এলাহাবাদে, তারপর চিত্রকূট, মধ্যপ্রদেশের খানিকটা অঞ্চল— আমার প্রথম পর্যায়ের পরিক্রমা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আজকে পিছনে তাকিয়ে যখন ভাবি, মনে হয়, এই পরিক্রমণের মধ্যে একটা অন্য মাত্রা যোগ হয়েছিল। নিছক ভ্রমণ তো এটা নয়, জায়গা দেখা নয়, একটা উদ্দেশ্যমূলক অনুসন্ধান। এবং সেটা করতে গিয়ে আমার মধ্যে অন্যরকম একটা কিছুর সঞ্চার হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আমি প্রথম আবিষ্কার করি, হিন্দিবলয়ের একটা বিশাল অংশ রামচন্দ্রকে যে এত জানে, কথায় কথায় রামচন্দ্রের এত উল্লেখ করে, এর পিছনে একজন কবির মস্ত অবদান আছে। তিনি কবি হিসাবে কত বড় সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, তুলসীদাস একজন ভক্ত এবং কবি। রামচন্দ্রকে নয়, এই পরিভ্রমণে বেরিয়ে আমি আবিষ্কার করলাম তুলসীদাসকে।

আমার আরেক মস্ত লাভ বিভিন্ন ধরনের মানুষের সান্নিধ্যলাভ। সাধারণ মানুষ সবাই। ছোট হোটেলওয়ালা, রিকশাওয়ালা, টাঙাওয়ালা, হোটেলের বয়-বেয়ারা-বাবুর্চি, এরকম আরও বহু মানুষ, যাদের সঙ্গে আমাকে যেচে আলাপ করতে হয়েছিল আমার পরিক্রমা সংক্রান্ত তথ্যের প্রয়োজনে। আমার জীবনে এই সফরটাতে আমি পেয়েছি যাকে বলা যায় সম্পদ সঞ্চয়ের সুযোগ। আমার নিজের ভেতরে যে কতকগুলো অজ্ঞানতা ছিল, সেই অজ্ঞানতাও কেটেছে এই অভিজ্ঞতার ফলে।

গুহক রাজার রাজধানী শৃঙ্গবেরপুরে গিয়েছিলেন রামচন্দ্র। কথা হল এই শৃঙ্গবেরপুরটা কোথায়! এলাহাবাদে আমি বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও জানতে পারলাম না। কিন্তু ইউ পি ট্যুরিজমের একটি মেয়ে আমাকে শেষ পর্যন্ত একটা সন্ধান দিল। এটা এলাহাবাদ থেকে ৪০-৫০ কিলোমিটার দূরে। বলল, কছৈড়ি থেকে বাস ছাড়ে। সেখান থেকে লালগোপালপুরের বাসে চলে যান। শৃঙ্গবেরপুর পথেই পড়বে। বাসরাস্তা থেকে হাঁটাপথ। টাঙাও পাবেন।

টাঙা অবশ্য ছিল না। দীর্ঘপথ রোদের মধ্যে হেঁটে পৌঁছলাম শৃঙ্গবেরপুরে। এত ক্লান্ত হয়েছিলাম যে ওখানে পৌঁছে প্রায় শুয়ে পড়ার মতো অবস্থা। উত্তরপ্রদেশের মানুষরা অতি সরল এবং অতিথিবৎসল। পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই ফল-টল, পানীয় ইত্যাদি নিয়ে এল কয়েকটি ছেলে।

শৃঙ্গবেরপুরে নদী আছে— গঙ্গা, কিন্তু এই শৃঙ্গবেরপুরেই রামচন্দ্র এসেছিলেন কি না তা আমি জানি না। নদী তার খাত বদল করে সরে আসতে পারে। ঘাট আছে। মন্দির আছে, ভালোই বসতি আছে। সেখানে একটা খননকার্য চলছিল। কুষাণ আমলের বা ওই সময়কার বহু নিদর্শন মাটি খুঁড়ে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সেটা গুহক রাজার রাজধানী কি না সেটা তো বলার কোনও উপায় নেই। ওখানে রামচন্দ্রের খড়ম আছে, মন্দির আছে। শৃঙ্গবেরপুর একটা তীর্থক্ষেত্রও হয়ে উঠেছে। ভালোই লাগবে, তবু একটা খটকা থেকেই যায় যে সেটাই আসল শৃঙ্গবেরপুর কি না।

অযোধ্যাও তাই। যে অযোধ্যাকে নিয়ে এত বিবাদ বিসম্বাদ সেই অযোধ্যাই যে আসল অযোধ্যা এ-কথা কে বলবে। একটা কিংবদন্তী আছে যে সম্রাট বিক্রমাদিত্য অযোধ্যাকে পুনরাবিষ্কার করেন। বিক্রমাদিত্য নাকি শিকারে গিয়েছিলেন, হঠাৎ দেখেন সরযূর ওপারে একজন কালো মানুষ কালো ঘোড়ায় চেপে নদীতে নামছে। নদীতে নেমে সে ডুবে গেল,

এপারে যখন উঠল তখন সেও সাদা তার ঘোড়াও সাদা। তখন বিক্রমাদিত্য খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? সেই লোকটি উত্তর করল, আমি প্রয়াগরাজ। মানে, প্রয়াগের দেবতা। যত পাপীতাপী প্রয়াগের জলে স্নান করে, তাদের কলুষে আমি কালো হয়ে যাই। সেটা পরিষ্কার করার জন্যই আমি সরযূতে ডুব দিই। এরপর প্রয়াগরাজ বিক্রমাদিত্যকে বললেন, তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, এটাই হচ্ছে পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যা। তুমি এই নগরীকে পুনরুদ্ধার করবে। কপিলা গাই বা ওরকমই স্বর্গের কোনও গাভী যেখানে যেখানে দাঁড়াবে এবং তার বাঁট থেকে দুধ ঝরে পড়বে বুঝবে সেখানেই প্রাচীন অযোধ্যার কোনও না কোনও চিহ্ন রয়েছে। মজা হল, বিক্রমাদিত্য নিজেই এমন একটা চরিত্র যে মিথলজিতে তাকে যেমন ভাবে খুশি ব্যবহার করা হয়েছে। সেই অর্থে রামচন্দ্রের বনবাসের পথটাও অনেকাংশেই মিথ। আমি সেই মিথকেই, মায়ামারীচকেই অনুসরণ করে গেছি।

তবে হ্যাঁ, চিত্রকূটে সেই পাহাড়টা তো আছে, যেখানে উনি বসবাস করতেন। চিত্রকূট থেকে শুরু করে মধ্যপ্রদেশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল বিশাল দণ্ডকারণ্য। সে-সব গাছ সাফ হয়ে গেছে, অরণ্য নির্মূল হতে হতে ওড়িশার এক কোণে সামান্য কিছু জায়গায় টিকে আছে। চিত্রকূট থেকে অবশ্য আর কিছু প্রামাণ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না, আসলে চিত্রকূটে তেমন কোনও বসতি ছিলও না।

পঞ্চবটী, মানে নাসিকে, সীতাগুম্ফা রয়েছে। সেখান থেকেই নাকি সীতাহরণ হয়েছিল। সেগুলো যদিও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে, নাসিকের তীর্থক্ষেত্র হিসাবে প্রসিদ্ধি রয়েছে, কারণ ওখানে কুম্ভমেলা হয়। কিন্তু জলের অভাব। শিপ্রা নদী একটা শুকনো নালার মতো বয়ে যাচ্ছে। একটা বেসিন করে রাখা আছে। লোকজন সেখানেই স্নান করে।

নাসিকে আরও একটা জিনিস দেখেছিলাম, ওরা বলে পাণ্ডব গুম্ফা। আসলে বৌদ্ধ শ্রমণদের গুহা। পাহাড়ের মাথায় প্রায় হাজার খানেক ফুট ওপরে। শ্রমণরা বেশ কষ্ট করেই থাকতেন সেখানে। জলের অভাব ছিল। বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য পাথরের চৌবাচ্চা তৈরি করে রাখা হয়েছিল। বৌদ্ধরা চলে যাওয়ার পর এটাকে পাণ্ডবগুম্ফা নাম দিয়ে প্রচার করা হয় যে পাণ্ডবরা এখানে ছিলেন অজ্ঞাতবাসের সময়। এইরকম বহু মিথ আমরা অল্প অনুসন্ধান করেই বাতিল করে দিতে পারি। কিন্তু এটা বোঝা যায় যে ওই মিথগুলোর একটা প্রভাব সাধারণ মানুষের ওপর প্রবলভাবে রয়েছে।

তুঙ্গভদ্রার তীরে যেখানে এখন তুঙ্গভদ্রা বাঁধ তৈরি হয়েছে, সেখানে ছিল বিজয়নগর-বাহমনি রাজ্য। ও জায়গাটা এমনিতেই ভ্রমণকারীদের কাছে খুব প্রিয়। বিজয়নগর-বাহমনি রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ ওখানে আছে। দুর্লভ পাথর দিয়ে তৈরি নানারকম কনস্ট্রাকশন সেখানে রয়েছে। অন্য একটা পাথর দিয়ে টোকা দিলে কোনওটা থেকে বাঁশির আওয়াজ হয়, কোনওটা থেকে মৃদঙ্গের আওয়াজ হয়। একটা আস্ত পাথর কেটে

> রামচন্দ্রের যাত্রার পথ তো কম ছিল না। দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন পঞ্চবটী অর্থাৎ নাসিক থেকে আবার যাত্রা শুরু করি, তখন আরো ভিন্ন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলাম। গোটা পথের এক এক জায়গায় রাম লক্ষ্মণ সীতাকে নিয়ে যে ব্যবসার প্রসার ঘটেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও এসবের পাশাপাশি একটা সহজ সরল ভক্তিভাব— প্রাকৃত মানুষের যেমন হয়, একটা ভরসা ও বিশ্বাসের ভাব প্রবাহিত রয়েছে। আমি যেন এখানে আবহমান কালের ভারতবর্ষকেই টুকরো টুকরো ভাবে আবিষ্কার করতে পারলাম।

রথ তৈরি করা আছে। এখানেও মিথ আছে যে, সীতাহরণের সময় ওইখানেই রাবণের সঙ্গে জটায়ুর লড়াই হয়েছিল। ওখানকার লোকেরা পাথরের দুটো দাগ দেখায়— একটা সোনালি দাগ একটা রুপোলি দাগ। টানা চলে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। সে দুটো দাগ অবশ্য সত্যিই আছে। জটায়ু রাবণকে আক্রমণ করলে রাবণ সীতাকে রথ থেকে নামিয়ে একটা গুহায় আটকে রেখেছিল। সীতাকে টেনে আনার সময় গয়নার ঘষায় ওই সোনালি দাগটা পড়ে। আর রুপোলি দাগটা পড়ে তাঁর শাড়ির ঘষায়।

এই জায়গাটাকে আমরা বলতে পারি কিষ্কিন্ধ্যা। সেখানেই রাবণের সঙ্গে জটায়ুর লড়াই হয়েছিল এবং এখান থেকেই রামচন্দ্র বানরসেনা সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু এরপর থেকে রামচন্দ্রের পথের কোনও দিকনির্দেশ পাওয়া দুরূহ। আর কোনও তীর্থক্ষেত্র পাওয়া যাবে না, যেখানে রামচন্দ্র বসবাস করেছিলেন বলে মিথ চালু আছে।

ধনুষ্কোটি— এখনকার রামেশ্বরমের কাছে। এখান থেকেই রামচন্দ্র সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। এখানে রামচন্দ্রের বসবাসের কিছু নিদর্শন দেখানো হয়। ধনুষ্কোটি পর্যন্ত আগে ট্রেন যেত। আমরা সে অবধি যেতে পারিনি। কারণ ঝড়ে রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রামেশ্বরম পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

উত্তর ভারতে রামচন্দ্রের যে প্রভাব, দক্ষিণ ভারতে তা কিন্তু নেই। এই পরিক্রমায় আমি বেরিয়েছিলাম সম্পূর্ণ একা। নিজের মালপত্র নিজেকেই বইতে হত। খাওয়ার কষ্টও ছিল বেশ কিছু জায়গায়। তবুও এটা আমার কাছে বেশ মনোরম স্মৃতি হয়ে আছে।

Transforming Tourism
EXOTICA
KASHMIR-10D/9N
Jammu, Srinagar, Pahelgaon, Patnitop, Katra, Gulmarg, Sonmarg
SIMLA-MANALI - 8D / 7N
Simla - 2N, Manali - 4N, KULU - 1 N
DOOARS - 5D / 4N
Gorumara,Jaldapara, Lataguri,Chalsa
GOLDEN TRIANGLE- 8D/7N
Delhi: Delhi 3N, Rajasthan: Jaipur 2N, Fatehpur Sikri, Uttar Pradesh: Agra 2N, Sikandara, Vrindavan, Mathura.
Assam & Meghalaya-6D/5N
Shillong 3N - Guwahati 2N
KUMAON-GARHWAL
Haridwar,Dehradun, Mussoorie, Nainital, Almora, Kausani, Ranikhet,Kedar Badri, Pattalbhubaneswar, Gangotri
Our services include Hotel Booking ,Air, Bus, Cruise Ticket Booking.Customized Weekend Tour
EXOTICA XPLORER PVT. LTD. 116/1A, Bidhan Sarani, Kol-4 (Shyambazar Bata)
www.exoticaexplorer.com
Ph.: 25300177/9239433481
Email : exoticaxplorer@gmail.com

কলেজে পড়তে পড়তেই নিয়মিত পড়ুন

পেশাপ্রবেশ

আর স্নাতক হয়েই যে কোনও চাকরির পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
  'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320

চালর্স মন্টেগু ডাউটি

উট লুঠের কাহিনী

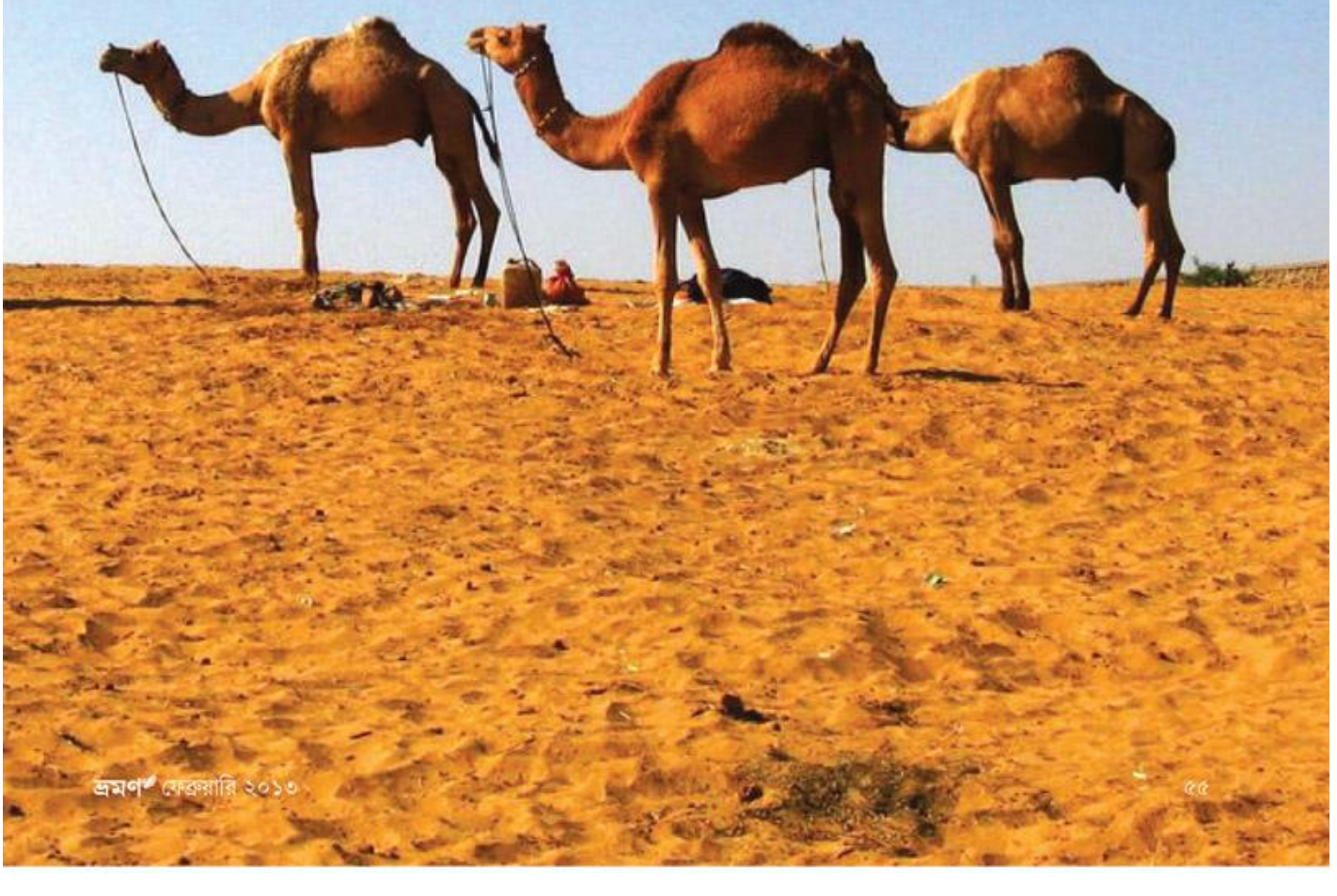

২১ বছর আগের ভ্রমণ থেকে

চার্লস মন্টেগু ডাউটির জন্ম ১৮৪৩ সালে, ইংলন্ডের সাফোকে। ইনি আসলে কবি এবং ভ্রমণকাহিনীর লেখক। জীবনের সিকিভাগ সময় ইনি ব্যয় করেছেন চসার এবং স্পেন্সারের কবিতা পড়ে। ভ্রমণেও ছিল ওঁর প্রচণ্ড নেশা। ১৮৭৬ সালের নভেম্বর মাসে ডাউটি উটের পিঠে চেপে সৌদি আরবের বিস্তীর্ণ নেজ্‌দ্‌ মরুভূমি পার হওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করেন। ওই মরুভূমিতে দীর্ঘ ২০ মাস অতিবাহিত করেন তিনি। মরুভূমির মধ্যেও রয়েছে মরূদ্যান। সেখানেও বসবাস করে কিছু মানুষ। তারা বেদুইন ডাকাতও হতে পারে, আবার অতি ভালো মানুষও। মাঝে মাঝেই এইসব মরূদ্যান ক্রমে গ্রাম কিংবা আধাশহরে রূপান্তরিত। সেইসব গ্রামও অতিক্রম করেন ডাউটি, রাত কাটান সেখানে। তাঁর রুট ছিল পশ্চিমে জেড্ডা পর্যন্ত, এবং উত্তরে আনাইজা ও বোরাইদার মধ্যে দিয়ে খাইবার, মেদিন সালি ও আয়ুরিদ আগ্নেয়গিরির পাশ দিয়ে তাইমা ও তেবাক পর্যন্ত। তাঁর এই ভ্রমণকাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সালে, 'ট্রাভেলস ইন অ্যারেবিয়া ডেজার্টা' নামে গ্রন্থে। সেই গ্রন্থেরই একটি পর্বের অনুবাদ এখানে প্রকাশিত হল।

১৮৭৭ সালের ১৫ই এপ্রিল। আমি তখন পশ্চিম আরবের তেইমা শহরের উপকণ্ঠে একটি পাহাড়ের ওপর ডেরা ফেলেছি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪০০০ ফুট উঁচুতে আমার আস্তানা। আমার সঙ্গী কয়েকটি বেদুইন পরিবার। ওরা আমাকে খলিল (বিশিষ্ট ভদ্রলোক) বলে ডাকত।

বসন্তের অবসানে গ্রীষ্মের আবির্ভাব ঘটেছে। সকালটা কিন্তু ঠান্ডাই ছিল— উত্তর-পুব থেকে শন্‌শন্‌ করে ঠান্ডা হাওয়া দিয়েছিল। বিকেল বেলা বাতাস থেমে গেল, রোদ্দুরের তেজ বাড়ল। লতাগুল্মগুলি আগেই নেতিয়ে পড়েছিল, এবার প্রচণ্ড তাপে একেবারেই শুকিয়ে গেল। আশেপাশে প্রান্তরের রঙ গেল পালটে। কিছুকাল ধরে বেদুইনরা খোলা আকাশের নিচে বাস করছিল; এবার তারা তাঁবুতে ফিরে গেল। আমার চালাঘরের ভিতরে তাপমাত্রা দেখলাম ৯৫° ফরেনহাইট।

একদিন সকালে জনাকয়েক বেদুইন উট চরাতে বেরোল। ঘন্টাখানেক পরে হানাদারদের হামলার খবর এল। যারা উট নিয়ে বেরিয়েছিল তাদের একজন মজলিশের সামনে এসে খবর দিল: উটগুলি লুঠ হয়ে গিয়েছে। সে কোনওক্রমে উটের পিঠে চরে পালিয়েছে।

উপস্থিত বেদুইনরা চকিতে দৃষ্টিবিনিময় করল, কফির কাপ সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। গতকাল শয়তানের বাচ্চাদের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছিল। শেখরা ঘোড়ার খোঁজে গেল, অস্ত্র নিয়ে ক্রোধাবিষ্ট ভিমরুলের মতো তাঁবু থেকে ছুটে বের হল। তাদের কেউ বা বন্দুকবাজ, কেউ বল্লমধারী। কেউ অশ্বারোহী, কেউ বা পদাতিক। সকলেই বদলা নেবার উদ্দেশ্যে দুশমনদের সন্ধানে চলল। মরুভূমির ছোট দিগন্তে দুশমনরা অবশ্য চোখে পড়ছিল না।

শেষ পর্যন্ত ছাউনিতে শুধু স্ত্রীলোক, শিশু এবং কয়েকজন বৃদ্ধ ও অসুস্থ পুরুষ রয়ে গেল। কেউ কেউ জানতে চাইল আমিও চোর ধরতে যাব কি না। গাইড জইদ বলে বসল যে খলিল ওদের অভিযানে সঙ্গী হবে। মেয়েরা অবশ্য অন্য কথা বলল: 'খলিল, তোমার পণ্ডিতি কেতাবগুলি খুলে দেখ তো আমাদের ভাগ্যে কী আছে! পুঁথিগুলি দেখে তুমি কি ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারো না? ওগুলো দেখে বলো, দুশমনদের কপালে কী লেখা আছে। ওদের কপাল পুড়ুক! কাল রাতে পাহাদাররা আগুন জ্বেলেছিল; সেটা নিশ্চয় ওদের চোখে পড়েছিল। উটগুলিকে চরাতে নিয়ে যাবার সময় পর্যন্ত ওরা নিশ্চয় ঐ পাহাড়টার আড়ালে লুকিয়ে ছিল।' এইভাবে দুশ্চিন্তার মধ্যে দীর্ঘ সকালটা কাটল।

দলের নেতা মোতলোগ দিন কয়েক আগে হাইল-এ গিয়েছিল— আমীরের সঙ্গে কিছু কাজ ছিল। যাবার সময় সে গোষ্ঠীর শাসনভার ছেলে রহিয়েল-এর উপর দিয়ে যায়। রহিয়েল কিন্তু অন্য ধরনের মানুষ। আকস্মিক ঝামেলায় পড়লে সে খেই হারিয়ে ফেলে। যাই হোক, অভিযাত্রীদল দুপুর নাগাদ ফিরে এল। অবস্থা পর্যালোচনার জন্য মজলিস বসল। দুশমনদের পিছু নেওয়ার কথা কিছু শুনলাম না। পাশের লোককে প্রশ্ন করে জানলাম— সন্ধেবেলা উটগুলি ফিরলে সবাই মিলে যাওয়া হবে। আসলে সবগুলি উটই যে লুঠ হয়েছে তা নয়; আমাদের ছাউনির উত্তর দিক দিয়ে যেগুলিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেগুলিকেই দস্যুরা নিতে পেরেছে।

যুদ্ধে সময়ের একটা দাম আছে। শত্রুকে তাড়াতাড়ি আঘাত করতে পারলে তার শক্তি দ্বিগুণ হয়। এরা কিন্তু সারাটা দিন থিতু হয়ে বসে রইল; ফলে দস্যুরা পালিয়ে যাবার সুযোগ পেল। মজলিশে আলোচনার বিষয় ছিল একটাই: দুশমনরা কারা? সকলেই একমত যে ওরা উত্তর অঞ্চলের আরব না হয়ে যায় না, কারণ ওদের হাতে পিস্তল ছিল। শত্রুরা উত্তরাঞ্চলের কোন্‌ গোষ্ঠীর, তা নিয়ে অবশ্য মতানৈক্য ঘটল। কারো মতে ওরা শেরাবৎ, কারো বা মতে জেসি বংশের হাওয়াইতাৎ (মান অঞ্চলের বেদুইন), আবার কেউ বা বলল ওরা রুওয়ালা গোষ্ঠীর। দেমাকী জইদ এক সময় মুখ খুলল: 'শোন, আমি বলে দিচ্ছি ওরা কোন বংশের লোক। ওরা আনেজী অঞ্চলের সুখর। আমার কথাই খেটে যাবে দেখবে।' এরপর দস্যুদের চেনার উপায় হিসেবে তাদের ভাষা নিয়ে আলোচনা হল। ওরা দু'চারটে মাত্র কথা বলেছিল। রাখালদের জিজ্ঞাসা করেছিল— 'তোমরা কোন গোষ্ঠীর আরব, অ্যাঁ? ফেজির?' এই কয়েকটি মাত্র কথায় কোনো ভাষার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয় না।

দুশমনদের তেরোজন ছিল অশ্বারোহী, কুড়িজন উটের পিঠে। হামলার সময় ওদের একটা ঘোড়া দলছুট হয়ে সরে পড়ে। সেটাকে আমাদের ছাউনিতে ধরে আনা হল। কিন্তু তা থেকেও শত্রুদের হদিশ করা গেল না। যাযাবর মানুষ অন্য পশুর গায়ে গোষ্ঠীর প্রতীক চিহ্ন দেগে দেয়, কিন্তু ঘোড়ার গায়ে তেমন কোনও চিহ্ন দেয় না। ঘোড়াটি কিন্তু তিন দিন পরে জলের অভাবে মারা গেল। মরুদেশে প্রত্যেকের ঘরেই সামান্য পরিমাণ জল মজুত থাকে— তা থেকে কেউ বেওয়ারিশ ঘোড়াকে জল দেবে না।

অনেক সময় কিছু দলছুট ছাগল ওদের ছাউনিতে এসে পড়ে; মালিকের পরিচয় না জানা থাকলে তাদের কেউ জল দেবে না। আমি যে সময়টা ওদের মধ্যে কাটিয়েছিলাম তার মধ্যে অবশ্য দু'একটি পশুকে বাঁচাতে পেরেছিলাম; যে সব বেদুইনদের চিকিৎসা করেছিলাম, তারা আমার অনুরোধে প্রাণীগুলিকে জল দিয়েছিল।

রহিয়েল কিছু সঙ্গী নিয়ে দুশমনদের খোঁজ করতে গেল। তিন রাত তারা ছাউনি থেকে অনুপস্থিত। সেই সময় পুরুষের সংখ্যা খুবই কম। তারা ক্রমাগত কফির আসরে মিলিত হত। মমতাময়ী স্ত্রী-বেদুইনরা সারাক্ষণ বাইরে বসে পাহারা দিত। চতুর্থ দিন বিকেলবেলা তারা 'লুলিল্লু' বলে উচ্চরবে আনন্দ প্রকাশ করল। কিন্তু খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরে তারা দেখল যে ঘোড়সওয়াররা সঙ্গে করে আর কোনো প্রাণী আনছে না। তখন তাদের কলকণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল। পুরুষরাও বেরিয়ে এসে দেখতে থাকল। একজন বলে উঠল— 'মেয়েগুলোর এত উল্লাস কেন? ওরা তো খালি হাতে ফিরে আসছে! প্রত্যেকেই তো নিজের তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছে!' হেরে যাওয়া মানুষের মতো তারা আবার মজলিশে ফিরে গেল— 'কেউ না কেউ ব্যাপারটা জানিয়ে যাবে।'

একটু পরেই রহিয়েল তার তাঁবুর সামনে নামল। আমরা যেখানে বসেছিলাম, ওর তাঁবুটা তার পিছন দিকে। ও যখন উটটাকে বসাল তখন ওর স্ত্রী এগিয়ে এসে, নীরবে স্বাগত জানিয়ে, উটের জিন-রেকাব খুলে ফেলল এবং স্বামীর সাজসরঞ্জামও ঘরে নিয়ে গেল। আরব পুরুষ প্রকাশ্যে স্ত্রীকে সম্মান দেয় না, মজলিশে তার সাথে কথাও বলে না। রহিয়েলও স্ত্রীকে কিছু বলল না, ঘরেও ঢুকল না। সে সোজা আমাদের সামনে এসে নীরস কণ্ঠে 'আসলাম আলায়কুম' বলল, এবং শ্রান্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বসে পড়ল। তারপর দুঃখের সঙ্গে জানাল— দ্বিতীয় দিনে ওরা নেফুদ পর্যন্ত দস্যুদের অনুসরণ করেছিল; তারপর শত্রুর আর হদিশ মিলল না— বালির ওপর সব চিহ্ন বাতাসে মুছে গিয়েছে। আল্লার যেমন মর্জি। এদিক সেদিক খুঁজে দেখার পরিকল্পনা তার ছিল না। বাড়ির পথই ধরল তারা। অন্য আরবদেরও প্রকৃতি একইরকম অলস— তারাও উত্তর দিল, 'ঠিকই হয়েছে। আল্লা এটাই চেয়েছিলেন।'

বুঝুন ব্যাপারটা! ওদের প্রায় সব ক'টা উটই লুঠ হয়ে গিয়েছে; লুঠেরাদের দলটাও যে খুব ভারী ছিল তা নয়। তবু, সামান্য একটু হাওয়ার অজুহাতে, ওরা দস্যুগুলিকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যেতে দিল! রহিয়েল আবার দুঃখজনক কাহিনীটির একটি সুন্দর উপসংহার টানল। নেফুদ-এর কাছে এল-হাইজা অঞ্চলে গোটাকয়েক কুয়ো ওরা আবিষ্কার করেছে; সেখানে জল আছে। আবার, ফেরার পথে চেইমা-র কাছে এসে সে শুনেছে যে দস্যুরা ছিল সেরারৎ গোষ্ঠীর মানুষ।

রহিয়েল ও তার সঙ্গীরা যে প্রায় দু'শো মাইল ঘুরে এল, তাতে কিছু লাভ হল না। কিন্তু এ নিয়ে বেদুইনরা আদৌ বিচলিত নয়। 'সময়ে জানা যাবে কারা আমাদের উট নিয়েছে। তখন, ইনসা আল্লা, আমরাও তাদের ওপর চড়াও হব, যা পারি কেড়ে আনব।' কিন্তু এই ধরনের অভিযানগুলি প্রায়শ খালি হাতেই ফিরে আসে। ফুকারা-র একটি দলে অভিযাত্রীর সংখ্যা কুড়ি। তারা সম্প্রতি আতিয়ে গোষ্ঠীর উপর চড়াও হয়েছিল, কিন্তু কিছুই নিয়ে আসতে পারেনি।

'আগ্নেয়গিরি হিসাবে ভিসুভিয়াসের নাম বিশ্বজোড়া। ১৮৭২ সালে সেখানে যে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে তার আমি প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ঐদিন সকাল থেকে একা ওই পাহাড়ের আরেক চূড়ায় দাঁড়িয়েছিলাম। জ্বলন্ত লাভার উপরে গন্ধকের গুঁড়ো ছড়ানো ছিল। তার উপর দিয়ে হাঁটবার সময় আমার পায়ের পাতা গন্ধকের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল। মাঝখানে চিমনি-আকৃতির একটি বিরাট গর্ত— খুব বেশি আগে তার উৎপত্তি ঘটেনি। গর্তটা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল— তাতে আমার নাক মুখ জ্বালা করছিল।'

উন্মুক্ত মরুভূমিতে প্রতিটি মানুষকে তার নিজের শক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। কেউই সেখানে সমাজ পরিষেবামূলক কোনো কাজের দায়িত্ব নেয় না। গোষ্ঠীর নেতা বড়জোর অনুরোধ করতে পারে; কিন্তু কাউকে বাধ্য করতে পারে না। অনেক সময় দলের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধে, বিক্ষুব্ধরা দল ছেড়ে চলে যায়; নেতা তাদের আটকে রাখতে পারে না। দলের সংহতি অত্যন্ত শিথিল, সভ্যদের মধ্যে সংযুক্তি দুর্বল। প্রায়ই তাদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। কোনো নিয়মশৃঙ্খলার ভিত্তিতে যদি গোষ্ঠীর কাজকর্ম চলত তাহলে এইসব দুর্বিপাকের অনেকটাই এড়ানো যেত। আমি জইদের কাছে কথাটা পাড়লাম। 'পশু চরাবার জন্য নির্বাচিত জায়গাগুলি সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেবার জন্য তোমরা আগে থেকে স্কাউট পাঠাও না কেন? আবার, শত্রু আসছে কি না জানবার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় তো পাহারা বসানো যায়, তাই না? বিপদ যখন তোমাদের নিত্যসঙ্গী, তখন এই ধরনের ঝুঁকি নাও কেন?

জইদ আমার প্রশ্নগুলি মজলিশের সামনে রাখল। রহিয়েল সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল— 'সুপারিশ তো ভালোই, কিন্তু আমরা কার্যকর করতে পারব না। খলিল, তুমি জেনে রাখো, এমন কোনোই বেদুইন নেই যে দু-একজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে এ রকম দুঃসাহসিক কাজের ভার নেবে। খুনে-বদমাশদের ভয় আছে। তারা কে কোথায় লুকিয়ে থাকে আগে থেকে জানা যায় না। হয়তো শুনলে পাহাড়ের ওপর থেকে বা ঝোপের আড়াল থেকে শব্দ ভেসে এল— 'দেখ!' সঙ্গে সঙ্গে গুলিটা তোমার গায়ে বিঁধে গেল।'

আগ্নেয়গিরি অঞ্চল

অনাজ একটা বড় আগ্নেয়গিরি। তার চূড়ায় উঠে লাভা অঞ্চলের যতদূর চোখ যায় পর্যবেক্ষণ করা আমার একটি শখ। কিন্তু সঙ্গী জোটে না। দু-একজন যদি-বা রাজি হয়, দলের নেতা গোপনে তাদের নিষেধ করে। তোল্লোগ নিজের এবং নিজের ছেলেদের জন্য চূড়ায় ওঠার সুযোগ সংরক্ষিত রেখেছিল। সে হয়তো ভেবেছিল যে আমি ঝরনা বা গুপ্তধন খুঁজে বার করবার কৌশল জানি। বেদুইনি বুদ্ধিতে তার মনে হত যে সম্পদ অর্জন ছাড়া ঐ অঞ্চলে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আসিনি। আমার মাধ্যমে সে নিজেও বড়লোক হওয়ার আশা পোষণ করত। ফেজির গোষ্ঠীর বেদুইনদের মানসিকতা ছিল শহর-ঘেঁসা। হজ অফিসারদের মনের কথা অন্যদের তুলনায় ওরা বেশি বুঝত। কিন্তু অভ্যস্ত বিশ্বাসগুলিকে ওরা আঁকড়ে বসে থাকত।

পাহাড়ে চড়া ওদের কাছে সমস্যা ছিল না— ওটা ওদের চেনা ব্যাপার। কিন্তু অজানাকে ওরা সন্দেহের চোখে দেখতো। খ্রিস্টান দুনিয়ায় যে সব ঘটনার কথা ওদের কানে আসত সেগুলো ওদের কাছে আজব মনে হতো। তোল্লোগ একদিন কফির আসরে আমাকে প্রশ্ন করল— 'আচ্ছা খলিল, আমাকে বলো তো-উড়তে পারে, এমন এক ধরনের জাহাজ আছে না খ্রিস্টানদের?' 'তা আছে বটে। এই তাঁবুটার

চেয়েও বড় একটা থলির মধ্যে বিশাল একটা বুদবুদ থাকে; সেটা আকাশে ভাসতে পারে।' 'আরও একটা খবর দাও। জলের নিচে চলতে পারে, এমন একটা জাহাজ আছে না? তার ভিতরে লোকজনও থাকে!' 'তা আছে; কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে?' 'আমার এক মামাতো ভাই সিরিয়ার সোয়াইৎ গোষ্ঠীর লোক। সে একটি মেমসাহেব বিয়ে করেছে। মেয়েটির অগাধ পয়সা। সাগরপারে কোথায় যেন তার বাড়ি, ঠিক জানি না।'

আগ্নেয়গিরি অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলির তুলনা নেই। একবার নতুন একটা জায়গায় ছাউনি পড়েছে। একটু উঁচু জায়গায় উঠে আমি চারদিকে তাকালাম। অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি চোখে পড়ল, গুনে দেখলাম চল্লিশটি। মনে কেমন ইচ্ছে জাগল— সবচেয়ে কাছাকাছি পাহাড়টা দেখতে গেলাম। সারা জায়গা জুড়ে খোঁচা খোঁচা ধারালো জমাট লাভা, মাঝে মাঝে আগ্নেয়শিলা ও অন্যপাথর ছড়ানো। এক মাইল চলতেই দম ফুরিয়ে যায়। এদিকে, বন্ধুদের কারও চোখে পড়লে সে আবার বারণ করতে পারে। যত তাড়াতাড়ি পারি এগিয়ে গেলাম। এইভাবে সবচেয়ে ছোট পাহাড়টির মুখের কাছে পৌঁছনো গেল। পাহাড়টি শ'তিনেক ফুট উঁচু। এক সময় অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল— মুখের কাছে রাশি রাশি ঝামা এবং আধপোড়া কয়লা, তার সঙ্গে, অবশ্যই ধারালো জমাট লাভার স্তবক। অতীতে কখনও বহুকাল ধরে বছর বছর এখানে অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে; ফলে তার সর্বাঙ্গ এবড়ো-খেবড়ো। যাই হোক, গহ্বরটির চারপাশেই লাভা— যেন ধাতু গলানোর পর খাদ জমে রয়েছে। খোঁচা খোঁচা অজস্র স্তবক, ধাতব অস্ত্রের মতোই ধারালো। আমি যেদিক বেয়ে নামলাম তার উল্টো দিকে দেয়ালটি ভেঙে পড়েছে। অগ্ন্যুৎপাতের শুরুতে— লাভা বেরোবার সময়— যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তারই ফলে এই অবস্থা। তখনও গর্তটির সৃষ্টি হয়নি। বিরাট একখণ্ড লাল গ্রানাইট চোখে পড়ল— আগ্নেয়গিরিটির ভূমধ্যস্থ কোনো শিরা থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। লাল গ্রানাইটকে বেদুইনরা 'হজর এল-ক্রা' বলে। ঐ অঞ্চলের কোনো কোনো জায়গায় অগভীর স্থানেও লাল গ্রানাইট পাওয়া যায়। শোনা যায়, অনাজ-এর আশে পাশে বেশ কিছু লাল গ্রানাইট চোখে পড়ে। যৌ অঞ্চলে তো অনেক জায়গায় এই পাথর স্তূপাকার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্তেফা জায়গাটি অপেক্ষাকৃত নিচু; শুনেছি লাল গ্রানাইট সেখানকার প্রধান পাথর। উত্তর-পশ্চিমের বেহামা অঞ্চলের ওয়াত্তিদ ও যত্তলা পাহাড়দুটির উপাদানই নাকি এই পাথর— অটল উত্তুঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এই হজর এল-ক্রা বেদুইনদের খুব কাজে লাগে— ওদের ভালো ভালো যাঁতাগুলি এই পাথর থেকেই তৈরি হয়। ওদের অবশ্য আধুনিক কোনো যন্ত্রপাতি নেই; একখণ্ড পাথর বেছে নিয়ে আর একখণ্ড শক্ত পাথর দিয়ে ঘা মেরে মেরে ইচ্ছানুরূপ আকৃতি দেয়। ঘোরাবার দণ্ডটি বসাবার জন্য যাঁতায় যে গর্তটা তৈরি করতে হয় সেটা বানাবার জন্য ওরা গজাল ব্যবহার করে। গহ্বরটির নিচে কিছুটা জায়গা জুড়ে একটা গর্ত দেখলাম। গর্তটির সব জায়গা জুড়ে হলদে খড়িমাটির একটা ছিদ্রময় আবরণ। সেখান থেকে তখনও অগ্ন্যুৎপাতসুলভ গন্ধের রেশ ভেসে আসছিল— ছিদ্রগুলির সাহায্যে পাহাড়টি যেন নিঃশ্বাস নিচ্ছে। গর্তটির চারপাশে ছড়ানো ধাতব পাথর— তার অনেকগুলি সাধারণ সবুজাভ কেলাস, অর্থাৎ ক্রাইসোলাইট।

বিভিন্ন উচ্চতা থেকে আগ্নেয়গিরি অঞ্চলের দিকে তাকালে পরিত্যক্ত মরুভূমি ছাড়া কিছুই চোখে পড়বে না। জঘন্য রকম কালো রঙের মধ্যে বিক্ষিপ্ত নিষ্প্রাণ বস্তু। প্রকৃতির দিকে তাকালে মনে হবে সে নিতান্ত নির্মম, কোনোকালেই তার মুখে হাসি ফোটে না। এখানে সবকিছুরই গঠন অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতা এক ধরনের ভীতির সঞ্চার করে, যা একাধারে বেদনাদায়ক ও অসুন্দর। আকাশ যেখানে বন্ধ্যা, মাটিও যেখানে ভয়ঙ্করী, সেখানে জীবনের প্রবেশাধিকার নেই। সেখানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় অনধিকার প্রবেশ করতে কে না সঙ্কোচ বোধ করবে? এখানে আত্মপ্রসাদের অবকাশ নেই। এখানে মানুষের উপলব্ধি ঘটে যে তার সত্তা নিতান্তই নগণ্য, আদিম প্রকৃতির স্বর্গীয় সুষমার সামনে তার উপস্থিতি নিতান্ত অপবিত্র। প্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তি এখানে যেন নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিয়েছে। জীবনের এখানে বিশেষ তাৎপর্য নেই; বস্তুতে প্রাণসঞ্চার নিতান্তই দৈবঘটনা; জীবের গতিবিধি মন্থর; জীবের টিকে থাকা নির্ভর করে পরগাছা-বৃত্তির ওপর।

অনাজের দূরত্ব বারো মাইল। আশপাশের ঢেউ-খেলানো পাথরের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়— পাহাড়টি যেন পাথরের ঢেউয়ের উপর নৃত্য করছে। মাঝখানে শুধু গর্ত, লাভার পাহাড় এবং বিক্ষিপ্ত আগ্নেয়শিলা। অনাজে পৌঁছবার আশা আমি ত্যাগ করলাম।

আমরা যখন আবার জায়গা বদল করলাম, তখন আমার মনে হ'ল যে এইরকম ভয়ঙ্কর জায়গার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। ভিসুভিয়াস থেকে দক্ষিণ-পুব দিকে তাকালে যে অনুভূতি হয়, এ যেন তারই সমান, বা তার হাজার গুণ ভয়ঙ্কর। কোনও ইউরোপীয় ভিসুভিয়াসে যাবে না— তার বুক দুরু দুরু করবে, তার পা ঠিকমতো চলবে না। আরবে কিন্তু যাযাবর গোষ্ঠীগুলি ঐ অবস্থা থেকেই ফয়দা তুলছে; দুধ-ঘিয়ের ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। ওরা যদি কোনো ফাটলের মধ্যে বা গহ্বরের নিচে নামে, তাহলে দু'তিন দিনের জন্য সেটাই ওদের ঘরবাড়ি। আগ্নেয়শিলাগুলির বিশ্রী দাগ, দু'একটা কাঁটাঝাড় বা নিষ্পত্র বন্ধ্যা ঝোপঝাড়— সব কিছুই চেনা, অভ্যস্ত হয়ে যায়; এ সবের জন্য মনে মায়ারও সঞ্চার হয়, ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করে না। মানুষী নিগ্রোদের কথাই ধরা যাক। মানুষ হিসেবে ওরা সাদাসিধে, মনটাও ওদের সরল। জন্মভূমি মরু অঞ্চলকে ওরা ভালোবাসে। ওদের ধারণা— দুনিয়ার বেশিরভাগ জায়গাই লাভায় ঢাকা। 'খলিল, তোমার দেশ কি লাভা অঞ্চলে, না সমতল মরুভূমিতে?' শুধু বাচ্চারা নয়, বয়স্ক নারীপুরুষও আমাকে প্রশ্নটা করেছে।

লাভা অঞ্চলে শুধু আরবদের আর তাদের পশুপালের দেখা মেলে; আর কোনো ধরনের প্রাণ নেই বললেই চলে। উঁচু জায়গার হাওয়া বিশুদ্ধ; কিন্তু একটা মাছি পর্যন্ত সেখানে উড়ে যেতে পারে না। যাযাবর গোষ্ঠীগুলোর তাতে আটকায় না, সর্বত্র তাদের বসতি ছড়িয়ে আছে। আর আছে সোয়াদিয়া— থ্রাসের চেয়েও ছোট এক জাতের পাখি, কালো রঙের, দু'একটা পালক শুধু শাদা, খুবই স্ফূর্তিবাজ। মরু অঞ্চলে সোয়াদিয়াই মানুষের একমাত্র প্রতিবেশী। পরিত্যক্ত প্রান্তরে, অবিন্যস্ত জীবনে, জনহীন পাহাড়ের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কখনো কখনো সুকণ্ঠ সোয়াদিয়ার মধুর সঙ্গীত শোনা যায়। তখন মনে হয়, অতিপ্রাকৃত মঙ্গলময় কোনো সত্তা বুঝি শ্রোতার আত্মাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

অন্য প্রাণী একেবারেই নেই বলাটা ঠিক হ'ল না। বড় জাতের একটা পশু— নেকড়ে— ছাউনিগুলোর কাছে ঘোরাফেরা করে। সংখ্যাও তাদের কম নয়, সমতলভূমির তুলনায় বরং বেশি। সাহসও তাদের যথেষ্ট; সমতলের নেকড়েদের তুলনায় পাহাড়ী নেকড়েদের সাহস বেশি।

আরবদেশের রাত বেশ শান্ত। এই উচ্চতায়— জুন মাসের প্রথম দিকেও— রাত বেশ আরামপ্রদ। গরমকালেও এখানে হাওয়ার অভাব নেই। আমি একদিন তাপমাত্রা নিয়েছিলাম— সূর্যোদয়ের সময় ৭৯°F, বেলা বাড়লে ৯০° এবং ভরদুপুরে তাঁবুর ছায়ায় ৯৫°। শীতকালে কিন্তু এই উঁচু জায়গাতেই অসহনীয় ঠান্ডা পড়ে। কন্‌কনে ঠান্ডা হাওয়ার মুখোমুখি দাঁড়ানো তখন বেদুইনদের পক্ষেও মুশকিল। ওয়াহিব গোষ্ঠীর মানুষরা তখন তেহিসা অঞ্চলে ওয়াদি যিজ্জলের সব চেয়ে নিচু দিকটায় আশ্রয় নেয়। সেখানে অজস্র তুর্ফা (ঝাউগাছের শুকনো কাঠ) পাওয়া যায়। তাঁবুগুলো এমনভাবে বন্ধ করা হয় যে কোথাও ফাঁক না থাকে; সারা রাত ধরে সেখানে আগুন জ্বলে। বেদুইনদের শরীর ছিমছাম ধরনের। ওদের পোশাক বলতে একটা সুতির আঙরাখার উপর আর একটা ঢিলেঢালা জামা। গায়ে কিছু চাপা দিয়ে শোয় না ওরা। তবু ওরা বলতে পারে— 'খুব একটা শীত করে না আমাদের।' দিনের বেলা গরম কফি বা দুধে চুমুক দিয়ে আরাম করে ওরা। শীতের দুপুরে রোদ্দুরও বেশ আরামদায়ক।

আমাদের পানীয় জল সংগ্রহ করা হতো ডোবা থেকে। সে জল যেমন কালো, তেমনই ঘন, আর তেমনই দুর্গন্ধযুক্ত। সাধারণত উটদের দু'তিনবার জল খাওয়ানোর পর ডোবার তলানি পর্যন্ত তুলে নেওয়া হতো। সেই জলে ধুলে কাপড়চোপড় পরিষ্কার না হয়ে আরও ময়লা হতো। বেদুইনদের কিন্তু ঐ জল পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হতো— আর কোনো রকম জল তো ছিল না! তার চেয়েও খারাপ ছিল ওদের সংকীর্ণ স্বার্থবোধ। বারণ করতে পারে এমন কেউ কাছেপিঠে না থাকলে অনেকেই ডোবায় নেমে চান করত, নোংরা কাপড়চোপড় ধুয়ে নিত। চান করা যাযাবরদের কাছে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মতো; জল পেলেই ওরা চান করবে। অনেক সময় ওদের কেউ আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে একবাটি জল হাতে করে মঞ্জিল থেকে বেরিয়ে পড়তো, মরুভূমির কোনো গোপন জায়গায় চলে যেত।

যাযাবররা কখনও কখনও ডোবাগুলির সংস্কারও করে। কোনো ডোবা হয় তো কয়েক পুরুষ ধরেই ব্যবহৃত হচ্ছে, অর্ধেকটা ডোবাতেই প্যাঁচপেঁচে তলানি ছাড়া কিছু নেই। সংস্কার না করলে ঐ ডোবার জল আর ব্যবহার করা যাবে না। এরকম ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় ওরা ডোবা থেকে সব নোংরা জিনিস তুলে ফেলে। তবে কোনো ব্যাপারেই ওরা নিয়ম মেনে চলে না। বুদ্ধি ওদের যথেষ্ট, কিন্তু দশজনে মিলেমিশে কাজ করার অভ্যাস নেই। ওরা এমনই স্বাধীনচেতা যে নেতা ওদের কোনো কিছু করতে বাধ্য করতে পারে না। ডোবা-সংস্কারের ক্ষেত্রেও ঠিক সেরকমটিই ঘটে। কোনো বেদুইনের হয়তো এমনিতেই ইচ্ছে হল, অথবা মনে হ'ল যে তার নিজের সুবিধে হবে; তখন সে নিজের উদ্যোগে মরে যাওয়া কুয়ো পরিষ্কার করতে লেগে গেল।

অ্যায়ুরিড। ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত (১৮৭২)

অ্যায়ুরিড পর্বতের দিকে তাকালে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। এ যেন সেই বিরাট বিশ্বরূপ, যার স্বরূপ জানা সহজ নয়। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যে লাভা ছড়িয়ে পড়েছিল, তা জমাট বেঁধে ২০০০ বর্গমাইল জুড়ে বেলেপাথরের একটা মঞ্চে পরিণত হয়েছে। এখানেই শেষ নয়। মঞ্চটির পরে একেবারে সমতল ভূমি পর্যন্ত ছোট ছোট বেলেপাহাড়, বেলেপাথরের ছুঁচোলো লাঠি এখানে সেখানে ছড়ানো। মনে হয় সমস্ত জায়গাটা একসময় সমতলভূমি ছিল। কালক্রমে একটু একটু করে ক্ষয়প্রাপ্তির ফলে পাথুরে জমির বাঁধুনি আলগা হয়ে যায়। অগ্ন্যুৎপাতের সময় জায়গাটা পাহাড়ের আকৃতি লাভ করে। যে লাভা নিষ্ক্রান্ত হয় তা পাহাড়টিকে ঢেকে ফেলে, এবং গঠনে একটা দৃঢ়তা এনে দেয়। অ্যায়ুরিড এখন ১০০ ফ্যাদম উঁচু একটা বিরাট পর্বতে পরিণত হয়েছে।

এখানে লাভার আস্তরণ বেশ পুরু। ধরে নেওয়া যায় অনেক কাল আগেই অঞ্চলটির রূপান্তর শুরু হয়েছিল। পাহাড়টির গায়ে বেশ কয়েকটা ফাটল আছে। সেগুলো বর্ষাকালে ঝরনার কাজ করে, বাকি সময়টা শুকনো থাকে। ফাটলগুলির গায়ে স্তরের পর স্তর আগ্নেয়শিলা জমে আছে। আশপাশের পাহাড়গুলি তেমন বড় নয়। মনে হয় ছিটকে যাওয়া গাঁজলা এবং গুঁড়ো জমাট বাঁধার ফলে এদের উৎপত্তি। থিরবা-র মতো কোনও কোনও জায়গায় জমি ফেটে গিয়ে শ'খানেক ফ্যাদম গভীর কড়াইয়ের মতো গর্ত হয়েছে। গর্তগুলির সর্বত্র লাভা অথবা অগ্নিশিলা। এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত নেই। তা সত্ত্বেও এই বিরাট গর্তগুলির কি করে উৎপত্তি হলো কে জানে! এখানে জমি আবার সব জায়গায় কঠিন নয়। নরম জায়গার উপর কিছুমাত্র নড়লে জমিতে দাগ পড়ে। মেদাইন-এ আমরা পাহাড়ের গায়ে কিছু লেখা খোদাই করা আছে দেখলাম। অর্থাৎ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গজালগুলি অকেজো হয়ে যায়নি। ২০০০ বছর ধরে এই আবহাওয়ার প্রভাবে থেকে কিছু কিছু বালিপাথর নরম হয়ে গিয়েছে। আদিতে যা ছিল লৌহকঠিন, অদম্য, প্রায় অবিনশ্বর— কাল তারও শক্তিক্ষয় করে।

এখানে অক্ষত কিছু দেখতে পাওয়া যাবে না— সব জায়গায় ফাটল। বালিপাথরের কাঠামোর উপর উৎক্ষিপ্ত বিশাল লাভার আঘাতের ফলেই সম্ভবত ফাটলগুলির সৃষ্টি। অগ্ন্যুৎপাতের আগেও অবশ্য মাটিতে কিছু ফাটল ছিল। সেগুলোর মধ্যে লাভা ঢুকে উপচে পড়ে থাকবে। প্রচণ্ড উত্তাপে পাথর গলে যায়। আশে পাশে যে জল আটকে থাকে তা বাষ্পে পরিণত হয়ে বিরাট চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপের ফলে লাভা প্রচণ্ড বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই লাভার আঘাতে বালিপাথরের উপর নতুন ফাটলের উৎপত্তি হয়।

আগ্নেয়গিরি হিসাবে ভিসুভিয়াসের নাম বিশ্বজোড়া। ১৮৭২ সালে সেখানে যে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে তার আমি প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ঐদিন সকাল থেকে একা ওই পাহাড়ের আরেক চূড়ায় দাঁড়িয়েছিলাম। জ্বলন্ত লাভার উপরে গন্ধকের গুঁড়ো ছড়ানো ছিল। তার উপর দিয়ে হাঁটবার সময় আমার পায়ের পাতা গন্ধকের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল। মাঝখানে চিমনি-আকৃতির একটি বিরাট গর্ত— খুব বেশি আগে তার উৎপত্তি ঘটেনি। গর্তটা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল— তাতে আমার নাক মুখ জ্বালা করছিল। অনেকে রাত্রিবেলা সমতলভূমি থেকে পাহাড়টাকে দেখছিল; তাদের কাছে চূড়াটায় আগুন জ্বেলে আলোক-সংকেত দেখানোর মতো দেখাচ্ছিল। ওখান থেকে একটু একটু করে লাভা গড়িয়ে পড়ছিল। একটু দূরে পাহাড়টার আর একটা আগ্নেয় মুখ সৃষ্টি হয়েছিল। সেটি থেকে রোজই অগ্ন্যুৎপাত ঘটত, কিন্তু তার বেগ ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল। সেটি তরল লাভায় ভর্তি ছিল। শক্তিতে দুর্বল হলেও সেটা থেকে শব্দ বের হচ্ছিল খুবই জোরে— পাহাড়টি যেন বেদনায় আর্তনাদ করছে। সেখান থেকে মাঝে মাঝে কাদার মতো কোনো জিনিস ছিটকে আসছিল। আমি ওই সাংঘাতিক গর্তটির কাছে গেলাম। অগ্নিময় গর্তটি কানায় কানায় ফুলে উঠেছে, কিছুটা তরল বস্তু উপচে পড়ছে। মাঝখানটায় একটা ধাতুর ফোয়ারা। হাওয়ার সংস্পর্শের ফলে সেখানে মাঝে মাঝে সর পড়ছিল, কিন্তু তা মুহূর্ত পরেই ভেঙে যাচ্ছিল। পাতালের গাঁজলা থেকে যে বাষ্প উঠছিল তার চাপে ওই তরল লাভা কামানের গোলার মতো প্রচণ্ড বেগে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল। তার আঘাতে সরের মতো জিনিসটা লোহার চাদরের আকৃতিতে নানাদিকে ছিটকে পড়ছিল। খণ্ডগুলোর কোনোটা ইটের আকার, কোনোটা বা আরও অনেক বড়। কাদা-কাদা গাঁজলারাশি শব্দ করতে করতে আকাশে আধমাইল উঁচু অধিবৃত্ত-পথ অতিক্রম করে মাটিতে পড়ে ভেঙে যাচ্ছিল। গর্তটির পাশ দিয়ে দুর্গন্ধ লাভা গড়িয়ে পড়ছিল।

বিকেলের দিকে অবস্থা কিছুটা পাল্টালো। পাহাড়টির গর্ভে যে ধাতু জন্মেছিল, তার পরিমাণ হ্রাস পেল। গর্তটির দেয়ালে উৎক্ষিপ্ত গুঁড়ো জিনিসের সঙ্গে নিচের লাভা মিশে রাজমিস্ত্রিদের জল-বালির মিশ্রণের মতো কাদা-কাদা জিনিস উৎপন্ন হলো। পাহাড়ের গায়ে কিছু ছিদ্র হয়েছিল— এই মিশ্রণ সেগুলি দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে এলো। জিনিসটা যেখানটায় পড়ল কিছু মানুষ সেখানে এগিয়ে এসেছিল। ঐ মিশ্রণ তাদের উপর এসে পড়ল, তাদের পোশাক ভেদ করে ভিতরে ঢুকে গেল। বলা বাহুল্য, তারা সকলেই মারা গেল; একঘণ্টাও কেউ বেঁচে ছিল কি না সন্দেহ। একজন যুবক ছুটে আসা লাভা থেকে পালানোর চেষ্টা করল, কিন্তু লাভাস্রোত তাকে ধরে ফেলল, সে লাভায় তলিয়ে গেল। লাভাস্রোত তখন লন্ডনের টেম্‌স্ ব্রিজের মতো চওড়া।

ইতিমধ্যে গর্তের লাভার চাপ বেড়ে চলেছে— তরল খনিজ আরো খানিকটা বিস্তার লাভ করতে চাইছে। গর্তটি সেই অতিরিক্ত চাপ সহ্য করতে পারল না। নিচে থেকে চূড়ায় ওঠার পথটি তার ফলে ভেঙেচুরে আরও বড় হল, উপরমুখী ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হল।

পরের দিন সকাল হওয়ার আগেই গর্তটি বিরাট একটা লাভার কড়াইতে পরিণত হয়েছে। তার বিস্তৃতি মোটামুটি একটা শহরের বিস্তৃতির সমান। গর্তের মধ্যে লাভা আস্তে আস্তে ফুটে চলেছে। শব্দ বের হচ্ছে দুনিয়া কাঁপানো। আধদিনে যতটা পথ চলা যায়, চারদিকে ততটা দূর পর্যন্ত মাটি কাঁপছে। গর্তের তরল বস্তু বাষ্পের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, এবং হাওয়ার সংস্পর্শে হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে। বাষ্প এবং ধোঁয়া বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, আগ্নেয় ঝটিকাকে ঘিরে ধরেছে। আকাশে বৈদ্যুতিক শক্তির অতিরিক্ত আধান ঘটেছে। বাজও পড়ছে, কিন্তু গহ্বর-নিঃসৃত শব্দের জন্য বাজপড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে না। দিনের পর দিন, মাইলের পর মাইল যেমন বিপজ্জনক গুজব ছড়াচ্ছে, তেমন অগ্ন্যুৎপাতজনিত শব্দও কানে আসছে। বহুদূর পর্যন্ত আগ্নেয়ধূলির বৃষ্টি হচ্ছে। পাহাড়ের চারধারে ছোট ছোট ঝামা ছড়িয়ে পড়ছে। আর বড় আকারের সব পাথরখণ্ড গুহামুখের পাশে, পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। হাজার পাঁচেক ফুট নিচে থেকে কিছু পাথর উঠে এলো; প্রথমে তাদের চেনা গেল না, পরে জানা গেল চুনাপাথর।

রাতে দুই চূড়ার মাঝখানের জায়গা থেকে অগ্ন্যুৎপাত অনেকটা গমের আঁটির মতো দেখাচ্ছিল। আঁটিটার ব্যাস অবশ্য মাইল খানেক। তার রঙ কোথাও বেগুনি, কোথাও বা লাল। গুহাটা থেকে মাঝে মাঝেই ঢেকুরের মতো শব্দ হচ্ছিল। তরল লাভা সমুদ্র থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। ইতিমধ্যে লাভা-সমুদ্রটি আধমাইল চওড়া হয়ে গিয়েছে।

আগুন থেকে যে তীব্র আলো বের হচ্ছিল তা কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না— ধুলোয় তার তীব্রতা অনেকখানি চাপা পড়েছিল। গাঢ় অন্ধকার আর কালো রঙের ধুলো এমনই ব্যাপার যে নিজের হাত বা পায়ের কাছে মাটি দেখা যায় না। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম, সেটা দুলছে। পায়ের নিচে পাহাড় অবিরাম কেঁপে চলেছে; পাহাড়ের মুখ থেকে বিকট শব্দ বের হচ্ছে, মাইল খানেক দূরে দাঁড়িয়েও নিজের বা সঙ্গীর কথা প্রায় শোনা যায় না।

আরও কিছুদিন কেটে গেলে মাটির নিচের উত্তেজনা হ্রাস পাবে, অগ্ন্যুৎপাত থেমে যাবে। ভিসুভিয়াসের গর্ভে অতিরিক্ত যা কিছু জমেছিল, সেগুলি বেরিয়ে গেলে শেষবারের মতো নড়াচড়া করে অবশিষ্ট লাভা পাহাড়টির তলদেশে নেমে যাবে। আগ্নেয় শক্তি সেখানে কঠিন আবরণের নিচে চাপা পড়েছে, অনেক সময় ধরে ঠাণ্ডা হয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, এই বিরাট পরিমাণ বস্তু ঠাণ্ডা হতে দু'তিন পুরুষ কেটে যাবে; এই কাঠিন্যও খুব গভীর পর্যন্ত পৌঁছবে না। অনেকখানি গভীর সুড়ঙ্গের তরল দ্রব্য জমাট বেঁধে শক্ত হতে হলে ভিসুভিয়াসকে যুগ যুগ ধরে শান্ত থাকতে হবে। পাহাড়টির তলদেশে তরল বস্তুর যে হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে সেটি বহু বছরেও জমাট বাঁধবে না। মাটির ভিতরে কাদা-কাদা যে বস্তুটি রয়ে গেল তার সক্রিয়তাও চিরকালের জন্য থেমে থাকবে না। ভিসুভিয়াস আবার যখন জীবন্ত হবে, তখন এই তরল ধাতুরাশি আবার ফুলে উঠে নতুন করে উৎক্ষিপ্ত হবে। সমুদ্রের নোনাজল মাটি বেয়ে চুঁইয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লে এইরকম আগ্নেয় উদ্দীপনা সম্ভব। সুড়ঙ্গটি তখন আস্তে আস্তে উত্তপ্ত হবে, আগ্নেয়শিলার যে স্তূপটি তার মুখ আটকে রেখেছিল, তার শক্তিহ্রাস ঘটবে। এমনও ঘটতে পারে যে প্রচণ্ড চাপে নির্গমনপথটি অকস্মাৎ খুলে গেল।

আরবি ভাষায় লাভাকে 'লাব' বলা হয়। আরবরা যখন সিসিলি জয় করেছিল, তখন সেখানে লাভার প্রাচুর্য ছিল। তখন তারা দ্রব্যটিকে নাম দিয়েছিল লাব। 'লাব' থেকেই কি লাভা শব্দটি ইউরোপীয় ভাষায় এসেছে? অবশ্য লাভা বলতে আমরা যা বুঝি তেইমার উপকণ্ঠের বা খাইবার অঞ্চলের আরবরা ঠিক তা বোঝে না। লাব বললে শুধু আগ্নেয়শিলা এবং কাচের মতো ধারালো ধাতব শিলাই বোঝায়। গাঁজলা, গাদ, ঝামা, ছাই প্রভৃতি লাবের অন্তর্ভুক্ত নয়। আগ্নেয় অঞ্চলের প্রসঙ্গ এখানেই শেষ।

তেইমা-র ফেজির উপজাতিরা/ইসা এবং জইদ

ফেজির বেদুইনরা আর একবার তেইমা-তে জলসংগ্রহ করলো। আমাদের দলের লোকেরা বেশ বড় একটা পশুপালের মালিক। সবগুলি পশুকে এক জায়গায় জড়ো করা হলো। মাল-বওয়া উটগুলিকে প্রথমে জল খাইয়ে তাঁবুর কাছে বেঁধে রাখা হলো। কারণ মেসান ও অন্য সকলে পরের দিন সকালে মরুভূমিতে ফিরে যাবে।

পশুগুলির মধ্যে আমার মাদী-উটটাকে খুঁজে পেলাম। দেখলাম তার শিরদাঁড়ার কাছে একটা ঘা হয়েছে। ১৫/২০ দিনের আগে ঐ ঘা সারবে না, অথচ আমাকে পরের দিনই যাত্রা করতে হবে। বন্ধুদের ডেকে উটের পিঠ দেখালাম। দেখে শুনে তারা রায় দিল যে উটটার পিঠে চড়া হয়েছে এবং খারাপ ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। লোমশ পিঠের উপর জিনের দড়ির দাগ পড়েছে। উটটার দেখাশোনা করার দায়িত্ব ছিল ইসা-র। ওই উটটাকে চরাত। ও ছাড়া আর কারো দোষে ব্যাপারটা ঘটেনি। ইসা একজন যুবক। তার সঙ্গে আমি বন্ধুর মতোই আচরণ করতাম। এখন আমি ওর দাড়ি ধরে সকলের সামনে গালি দিলাম: 'ব্যাটা ইহুদীর বাবা!' ছোকরার গায়েও জোর ছিল, মনেও সাহস ছিল, ও আমার কাঁধে হাত রাখল, 'খ্রিস্টান' বলে গালাগালি দিল। আমি বললাম— 'উটটার ঠিকমতো যত্ন নেওয়া তোমার কর্তব্য ছিল।' তখনো শক্ত করে ওর দাড়ি ধরে রেখেছি। বেদুইনরা সকলে এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো। তারা চুপ করে দেখতে লাগলো। ইসার নিজের পরিবারের লোকরাও কোনো কথা বলল না। আসলে তাদের সঙ্গেও তো আমার বন্ধুত্ব ছিল। তাছাড়া ওদের ধারণা ছিল আমি সবসময়েই ন্যায়ের পথে চলি। ইসা যখন দেখলো, সে দোষী বলেই তাকে তিরস্কার করা হচ্ছে, তখন মেনে নেওয়া ছাড়া তার গতি রইল না। আমি ছোকরার সুঠাম মাথাটা টেনে তার বুকের কাছে নামালাম, তারপর ছেড়ে দিলাম। জোর দেখানোর চেষ্টা অশোভন হতো। তাছাড়া, যার প্রতিকার নেই তা নিয়ে দুঃখ করা বোকামি। তার দোষ আমি মনে রাখিনি, কিন্তু একটু কড়া হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম। যাযাবররা দাড়িমের মতো মানুষ পছন্দ করে— তেতো এবং মিষ্টির সমন্বয়। সেই মানুষ নিরাপদ সময়ে বন্ধুদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করবে, স্নেহশীল আচরণ করবে; কিন্তু নিজের বা প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষার প্রয়োজনে 'ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ'-ও প্রকাশ করবে।

কিছু সময় পরে ইসার বাবা সালি আমার তাঁবুতে এলো। সে অনুতপ্ত স্বরে ছেলের ভুল স্বীকার করলো। 'কিন্তু, খলিল, তুমি কেন সকলের সামনে আমাকে ইহুদী বলে গালাগালি দিলে? আমরা তো তোমার বন্ধু!' আমি হাসলাম, সালিও হাসলো; আমি হাত বাড়ালাম, সেও হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরলো।

সন্ধেবেলায় দেখলাম জইদ হান্দাদ-এর কাছে একটা মাটির বেঞ্চিতে বসে আছে। গ্রামবাসীদের চেনা-জানা কোনো মানুষের সঙ্গে যদি দেখা হয়, তারই অপেক্ষায় সে শহরের মাঝখানে এসেছে। তার আশা, ঐ লোক তাকে রাতে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করবে। ঘণ্টাখানেক ঘুরে এসে দেখি— জইদ একই জায়গায় বসে আছে। তার কালো মুখমণ্ডলে বেদুইন সুলভ ক্ষুধা সহ্য করার ক্ষমতা এবং তেইমার অধিবাসীদের সম্বন্ধে বড়লোক সুলভ অবজ্ঞা যুগপৎ ফুটে বেরুচ্ছে। জইদ যদি উদার হতো, মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারতো, তাহলে তার উন্নতি হতো। কিন্তু ওর মন ছিল সঙ্কীর্ণ এবং প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে উদাসীন। আমি ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য থেকে গেলাম। ও তখন ওর পাইপ বের করলো— ধূম্রপানে ক্ষুধা মরে। ও তারপর পাশের বাড়ি থেকে একটা ছেলেকে ডেকে এক টুকরো জ্বলন্ত কয়লা চাইলো। ছেলেটা কয়লা এনে দিল।

সেই রাত্রে ঘণ্টাখানেক পার না হতেই জোর ঝড়বৃষ্টি নামলো। ঝড়ের দাপটে বড় বড় খেজুর গাছ প্রায় মাটি পর্যন্ত নুয়ে পড়লো। মনে হচ্ছিল ওরা বুঝি শিকড়সুদ্ধ উপড়ে পড়বে। মেসান ও আমি ফজর্-এর অতিথি; আমরা দু'জন ওর বাড়িতেই আশ্রয় পেলাম। কিন্তু বাড়ির চালটা ছিল কঞ্চি ও মাটি দিয়ে তৈরি। একটু পরেই ভিজে চপ্‌চপ্ করতে লাগলো। দেয়াল বেয়ে ঘরের ভিতর জল পড়তে লাগলো।

পরের দিন বিসরদের সঙ্গে আমার বেরিয়ে পড়ার কথা। মেসান সে কথা পাড়লো। শান্ত, সহৃদয় এই মানুষটি ফজরকে সাক্ষী রেখে আমাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলো। জইদের কথাও সে তুললো। জইদ না কি আমাকে পরিত্যাগ করেছে। ওর মতে, জইদের উচিত ছিল বিসরদের কাছে আমার প্রশংসা করা। ওদের আশঙ্কা, জইদের সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। বললাম, 'তাতে অবাক হওয়ার কী আছে?' দু'জনেই বলে উঠল, 'জইদ হৃদয়হীন। আল্লার দোহাই, জইদ হৃদয়হীন!' কথাটার ওরা কয়েকবারই পুনরাবৃত্তি করলো।

ফজর পাথুরে রোগে খুব কষ্ট পাচ্ছিল। ঐ অঞ্চলে ওটা খুব সাধারণ রোগ। অনেক সময় এই রোগ খুব যন্ত্রণাদায়ক হয়। বেদুইনদের ধারণা, জ্বলন্ত মাটির উপর খালি পায়ে চলার ফলেই এই রোগ হয়।

আবহাওয়া শান্ত হলে আমরা ঘুমোতে গেলাম। তেইমা-তে সেটাই আমার শেষ রাত।

ভাষান্তর: সুশীল ভদ্র

Voyagers Club TOURS

বিদেশ ভ্রমণে বাঙালীর সঙ্গী

২১ দিনে আমেরিকা ও কানাডা
সানফ্রান্সিসকো, লসএঞ্জেলেস, লাসভেগাস, ওয়াশিংটন, নায়াগ্রা, নিউইয়র্ক, কানাডার রাজধানী অটোয়া, টরোন্টো ও মন্ট্রিল। বিশেষ আকর্ষণ: গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে সারাদিন, হলিউড তারকাদের বিভারলী হিলস, ম্যানহাটনে ক্রুজ, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দপ্তর। ২৯/৫/৬

১৯ দিনে আলাস্কা সঙ্গে রকি
আলাস্কা ক্রুজ সঙ্গে রকি পাহাড় ও উত্তর মেরুর ডেনালী পার্ক, সিয়াটেল, ভ্যানকুভার, কেচিকান, জুনাউ, গ্লেসিয়ার বে ন্যাশানাল পার্ক, স্কাগওয়ে, অ্যানকারেজ। ২০/৫

১৭ দিনে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড
সিডনি, কেনস্, ব্রিসবেন, গোল্ড কোস্ট সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড, রোটোরুয়া - ওয়াইটোমো গুহা, কুইন্স টাউন, মিলফোর্ড সাউন্ড, ফ্রান্স জোসেফ জলপ্রপাত - লেক হাইউয়া ও ওয়ানাকা, ক্রাইস্টচার্চ ১৫/৯

১৬ দিনে স্ক্যানডিনেভিয়া ও রাশিয়া
সান্তাক্লজের দেশ ফিনল্যান্ড, নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্ক, ফিওর্ড ক্রুজে বিহার, ট্রাম রেলের অভিজ্ঞতা, মস্কোর ক্রেমলিন ও মেট্রো, সেন্ট পিটার্সবার্গের হারমিটেজ, রাশিয়ান বাদ্যঘর ও চিরন্তন লোকনৃত্য। ২৮/৫,৮/৬

১৬ দিনে ইউরোপের ৯টি দেশ
ইতালী, ভাটিকান সিটি, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও লন্ডন ২০,২৭/৫,২৪/৬,১১/১০

১১ দিনে দক্ষিন আফ্রিকা
জোহানেসবার্গ, কেপটাউন, গার্ডেনরুট, ক্রুগারের জঙ্গলে সিংহ চিতা হাতি দেখা। চাইলে ঃ ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত ৯/৩

১০ দিনে ইউরোপের ৪টি দেশ
সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স ও লন্ডন
২২/৪,২০/৫,২৪/৬,১৬/৯,২১/১০

১০ দিনে পিরামিডের মিশর
৪ দিনে নীল নদে বিহার, লাক্সার কারনাক এডফু ফিলের মন্দির, সাক্কারার স্টেপ পিরামিড, ভূমধ্যসাগরে আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রোর মধ্যযুগীয় বাজার। ২১/২,১৮/৩,১২,২১/১০,১৬/১১,২৩/১২

১০ দিনে থাই-সিঙ্গাপুর-মালয়
ব্যাঙ্কক, পাটায়া, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, জেনটিং, পুত্রাযায়া
১৯/৩,১৬/৪,১৯,২১/৫

৯ দিনে প্রাচীন সভ্যতার চীন
কুনমিং, বেজিং, জিয়ান, সাংহাই, সবাও-এ সারাদিন চাইনে হাকা, ম্যাকাও ও সেনজেন ২৩/৩,২৩/৪,১৯,২৩,২৩/৫,১৫/৬,২৩/৭,১৪/৮,২২/৯

৬ দিনে কেনিয়ার জঙ্গল
নাইরোবি, ট্রীটপ, লেক নাকরু, মাসাই ও আম্বোসেলী (মুম্বাই থেকে) প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পবিার

৫ দিনে ব্যাঙ্কক পাটায়া
প্রতি মাসে

৯৮৩০৬০২৬৮৬, ৯৮৩০০৭৩৩৮৩, ৯৬৭৪৫০০৭৬২
৯৮৩০০৩৬৩৩০, ২২১৭১৪৬০,
২৮৬৫৯৫৫৫, ৪০৬৭০২০৯

IATA

ধ্রুব মজুমদার

বাবু শরৎচন্দ্র দাশের কাঞ্চনজঙ্ঘার ডায়েরি

শরৎচন্দ্র দাশ সম্পর্কে দু-কথা

হিমালয় সম্পর্কে যাদের কিছুমাত্র কৌতূহল আছে 'পণ্ডিত এক্সপ্লোরার' বাবু শরৎচন্দ্র দাশ, ওরফে চন্দ্র দাশ, তাদের কাছে মোটেই অপরিচিত নন। সকলেরই মোটামুটি জানা আছে যে, গত শতাব্দীর শেষের দিকে ওই বঙ্গসন্তান, ব্রিটিশদের চর হয়ে, লামা তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে, প্রভুত পথক্লেশ অতিক্রম করে, প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে বারংবার প্রাণ সংশয় করে, অবশেষে লাসা পৌঁছন এবং নানা রকম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে আবার ভারতে ফিরে আসেন। প্রধানত এই চন্দ্র দাশের তথ্যের ভিত্তিতেই ১৯০৪ সালে ক্যাপ্টেন (স্যার) ফ্রান্সিস ইয়ং হাজবেন্ডের সফল ও রক্তাক্ত 'লাসা-অভিযান' সংগঠন করা হয়েছিল।

রায়সাহেব বাবু শরৎচন্দ্র দাশ সম্পর্কে এর বেশি আর কিছু জানাও ছিল না, জানার কৌতূহলও ছিল না। এর একটা কারণ অবশ্যই আমাদের উগ্র জাতীয়তাবোধ— ব্রিটিশ প্রভুদের তুষ্টির জন্য নেটিভ কর্মচারীদের সবরকম ক্রিয়াকলাপকেই আমরা সন্দেহের, এমনকি ঘৃণার চোখে দেখতাম। বাবু চন্দ্র দাশ সম্পর্কে আরও কিছু খোঁজখবর সংগ্রহ করে তাঁকে নিজেদের হিমালয় অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত করে নেবার কথা তাই কখনও মাথায়ই আসেনি।

চটকা ভাঙল সম্প্রতি ডগলাস ডবলিউ ফ্রেশফিল্ডের লেখা 'রাউন্ড কাঞ্চনজঙ্ঘা' বইটি পড়ে। এটিও একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, তবে নেপাল থেকে কিছুদিন আগে এর একটি নতুন সংস্করণ হয়েছে। ফ্রেশফিল্ড কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রদক্ষিণ করেন ১৮৯৯ সালে, বাবু চন্দ্র দাশের পরিক্রমার ২০ বছর পরে। এজন্য তিনি সুইজারল্যান্ড থেকে দুজন পেশাদার গাইড এবং ইটালি থেকে একজন পেশাদার ফটোগ্রাফারকে বিস্তর খরচাপাতি করে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। প্রধানত বাবু চন্দ্র দাশের সংগ্রহ করা তথ্য বিশ্লেষণ করে সার্ভে অব ইন্ডিয়ার যে মানচিত্র তৈরি হয়েছিল সেটি অনুসরণ করেই ফ্রেশফিল্ড ওঁর পরিক্রমা সম্পূর্ণ করেন, তবে বিপরীত দিক থেকে। চন্দ্র দাশ যাত্রা শুরু করেছিলেন পশ্চিম সিকিমের জোংরি থেকে— তারপর কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতপুঞ্জের দক্ষিণ দিকটা ঘুরে ১৬,৩৭৩ ফুট উঁচু কাং-লা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে নিষিদ্ধ নেপাল— তারপরে কাঞ্চনজঙ্ঘার পশ্চিম দিক ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে ২০,২০০ ফুট উঁচু জনসং-লা ডিঙিয়ে জেসু হিমবাহ। ফ্রেশফিল্ডের পথ ছিল জেসু-জরসংলা-কাংলা-জোংরি। ফ্রেশফিল্ড ওঁর বইয়ে বারংবার বাবু চন্দ্র দাশের দেখার ও বর্ণনা করার ক্ষমতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন— এমনকি গ্রন্থের পরিশিষ্টে দাশের দিনলিপির প্রাসঙ্গিক অংশটা সবিস্তারে পুনর্মুদ্রণ করে দিয়েছেন। চন্দ্র দাশের এই দিনলিপি এক কথায়, হিমালয় অভিজ্ঞতার এক দুর্লভ রত্নভান্ডার।

এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে, দুর্গম হিমালয় যাত্রার বিশদ বিবরণ, স্বামী রামানন্দ ভারতীর আগে অন্য কোনও বাঙালি তেমন বিস্তারিত কিছু লেখেননি। তুলনা করার কোন প্রশ্নই নেই, তবে বাবু শরৎচন্দ্র দাশ কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রদক্ষিণ (১৮৭৬) করেছিলেন স্বামী রামানন্দ ভারতীর কৈলাস পরিক্রমার (১৮৯৮) উনিশ বছর আগে। সত্য বটে, বাবু চন্দ্র দাশের দিনলিপি ইংরিজি ভাষায় লেখা, কিন্তু তাতে বড় একটা কিছু এসে যায় না। এই দিনলিপি পড়তে পড়তে নিজেদের নবতর অভিজ্ঞতাগুলোর সঙ্গে সবকিছু এমনভাবে মিশে যায় যে তখন আর লেখকের জাতি পরিচয় নিয়ে এতটুকুও সংশয় থাকে না, শতাধিক বছরের ব্যবধানটা কোনও ব্যাপারই নয়।

ফ্রেশফিল্ডও অকপটে স্বীকার করেছেন যে, এস-সি-ডির এই দিনলিপির পৃষ্ঠাগুলি খুবই 'গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক'। নিছক ভৌগোলিক বা সামরিক গুরুত্বই নয়— স্থানীয় মানুষদের চোখ ও অনুভব দিয়ে এই ভয়ঙ্কর সুন্দরকে দেখে তা এমন সহজভাবে প্রকাশ করা— 'বাবু'-কে অভিনন্দন জানাতেই হবে। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে। পর্বতের বিশালতা, পর্বতের দুঃখকষ্ট ও আনন্দ এই সবকিছু একজন শিক্ষিত এশিয়াবাসীর মনে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বা প্রভাববিস্তার করে, বাবু চন্দ্র দাশের দিনলিপি থেকে তা বেশ আঁচ করা যায়।

বাবু শরৎচন্দ্র দাশ সম্পর্কে কিন্তু ফ্রেশফিল্ডের বইতে বিশদ করে কোনও তথ্য দেওয়া নেই। ১৮৭৪ সালে এস-সি-ডি যখন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র, সেই সময় লেঃ গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের বিশেষ আদেশবলে তাঁকে দার্জিলিংয়ের টিবেটান বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এখানে তিনি প্রথমে তিব্বতি ভাষা শিক্ষা করেন এবং তারপরে লামাতন্ত্রের ক্রিয়ানুষ্ঠান অধিগত করার জন্য স্বাধীন সিকিমের দুরধিগম্য বিভিন্ন গোম্ফা পরিভ্রমণ করেন। সিকিমের রাজার সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য হল।

এরই মধ্যে ভারত সরকারের সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সঙ্গেও বাবু শরৎচন্দ্র দাশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে— কবে, কোথায় এবং কেমন করে, সেটা বাবুর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তিব্বতে ও নেপালে সেই সময় বিদেশিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ব্রিটিশরা তাই ভারতীয়দের মধ্য থেকেই কয়েকজনকে বাছাই করে নিয়ে জরিপের কাজ করতে তিব্বতে পাঠায়। এদের অভিধা হয়— পণ্ডিত এক্সপ্লোরার্স। এই পণ্ডিত এক্সপ্লোরারদের সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতেই সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ওই এলাকার প্রথম মানচিত্রগুলি গ্রথিত হয়েছিল। কুমায়ুনের জোহর উপত্যকার রাওয়াত গোষ্ঠীর নয়ন সিং-কিষন সিং-কল্যাণ সিং প্রমুখরা, কখনও ব্যবসায়ী আর কখনও লামার ছদ্মবেশে, এই তথ্য সংগ্রহের জন্য যেসব কাণ্ডকারখানা করেছেন তা এককথায় অচিন্তনীয়। খ্যাতনামা পণ্ডিত এক্সপ্লোরারদের মধ্যে বাবু শরৎচন্দ্র দাশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ তিনি পাহাড়ী লোক ছিলেন না। তিনি কলকাতার ছেলে, একজন কৃতী ছাত্র এবং শতকরা একশভাগ বাঙালি। সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে এই বঙ্গসন্তানের কেমন করে যোগাযোগ হয়েছিল সেটা কোনও ব্যাপার নয়— উভয়েরই উভয়কে প্রয়োজন ছিল এবং এসবক্ষেত্রে আপনা থেকেই যোগাযোগ হয়ে যায়।

সেই আমলে কোনও পর্বত বা নদীর ভৌগোলিক অবস্থান নিরূপণ করা হত আকাশের তারার সঙ্গে হিসেব মিলিয়ে, উচ্চতা নির্ধারণ হত জল গরম করে, দূরত্বের পরিমাপ হত মালা-জপের স্থলে পদক্ষেপের হিসাব রেখে, আর রাত পোহাবার আগেই পুজোর স্থলে দিনের সবকিছু গুছিয়ে লিপিবদ্ধ করে তা প্রার্থনাচক্রের ভিতরে লুকিয়ে ফেলতে হত। এখন আর অত ঝামেলা নেই, মহাকাশ থেকেই এখন গ্রাফ কাগজের উপরে সবকিছুর আলোকচিত্র একেবারে ছাপা হয়ে এসে যায়। এখন আর পণ্ডিত এক্সপ্লোরারদের কোনও সক্রিয় ভূমিকা নেই, ওদের তথ্যাবলীও সংশোধিত হতে হতে অতীতের বস্তু হয়ে গিয়েছে। এই মহাকাশ আক্রমণের পরেও কিন্তু ওঁদের সবকিছু একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। — বাবু শরৎচন্দ্র দাশের এই দিনলিপি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

ইয়ং হাজবেন্ড থেকে কেনেথ সেসন অথবা ফ্রেশফিল্ড থেকে ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ— সকলেই একবাক্যে বলেছেন যে, বাবু চন্দ্র দাশের মতো পণ্ডিত এক্সপ্লোরাররা শুধুই টাকার জন্য বা ব্রিটিশ প্রভুদের খুশি করার জন্য এইসব দুর্জয় যাত্রায় এইসব কষ্ট স্বীকার করেছেন তা হতেই পারে না। গূঢ়তর কোনও তাড়না বা আকর্ষণ না থাকলে এমনটা কখনওই হয়ে উঠত না। এরপরে এই দিনলিপির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আর কিছু বলতে যাওয়া মূঢ়তা হবে।

২১ বছর আগের ভ্রমণ থেকে

জোংরি থেকে যাত্রা শুরু। যাত্রাসঙ্গী— লামা উগিয়েন গিয়াৎসো, একজন পথপ্রদর্শক ও দুজন কুলি বা মালবাহক। সঙ্গে আছে— একটি পকেট সেক্সট্যান্ট, একটি প্রিসম্যাটিক কম্পাস, দুটো হাইপসোমিটার, একটি থার্মোমিটার, একটি ফিল্ড গ্লাস এবং নগদ ১৫০ টাকা।

১৭ জুন, ১৮৭৯। জোংরির পথে রওনা হতে সকাল আটটা হয়ে গেল। বাখিম থেকে জোংরি এক পড়াও। বেলা ১০টা নাগাদ আমরা এমন এক জায়গায় পৌঁছলাম যেখানকার গাছপালা সবই ভিন্ন জাতের। হঠাৎ যেন গাছপালার চেহারা বিলকুল পাল্টে গেল— পথের গোড়ার দিকটায় ওক আর চেস্টনাট গাছের মহারণ্য, আর এখন শুধুই বট গাছ আর জুনিপারের ঝোপ আর রডোডেনড্রনের জঙ্গল। এখানে জোঁকেরও কোনও উপদ্রব নেই। ৯,০০০ ফুট-১২,০০০ ফুট পর্যন্ত এই পর্বতাঞ্চলের স্থানীয় বাস— বসান লাপচা। প্রকৃতির এমন সৌন্দর্য, এক কথায় যাকে বলে অপূর্ব। প্রধানত রডোডেনড্রন ফুলের বাহারেই এমনটা হয়েছে। লাল ও গোলাপি ফুলেরই একাধিপত্য, এ ছাড়া অন্যান্য বর্ণের ফুলও রয়েছে। মন দিয়ে কখনও উদ্ভিদবিদ্যা পড়া হয়নি বলে দারুণ অনুতাপ হচ্ছিল।

এই বাখিম থেকে জোংরি যাওয়ার সময় মাঝপথে ডাঃ ইংলিস-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। বয়ঃপ্রবীণ ডাঃ ইংলিস দার্জিলিং থেকে জোংরি বেড়াতে এসেছিলেন। কুলিদের দুর্ব্যবহারে ও পথপ্রদর্শকের অবিমৃষ্যকারিতায় ভদ্রলোকের তখন খুবই করুণ অবস্থা। খাবার-দাবার সব ফুরিয়ে গিয়েছে, তুষাররাজ্যে পৌঁছবার আগেই তাই নিঃস্ব অবস্থায় আবার দার্জিলিংয়ে ফিরে যাচ্ছেন। ডাঃ ইংলিস বললেন, ইংল্যান্ড থেকে নিজের জমিদারি বুঝে নেওয়ার জন্য নিউজিল্যান্ড যাওয়ার পথে তাঁর হিমালয়কে কাছে থেকে দেখার সাধ হয়। খুবই দুঃখের কথা যে ডাঃ ইংলিস-য়ের তখন যেসব সাহায্যের প্রয়োজন ছিল আমার তা দেওয়ার সাধ্য ছিল না। তবু নিজের ক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী আমি তাঁকে যথাসম্ভব সাহায্য করেছি।

জোংরিতে বেলা পাঁচটার সময় পৌঁছে আমরা এক পশুপালকের ঘরে আশ্রয় নিলাম। এখানে জল ফোটাতে ১৮৭ ডিগ্রি উত্তাপের প্রয়োজন হল, তার কারণ এখানকার উচ্চতা ১৩,৭০০ ফুট। দিনের তাপমাত্রা ছাড়ায় ৪৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট। জোংরির অনুপম সৌন্দর্যে একেবারে হতবাক হয়ে যেতে হয়। ওখানে পাহাড়-পর্বত সবই খুব সুবিন্যস্ত ও পরিচ্ছন্ন, চারদিকে থোকা-থোকা ফুল ফুটে রয়েছে আর নানাবর্ণের বেটেখাটো ঝোপঝাড়— দূরে ও নিকটে কয়েকটি ইয়াক (চমরী গাই) চরে বেড়াচ্ছে। গাছপালা সব পত্রে-পুষ্পে পূর্ণাবয়ব হয়ে রয়েছে, উপত্যকার তলার দিকটায় শুধুই রডোডেনড্রন আর অন্যসব ফুলের সমারোহ।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যাস্তের সোনালিতে অদূরের তুষারশীর্ষগুলি এবং সমগ্র পর্বতপ্রদেশ স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠল। হিন্দু কবিরা ক্বচিৎ কখনও দেখে এবং অধিকাংশ সময়েই না দেখে হিমালয়ের এই রূপ বর্ণনা করার বৃথা চেষ্টা করেছেন। শুধু ভাষা দিয়ে হিমালয়ের এই সৌন্দর্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমার ডান দিকে কাবুর (কাব্রু) তার তুষারশীর্ষ উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে সুমহান কাং-চান (কাঞ্চনজঙ্ঘা) দূর আকাশ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বামদিকে কাং-লা পর্বতের ভয়াবহ তুষারঢাল ঝকঝক করছে। আর আমার পিছন দিকে রাথোং নদী মহা কলরব তুলে দক্ষিণদেশে বয়ে চলেছে। জোংরিতে আমরা একদিন বিশ্রাম নিই।

১৯ জুন, ১৮৭৯। জোংরি থেকে রওনা হতে বেলা দশটা গড়িয়ে গেল। সকাল থেকেই চারদিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে। সূর্যেরও দেখা নেই। লামা কিন্তু তার মধ্যেই রাস্তা জরীপের কাজ করে চলেছে। আমিও পর পর দুই রাত 'সেক্সস্ট্যান্ট' যন্ত্র নিয়ে জোংরি ও তার নিকটবর্তী পর্বতশিখরগুলির ভৌগোলিক অবস্থান নিরূপণ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তা সফল হয়নি, ঘন কুয়াশায় আকাশের একটি তারাও দেখতে পাইনি। আর এই জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সূর্য এতই উপরে উঠে গিয়েছে যে সেদিক থেকেও এব্যাপারে কোনই সুবিধা হয়নি।

বেলা একটার সময় একটি কাঠের সাঁকো দিয়ে রাথোং নদী অতিক্রম করে, অজস্র রডোডেনড্রন ঝাড়ের মধ্য দিয়ে আমরা পশ্চিমে নেপাল সীমান্তের দিকে এগোতে থাকলাম। বেলা তিনটে নাগাদ আমরা ইয়ামপুং ও কাং-লা, এই দুই রাস্তার মোড়ে পৌঁছলাম। এখান থেকে একটি রাস্তা টংলু পর্বতমালা ধরে সিংলা, ফেলুট ও সাম-দাব-ফুক (সান্দাকফু) চলে গিয়েছে। আমরা চুরুং নদীর গতিপথ ধরে এগিয়ে চললাম, এই চুরুং নদীর জন্ম কংকর-টেং কোকথাং পর্বতে। আমাদের পথ-প্রদর্শক পালজোর পাথর ছুড়ে এখানে একটি লাল রঙের বুনো পাখি শিকার করে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তার সাথীটিকে ঘায়েল করতে পারেনি।

এর মধ্যেই হঠাৎ প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। বেলা তিনটের কিছু পরে আমরা টেগিয়াব-লা নামে একটি গিরিপথে পৌঁছলাম। এর উচ্চতা ১৪,৮০০ ফুট। এখানে একটি সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের তলায় একটা গুহার মধ্যে আমরা আশ্রয় নিই। তিনজন তিব্বতি মানুষও সেদিন ওই গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। এই তিব্বতিদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে সিংহবীর নামে নেপালের সীমান্তরক্ষী বাহিনী সম্প্রতি এই গিরিপথটি বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু উচ্চতা ও নিষ্ঠুর আবহাওয়ার জন্য রণে ভঙ্গ দিয়ে ফিরে গিয়েছে। গিরিপর্বতটি উন্মুক্ত রয়েছে, এটা একটা দারুণ খবর। এখানে হাওয়া খুবই ঠান্ডা এবং সন্ধ্যার আগে থেকেই তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। গাছপালা বলতে এখানে কিছুই নেই— পাথরের আড়ালে এখানে সেখানে কিছু ঘাস গজাতে শুরু করেছে, আর স্পঞ্জের মতো সবুজ এবং ছাই রঙের টুকরো টুকরো ছত্রাক। হাড়-জমানো ঠান্ডা হাওয়া আর সেই সঙ্গে বরফের প্রবল ঝাপ্টা — সারাটা রাত নিতান্ত অসুবিধার মধ্যে জেগে কাটাতে হল।

২০ জুন, ১৮৭৯। আজ খুব সকালেই আমরা পথে বেরিয়ে পড়ি। আবহাওয়া মোটামুটি শান্ত ও স্নিগ্ধ। আজ আমরা যে উপত্যকা ধরে চলেছি, শীতের বরফ সরে যাওয়ার সঙ্গেই সেখানে নতুন ঘাস গজাতে শুরু করেছে। এই পশুচারণভূমির দুই দিকেই তুষার পর্বতমালা। দুপুর নাগাদ আমরা চু-কারপাং জং নামে একটা জায়গায় পৌঁছলাম, রায়োং নদীর প্রধান জলধারাটি এখান থেকে নির্গত হয়েছে। উদ্ভিদের কোনও চিহ্নই নেই— ছোট বড় নানা আকারের পাথর ছড়ানো সুদীর্ঘ একটা মোরেন বা গ্রাবরেখা, হিমালয়ে এমন সুদীর্ঘ মোরেন আর আছে কিনা আমার জানা নেই। এই প্রস্তরস্তূপের মধ্য দিয়ে আমরা আধ মাইলটাক আরোহণ করলাম। পথে এক জায়গায় একটি প্রস্তরখণ্ডের তলায় দু-তিনটি মার্মোট বা কাঠবিড়াল শ্রেণীর ইঁদুর দেখতে পেলাম। চেষ্টা করেও সেগুলোকে ধরা গেল না। এই পাথর ও বরফের রাজ্যে ওরা কী খেয়ে বেঁচে থাকে তা ওরাই জানে।

আমরা এরপর কাং-লা পর্বতের কাছে উপস্থিত হলাম। সূর্য ততক্ষণে দারুণ তেতে উঠেছে। বরফের ওপর সূর্যের আলো পড়ে চোখ ঝলসে যাবার দশা হল। একটু কুয়াশা থাকলে এই দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। আমি আর লামা নীল চশমা পরে নিলাম। কুলিরা ওদের চোখের নিচে কালো রং মেখে নিল। আমি এতক্ষণ পশমের কোট পরে হাঁটছিলাম, এবারে সেটি খুলে একজন কুলির কাছে দিলাম।

সকলের আগে আমাদের পথপদর্শক পালজোর, তার পিছনে আমি। পালজোর মাঝে-মাঝে আমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছিল— চারদিকে তুষার-ফাটল, একবার পা ফস্কালেই

তার মধ্যে তলিয়ে যেতে হবে। আমাদের ডাইনে এবং বামে একশ গজের মধ্যেই বিকট আওয়াজ করে একের পর এক তুষারধ্বস নেমে আসছিল। সেদিকে সতর্ক নজর রেখে আমরা খুব সাবধানে এগোতে থাকলাম। এইভাবে তুষারক্ষেত্র ধরে এক মাইলের উপর আরোহণ করার পর আবার শক্তভূমি পাওয়া গেল। এখানে একটি পাথরের স্তূপের উপর কয়েকটি ধর্মীয় পতাকা উড়তে দেখা গেল। পালজোর বলল, এটাই নেপাল ও সিকিমের সীমান্তরেখা। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা আবার পথ চলতে শুরু করলাম।

এরপরেই আবার প্রায় এক মাইল দীর্ঘ একটা তুষারক্ষেত্র সামনে পড়ল। তবে এটি আগেরটির মতো অতটা মসৃণ ও খাড়া নয়। কিছুদূর পর্যন্ত মোটামুটি সহজ উৎরাই পথ, কিন্তু তারপরেই পর্বতগাত্র খুব বন্ধুর ও বিপজ্জনক। একটা সবুজ নালা ধরে বিপুল পরিমাণ জল ও বরফ হুড়হুড় করে বয়ে চলেছে— এখানেই ইয়ামগা-ছু নদীর জন্ম। পালজোর বলল, এই নদীটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। হঠাৎ এর জল বেড়ে যায় এবং নীচের দিকের সেতুগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মাঝে মাঝে যাত্রীরাও মারা যায়। মনে হয়, হঠাৎ প্রচুর পরিমাণ বরফ গলে যাওয়ার ফলেই এমন বিপর্যয় ঘটে। নেপালি ও ভুটিয়ারা এই নদীটিকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে ও এর পূজা করে।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই তেগিয়ার-লা গিরিবর্ত্ম থেকেই কাং-লা গিরিশাখাটি উত্তরদিকে কাংচন গিরিশীর্ষগুলির দিকে উঠে গিয়েছে। পূর্ব-নেপালের তাম্বুর, কোশী এবং তাদের শাখানদীগুলি এই তুষারাবৃত গিরিশাখার পশ্চিম দিক থেকে বয়ে গিয়েছে। আর পূর্বদিকে রাথোং, কুল্লাইত, রামাম প্রভৃতি নদী সিকিমের মধ্য দিয়ে তিস্তা নদীতে গিয়ে মিশেছে। আরও উত্তরে যে পর্বতমালাটি পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঢলে গিয়েছে— কাংচন এবং এভারেস্ট (গৌরী-শঙ্কর) পর্বতশীর্ষ এই পর্বতমালারই অন্তর্ভুক্ত— কাং-লা গিরিশাখাটি এই পর্বতমালা থেকেই সোজা দক্ষিণ দিকে নেমে এসেছে। পূর্ব-সিকিমের থাংকালা গিরিশাখাটিও এই পর্বতমালা থেকেই ডোংকিয়া হয়ে দক্ষিণ-পূর্বদিকে নেমে গিয়েছে— ঢো-লা, ইয়াক-লা, বায়ুই-লা এবং জেলেপ-লা গিরিবর্ত্ম দিয়ে এটি অতিক্রম করতে হয়। এই গিরিশাখার পূর্বদিকে মাছু নদী এবং চুম্বি উপত্যকা, পশ্চিমদিকে তিস্তা অঞ্চল।

আরও কিছুদূর এগোবার পর একটা ত্রিশ ডিগ্রি খাড়া পাহাড়ের ঢাল। গাইডের হাত ধরে এই গিরিসঙ্কট নিরাপদে অতিক্রম করলাম। কুলিরা কিন্তু পিঠে বোঝা নিয়েই ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে পেরিয়ে এল। পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ওদের একজনের বেশ কেটে ছড়ে গিয়েছিল। ওই ঢালের তলা থেকে যাত্রা শুরু করে ইয়ামগা-ছু নদী শেষপর্যন্ত তাম্বুর নদীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। কাংলার এদিকে শুধুই লাল বালিপাথর। সিকিমের দিকে কিন্তু চুনাপাথর, গ্রানাইট প্রভৃতি নানারকম পাথর দেখা যায়। নদীর জলধারা অনুসরণ করে আরও পাঁচ মাইল এগোবার পর আমরা ফুরপা-কার্পু নামে একটা জায়গায় পৌঁছলাম। এখানে আবার সবুজ উদ্ভিদের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। নদীর

> গিরিবর্ত্মের উপরে উঠে তিব্বতের সুবিস্তৃত মালভূমি দেখা গেল। আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত, উত্তর দিগন্তে এ-প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত নীল পাহাড়ের সারি। গিরিবর্ত্মের উপরে মঙ্গোলদের একটি 'লাপ-চে' ও বৌদ্ধদের একটি 'স্তূপ' রয়েছে, আমি সেই পাথরের ঢিবির পাশে শুয়ে পড়লাম। ঢিবির গায়ে অজস্র ধর্মীয় পতাকা লাগানো রয়েছে, আমাদের বন্ধু উগিয়েন গিয়াৎসো সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি পতাকা লাগিয়ে দিল।

ধারে মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাথরের দেওয়াল রয়েছে। যাত্রী ও ইয়াকের পাল এসব জায়গায় আশ্রয় নেয়। ফুরপা-কার্পু থেকে আরও অনেকটা নেমে থাবার পর টুংগা-কোংসা। নদীর বাঁ-ধারে পাহাড়ের গা বেয়ে অনেকগুলি বড় বড় ঝর্না নেমে এসেছে। এখানে ছাড়াছাড়া ভাবে রডোডেনড্রন ও অন্যান্য গাছের ঝাড় রয়েছে। ইয়ামগা-মাল বলে একটা জায়গায় আমরা সে রাতে আশ্রয় নিই। এখানে অনেক বড় বড় দেওদার গাছ রয়েছে, তাছাড়া রডোডেনড্রন, জুনিপার, বার্চ প্রভৃতি তো আছেই। এখানটায় রাস্তা মোটেই দুর্গম নয়। কিন্তু আমরা খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করছিলাম। গুহায় আশ্রয় নেবার পরেই উগিয়েন গিয়াৎসোর পিত্তজ্বর হল। পালজোর খানিকটা ভাত রান্না করল এবং মাখন দিয়ে চা তৈরি করল— সারাদিনের ক্লান্তিকর পথশ্রমের পর আমরা কিছুটা সুস্থ বোধ করলাম। পরদিন সকালেও লামার জ্বর ছাড়েনি। আমি ওকে বমন বন্ধ করার ওষুধ দিই, তাতে ওর কিছুটা আরাম হয়। আমরা সেদিন ওখানেই থেকে যাই।

২২ জুন, ১৮৭৯। আজ সূর্যোদয়ের আগেই আমাদের যাত্রা শুরু হয়। উত্তর-পূর্ব বরাবর অগ্রসর হয়ে প্রথমে ইয়ালুং নদী অতিক্রম করতে হয়। নদীটি পরে ইয়াংমা নদীর সঙ্গে মিশেছে। বাংচন পর্বতমালার দক্ষিণ দিকের সব বরফ গলা জল এই ইয়ালুং নদী দিয়ে বয়ে যায়। ত্রিশ ফুট লম্বা ও ছয় ফুট চওড়া একটি কাঠের সেতু দিয়ে নদীটি অতিক্রম করে তারপর শুরু হল শোচুং বা চুনদার্মা গিরিবর্ত্মের চড়াই। এর প্রথম ২,৫০০ ফুট অত্যন্ত খাড়া এবং কষ্টকর। গিরিবর্ত্মের উপরে পৌঁছতে বেলা দুপুর হল। এখানে দুটি ছোট জলাশয় আছে, বড় জলাশয়টির পরিধি প্রায় পাঁচশ ফুট। ইয়ালুং নদী থেকে ইয়ামা-মারা-ছু নদী পর্যন্ত মোট চারটি গিরিশাখা বা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করতে হয়। এগুলো হল— মিরকেন-লা, পাঙ্গো-লা, সেনেন-লা এবং টামা-লা। এরমধ্যে মিরকেন-লা আর পাঙ্গো-লা সবচাইতে খাড়া এবং উঁচু। এদের উচ্চতা ১২,০০০ ফুট থেকে ১৪,০০০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। এখানে জল ফুটিয়ে উচ্চতা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি, গাছ-গাছড়া দেখে তা অনুমান করা হয়েছে। এই গিরিবর্ত্মগুলি অতিক্রম করে অবশেষে বিকাল ছয়টার সময় আমরা কাম্বাচেন-জুনমারং গ্রামে পৌঁছলাম। গ্রামটির উচ্চতা ৯,৫০০ ফুট (স্যার জোসেফ হুকার-এর মতে, ১১,৩৮০ ফুট)।

কাম্বাচেন গ্রামটি অতি মনোরম। প্রাণোচ্ছল উপত্যকার মাঝখান দিয়ে সুন্দর একটি পাহাড়ী স্রোতস্বিনী বয়ে চলেছে। তিনদিকে ঘন অরণ্যাবৃত খাড়া পাহাড়। রডোডেনড্রন, জুনিপার, দেওদার, ব্রুন্দসী উইলো প্রভৃতি নানারকমের গাছপালা। আমাদের পথপ্রদর্শক পালজোর আমাকে একজন লামা হিসাবে এক ধনী শেরপার (নেপালি ভুটিয়া) সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। মাথায় লামাদের মতো টুপি, পরনে তদনুরূপ পোশাক এবং বিশেষ করে আমার আর্যোচিত মুখাবয়ব দেখে স্থানীয় লোকেরা আমাকে একজন পাবু (নেপালি) লামা বলে ধরে নিল এবং জাতি-পরিচয় জিজ্ঞাসা না করে যথোচিত সম্মানের সঙ্গে আপ্যায়িত করল। ওই ধনী শেরপা আমাদের সবাইকে ওঁর বাড়িতে

নিয়ে গেলেন এবং ইয়াকের লোম দিয়ে বোনা একটি মূল্যবান কার্পেটের উপর আমাকে বসতে দেওয়া হল। স্থানীয় লোকদের বুঝতে পেরে গিলাংসো গোড়া থেকেই আমাকে 'পাবু লামা' বলে সম্বোধন করছিল।

২৩ জুন, ১৮৭৯। আজ সকালে আমরা কাংচন (বা কাম্বাচন) নদীর ডান ধারে টাশিচোডিং গোম্ফা দেখতে গিয়েছিলাম। গোম্ফায় ৮০ জন লামা ও ১২ জন সন্ন্যাসিনী আছে, সন্ন্যাসিনীরা অবশ্য মঠের বাইরে গ্রামে রাত কাটায়। সিকিম ও পূর্ব নেপালের মধ্যে এটিই সবচাইতে সুন্দর ও সবচাইতে সমৃদ্ধ গোম্ফা। বৌদ্ধ লামাতন্ত্রের কা-গ্যুর ও টান-গ্যুর গ্রন্থদুটির সবকয়টি খন্ড এখানে সংগ্রহ করা আছে। এখানকার লামারা সাধারণ মানুষের মতোই লম্বা চুল রাখে এবং পুরনো দিনের ভারতীয় বৌদ্ধদের অনুরূপ কানে লম্বা দুল পরে। এটি নিংমা-পা বা লাল টুপি গোষ্ঠীর মঠ। সিকিমে যিনি বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করেন, সেই বিখ্যাত বৌদ্ধ লামা লাছেন-কেম্পো এই পথ দিয়েই সিকিমে প্রবেশ করেছিলেন এবং তিনিই এই গুনসার মঠের প্রতিষ্ঠাতা। সিকিমের পেমিওংচি গোম্ফাটি এই একই গোষ্ঠীর এবং এদের ধর্মীয় আচার-আচরণও একই রকম। গুনসার-এর প্রধান লামা গতবছর পেমিওংচি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। সম্ভবত তারই প্রতিদান হিসাবে আমাদেরও এখানে প্রচুর সমারোহের সঙ্গে আপ্যায়ন করা হয়। উগিয়েন গিয়াৎসো ও আমি এখানে একটি করে টাকা দক্ষিণা দিই।

সন্ধ্যাবেলা প্রধান লামার বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে প্রচুর পরিমাণ আলুসেদ্ধ, মাখন-চা ও মারওয়া (হালকা মদ) খেতে দেওয়া হয়। বহুদিন পরে আলু ও গাজর সিদ্ধ খেয়ে সকলেই খুব তৃপ্তি লাভ করি। ভগবান বুদ্ধের প্রতি অনুগত থাকার জন্য তিনি আমাদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দেন। প্রধান লামার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে উগিয়েন গিয়াৎসো বলল, এদেশ আমাদের কাছে একেবারেই নতুন। এখানকার লোকজন, পথঘাট সবই আমাদের অজানা। আপনার অনুগ্রহ পেলে আমরা নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে যাত্রা সম্পূর্ণ করতে পারব। প্রধান লামা তাঁর সাধ্যমতো সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমি ওঁর সঙ্গে তিব্বতি ও নেপালি ভাষায় কথা বলছিলাম। সেজন্য ইনিও আমাকে একজন পাবু লামা বলে ধরে নিয়েছিলেন। আমিও বলা বাহুল্য গায়ে পড়ে ওঁর ভুল শুধরে দিইনি। আমাকে যে যাই মনে করুন, আমি নির্বিকার থাকব।

২৪ জুন, ১৮৭৯। পরদিন সকালবেলা গ্রামবাসীরা সবাই মিলে আমাদের জন্য এক বিশাল ভোজের আয়োজন করে। ভেড়ার মাংস আর আলুসেদ্ধ স্তূপীকৃত করে আমাদের সামনে রাখা হয়, তার সঙ্গে অবশ্যই যাত্রীদের সেই অতি প্রিয় বস্তু মারওয়া— বড় বড় জালায় ভর্তি করে, অঢেল। আমাদের গোল হয়ে বসার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রত্যেকের সামনেই একটি করে জলচৌকি রেখে তার উপরে একটি করে বাঁশের বোতল, কানায়-কানায় মারওয়া। মাঝখানেও বিশাল এক জ্বালা মারওয়া। একটি দুই ফুট লম্বা সরু বাঁশের নল দিয়ে এই

> সন্ধ্যার পর আবার আমাদের যাত্রা শুরু হল। কাম্বাজং থেকে যে রাস্তাটা টেংরিজংয়ের দিকে চলে গিয়েছে, এবারে আমরা সেই রাস্তা লক্ষ করে এগোতে শুরু করলাম। আমরা কোন রাস্তা দিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করেছি সেটা গোপন করার জন্য প্রচলিত সংক্ষিপ্ত রাস্তাটি ছেড়ে আমরা ঘুরপথে অগ্রসর হলাম। এখানে ধরা পড়লে বন্দী করে সোজা কাম্বাজং দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ক্লান্তিহরা পানীয় মারওয়া একটু একটু করে টেনে টেনে খেতে হয়। একটা পুরু চীনদেশীয় কম্বলের উপরে হাঁটু মুড়ে আমি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির মতোই আসন গ্রহণ করেছিলাম। নানারকম বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল। আমি এমনিতে কোনও কথাই বলতাম না, নিতান্ত নাছোড়বান্দা হলে খুব সংক্ষেপে জবাব দিতাম। তবে সৌজন্য প্রকাশের জন্য আমাকে বহুবার 'লা-লা-সো খুশ-জে-ছে' (মহাশয় অত্যন্ত মহানুভব, অত্যন্ত দয়াময়) এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে হত। গ্রামবাসীরা, ওদের

ছিৎকুল

ভারতের শেষপ্রান্তে তিব্বত সীমান্তে হিমালয়ের কোলে তাঁবু (TENT)-তে বসপানদীর তীরে যাযাবর ক্যাম্প রিসর্ট-এ রাত্রিযাপন করুন।

দেবভূমি-র

নিজস্ব হোটেল

সারাহান: হোটেল সাগরিকা
কেলং: হোটেল ডেকিট
সাংলা: দেবী রিজেন্সি, হোটেল রবি, সিডার এন্ড স্নো ভিউ, মেহাক রিসর্ট
কম্পা: হোটেল শিবালিক, হোটেল পার্বতী, মোনাল রেসিডেন্সি, চিনি বাংলো, হোটেল হোয়াইট নেস্ট, নিউ শিবালিক রিসর্ট
টাবো: হোটেল টাইগার ডেন, হোটেল সিদ্ধার্থ
কাজা: স্পিতি সরাই, ডেলেক হাউস

কিন্নর, গোয়া, আন্দামান
(যে-কোনও দিন/যে-কোনও সময়)
কিন্নর-কৈলাস (৭ রাত ৮ দিন)
কিন্নর-মানালি (১০ রাত ১১ দিন)
গোয়া (৪ রাত ৫ দিন)
আন্দামান (৭ রাত ৮ দিন)

প্যাকেজ
কাশ্মীর বৈষ্ণোদেবী-29/3, 19/4, 30/4, 17/5, 22/5, 28/5
লে-লাদাখ-7/6, 23/6, 5/7, 14/7, 26/7
কুমায়ুন-17/5/2013

DEB BHUMI
Tour & Travels
Head Off.: 28, B.B. Ganguly Street, Kolkata-12 (W.B.)
9874373380, (033) 4066-0235,09903522455
Himachal : 09816404793, 09418342999
E-MAIL: debbhumitravels@gmail.com
www.debbhumitravels.com

ক্লাসিক ট্যুরিজম

সুকান্ত ভট্টাচার্য পরিচালিত

নৈনিতাল
8, 19/3, 19/4, 17, 24/5, 7/6

সিমলা-মানালী-চন্ডীগড়
8, 19/3, 19/4, 17, 24/5

কাশ্মীর-বৈষ্ণদেবী
8/3, 19/3, 19/4, 15/5, 22/5, 31/5

কিন্নর ভ্যালি
19/4, 17, 24/5, 7/6

গ্যাংটক-পেলিং-29/3

লে-লাদাখ-19/7, 16/8, 14/9

কেদারবদ্রী
18, 26/5, 8/6, 11/10

নেপাল
19/4, 17, 24, 31/5, 7/6

উত্তর ভারত
8, 19/3, 19/4, 17, 24/5, 7/6

ভাইজাগ আরাকু
16/2, 19/3, 19/4

EXCLUSIVE আন্দামান

60, Lenin Sarani, Kolkata
2227 1850, 9830612127

ব্রাঞ্চ অফিস
হলদিয়া - 9433015049
হরিপাল- 9748832964
কোন্নগর- 9051947828

exotictrip
The smooth journey

Exclusive Trip for Sr. Citizen / Female:

Kerala– 20/9, 19/10, 14/12
Arunachal– 2/10, 16/11
Amarnath Ji Yatra– June (4 times)
Andaman– Regular
Malaysia & Singapore– 23/3, 27/4

Speciality

- Exclusive Group Tour for Sr. Citizen/Female
- Hotel/ Resort/ Transport booking
- Forest Safari
- Week end Trip

For reservations & queries:

P-593, Purnadas Road
Kolkata-700 029
Phone: 33 40086520,
+91 9831705970 / 9830447669
E-mail: infor@exotictrip.in
Visit: www.exotictrip.in

২১ বছর আগের ভ্রমণ থেকে

দার্জিলিং, এমনকি সুদূর মাটিগড়া হাট পর্যন্ত ভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা বলল। তিব্বতের দিকে টাশি-লুনপো পর্যন্ত এরা অনেকেই ঘুরে এসেছে।

আলোচনার প্রধান একটি বিষয় ছিল, ব্যবসায়ীরা যাতে সিকিম থেকে এদিকে আসতে না পারে সেজন্য সিংহবীরের জোংরি গিরিবর্ত্ম বন্ধ করে দেওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস। এই ভোজসভার একটা জিনিস আমার কাছে খুব বিস্ময়কর মনে হল— দু-তিন বোতল করে মারওয়া খেয়েও কেউই মাতাল হল না। সবাই একটু জোরে কথা বলছিল, এক সঙ্গে কথা বলছিল, কিন্তু কেউই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে প্রলাপ বকছিল না। বেলা দুটো নাগাদ গ্রামবাসীরা সবাই বিদায় নিল। আমাদের তিনজনের জন্য তখন আলাদা আলাদা থালায় সুপ, মাংস ও ভাত নিয়ে আসা হল। সামান্য একটু গ্রহণ করে আমি খাদ্যের প্রায় সবটাই গাইড ও ভৃত্যদের দিয়ে দিলাম। প্রধান লামার হাতে আমরা প্রত্যেকে একটি করে টাকা দক্ষিণা দিয়ে তারপর নিজেদের আস্তানায় ফিরে আসি।

বেলা সাড়ে তিনটের সময় আবার আমাদের নিমন্ত্রণ করে খাপা নামে এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল। ইনি দেবমূর্তি অঙ্কন করেন। এখানে আমরা কোনও খাদ্যগ্রহণ করিনি। তবে প্রত্যেকেই একটি করে টাকা নজরানা দিয়েছি।

২৫ জুন, ১৮৭৯। আজ সকালে গুবখার গোম্ফার সহকারী অধ্যক্ষ ওমজে লামার বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল, এখানেও এক টাকা করে প্রণামী দিতে হয়। তারপরে এখানেই গ্রামবাসীরা একটি কমিটি গঠন করেন ও আমাদের পরবর্তী যাত্রাপথের জন্য ব্যবস্থাদি করার দায়িত্ব এই কমিটির উপর ন্যস্ত হয়। ফুরচুং নামে গুনসা মঠের এক তরুণ গেলং বা সাধুকে আমাদের গাইড হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এই ব্যক্তিটি গ্রামের মধ্যে সবচাইতে দুঃসাহসী ও শক্তিশালী। গুনসার গ্রামের মাঝখান দিয়ে যে নদীটি বয়ে গিয়েছে তার নাম কাং-চন, কোং-চন জঙ্ঘা পর্বত থেকে নির্গত হয়েছে, তাই ওই নাম। তবে স্থানীয় লোকেরা বলেন, আসলে এটাই তাম্বুর নদী।

সকাল সাতটার সময় আমরা অবশেষে কাং-চন নদীর উজান পথে আমাদের যাত্রা শুরু করলাম। আজকের সকালটি খুব উজ্জ্বল, আর পথটিও বেশ সহজ ও আরামদায়ক। মাঝে মাঝে 'খেমসিং'য়ের ঝোপের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হচ্ছিল। এই 'খেমসিং' হল এক ধরনের লম্বাটে জুনিপার গাছ যার উপরের দিকটা শ্যাওলায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

বেলা দুটো নাগাদ আমরা একটি পাহাড়ের সম্মুখীন হলাম যেটিকে দূর থেকে দেখে বরফের পাহাড় বলে ভ্রম হয়েছিল। আসল ঘটনা: একটি শক্তিশালী ঝর্নার গতিপথ পরিবর্তনের দরুন পাহাড়ের মাথার দিকটা হুমড়ি খেয়ে ভেঙে পড়েছে এবং ভিতর থেকে ধবধবে শাদা রংয়ের পাথর আর বালি বেরিয়ে এসেছে। পাথরের আনাচে কানাচে কয়েকটি বড় বড় আকরিক লোহার পিন্ড দেখতে পেলাম। এই মার্বেল পাথর ও বালিপাথরের পর্বতে আকরিক লোহার পিন্ড কোথা থেকে এল তা কিছুতেই বোধগম্য হল না। পুরনো ঝর্নাধারাটিই সম্ভবত পার্শ্ববর্তী কোনও পাহাড় থেকে এইসব বিজাতীয় জিনিস বহন করে এনেছিল।

এই অঞ্চলে কোনও ফসিল বা জীবাশ্ম পাওয়া যায় কিনা সে সম্পর্কে আমার কৌতূহল ছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে ঠিকমতো তল্লাশ করা হয়নি। সহযাত্রীরা বারংবার আমাকে পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে বেলা চারটের সময় একটা কাঠের পুল দিয়ে নদী পেরিয়ে আমরা কাং-পা-চান গ্রামে পৌঁছলাম (উচ্চতা ১৩,৬০০ ফুট) গ্রামে ঢোকার মুখেই একটি পানি-চাক্কি, জলের সাহায্যে যাঁতা ঘুরিয়ে এখানে গম, যব প্রভৃতি পেষাই করা হয়। আর তারপরেই লম্বা একটি মেনডাং— মানে গ্রামের এপ্রান্ত থেকে সেপ্রান্ত পর্যন্ত লম্বা একটি চৈত্য— নানা বর্ণের পাথরে তিব্বতি মন্ত্র লিখে একের পর এক স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে। এই উপত্যকা ভারী সুন্দর। চারদিকে যবের চাষ হয়েছে। তিন-চার ফুট উঁচু পাথরের দেওয়াল তুলে শস্যক্ষেত্রগুলি সুরক্ষিত করা হয়েছে, কোথাও কোথাও কাঠও ব্যবহার করা হয়েছে। গুনসার ও কাম্বাচেন, দুটি গ্রামেই ঘরবাড়ি সব কাঠ দিয়ে তৈরি। কাঠের তক্তা দিয়ে ছাদ তৈরি হয়েছে, তবে কোনও পেরেক বা দড়ি ব্যবহার করা হয়নি। সবকিছু স্বস্থানে রাখার জন্য গৃহের ওপর বড় বড় পাথর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গৃহাভ্যন্তরটি দিব্যি আরামদায়ক। জানালাগুলি খুবই ছোট ছোট। সেজন্য ঘরের ভিতরটাও বেশ অন্ধকার। তবে এখানকার মানুষজন কাজকর্মের জন্য দিনের বেলাটা বাড়ির বাইরেই থাকে। সেজন্য এটা তেমন কোনও সমস্যা নয়। তাছাড়া ঘরের মাঝখানে সবসময়ই একটা আগুন জ্বলছে।

এখানে আমাদের একটা অত্যন্ত সমারোহপূর্ণ উৎসব দেখার সুযোগ হয়। গুনসার ও কাম্বাচেন গ্রামের লোকেরা প্রতিবছর মাং-চন পর্বতশিখরের উদ্দেশে নানারকম উৎসব অনুষ্ঠান করে থাকে, বহুদিন ধরেই এটা চলে আসছে। এই উপলক্ষে বন্দুক ছোড়া হয়। নানাবিধ খেলাধূলা হয়, তবে সবচাইতে বেশি উৎসাহ তীরন্দাজী নিয়ে। ওরা বলে, চাং-চন গিরিশিখরও নাকি এই খেলা দেখতে

ভালোবাসে। প্রতিটি খেলা নিয়েই গ্রামের যুবকদের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এই ধর্মোৎসবের জন্য আমাদেরও কয়েক জায়গায় চাঁদা দিতে হয়েছিল। অনুষ্ঠানের পুরো দৃশ্যটা দেখলে স্বতই ওলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনের কথা মনে পড়ে যায়— এবং আমরাও উত্তম বৌদ্ধদের মতো নতজানু কাং-চন গিরিশীর্ষ বা ভারতীয় ওলিম্পাসকে প্রণাম করলাম।

বিকেলের দিকে ইয়াংমা থেকে এক বার্তা এসে পৌঁছল। সীমান্ত অফিসার ওয়ালুং গো-পা ওই বার্তায় জানিয়েছেন যে, তিনি ইতিমধ্যেই কাম্বাচেনের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। তিনি এসে পৌঁছনো পর্যন্ত যেন কোনও ব্যবসায়ীকে ইয়াক বা ভেড়ার পাল নিয়ে চাটাং-লা (জনসং-লা) অতিক্রম করে তিব্বতে যেতে না দেওয়া হয়। বার্তায় আরও জানানো হয়েছে যে, তিব্বতে ব্যাপকভাবে পশুরোগ ছড়িয়ে পড়েছে, সেজন্য তিব্বত সরকার কাংলা-চেনমো গিরিবর্ত্মটিও বন্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। আমাদের বন্ধু গুনসার মঠের প্রধান লামা গোপনে আমাদের এই সংবাদটি জানাল এবং পরামর্শ দিল, যাতে অফিসার এসে পৌঁছবার আগেই রাত থাকতে আমরা পথে রওনা হয়ে পড়ি।

২৬ জুন, ১৮৭৯। আজ সূর্যোদয়ের অনেক আগেই পথে বেরিয়ে পড়েছি। তাম্বুর নদীর ডাইনে একটি শাখানদীর বাম ধার দিয়ে সিধে রাস্তা, সামান্য চড়াই। আমাদের ডানদিকে এখন কাং-চন গিরিশীর্ষ, তার গা দিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি। আর বাঁ-দিকেও একটি সমুচ্চ তুষারাবৃত গিরিশাখা, যার তলার দিকে কাং-পা-চান গ্রাম। মাইল তিনেক এগোবার পর পথের অদূরে সুবিশাল এক ঝর্ণা— পাও-হুংরি পর্বতের দক্ষিণ গাত্রের সেই ঝর্ণাটির চাইতেও এটি অনেক বেশি রাজসিক। এর জল খুব পবিত্র বলে বিবেচনা করা হয়, এর নাম খান-ডুম-ছু, যার অর্থ স্বপ্নলোকের নদী। আটজন ভারতীয় সন্ত, তিব্বতে যাঁরা রিগ-জিন-পো নামে খ্যাত এবং বৌদ্ধধর্মের বেদব্যাস টাং-সু-গিয়াপা এই জলধারায় স্নান করেছিলেন— সেজন্যই হিমালয়ের এই অঞ্চলে এই জলধারাটিকে সবচাইতে বেশি পবিত্র মনে করা হয়। ঝর্ণাটি পাহাড়ের গা বেয়ে তিনটি ধাপে নেমে এসেছে। আমরা জলধারাটি যেখানে অতিক্রম করি সেখানে এটি ১৮ ফুট চওড়া, আর উপর থেকে নীচ পর্যন্ত খাড়া নেমে এসেছে অন্তত ১,০০০ ফুট। এই ঝর্ণার কলগর্জনে কানে ক্রমশই তালা লেগেছিল। তারপরে অন্তত দুই ঘণ্টা একেবারে বধির হয়ে গিয়েছিলাম। শ্বাসরুদ্ধকর পর্বতশীর্ষ থেকে এটি নির্গত হয়েছে, পর্বতের এই অসমান গাত্র বেয়ে এটি নেমে এসেছে এবং এর বিশাল দৈর্ঘ্য— সব মিলিয়ে হিমালয়ের এ-এক সুমহান দৃশ্য।

একটার পর একটা মনোরম উপত্যকার মধ্য দিয়ে আজকের পথ মোটামুটি সহজ। চারদিকের আকাশছোঁয়া পর্বতরাজির মাঝখানে এমন মনোরম উপত্যকা, এমন বৈপরীত্য কেবল হিমালয়েই সম্ভব। এখানে গাছপালা কিছুই নেই। চারদিকে পাহাড়ের ঢাল জুড়ে ছোট ছোট ঝোপঝাড়, আর তাতে নানাবর্ণের অজস্র ছোট ছোট ফুল। দুপুরবেলা রামখাং নামে একটা জায়গায় একটা ইয়াকের চালায় বসে আমরা প্রাতরাশ করলাম।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আমরা অবশেষে বিশাল এক পশুচারণ ক্ষেত্রে পৌঁছলাম। এটি লম্বায় প্রায় তিন মাইল, প্রস্থে দুই মাইল। চারদিকে ইয়াকের হাড় ছড়িয়ে রয়েছে। কাম্বাচেন গ্রামের লোকেরা আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে এখানে পশু চরাতে নিয়ে আসে। এই চারণভূমির উত্তর দিকে অনেকগুলি শিলাময় পর্বতশীর্ষ, আর দক্ষিণ ও পূর্বদিক দিয়ে কামে-ছু নদী বয়ে গিয়েছে। এটিও কাং-চুন-ছু নদীর একটি শাখানদী। এই জলধারাটি প্রায় এক মাইল জলধারার মতো পাহাড়ের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে তারপর পেমা-চান-কিডেমি নামে একটি গুহার সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে। তিব্বতিদের গুরু রিমপোচে বা পদ্মসম্ভব এই পার্বত্য গুহাতে স্বর্গলোকের চাবি লুকিয়ে রেখেছিলেন।

পেমা-ছু নদীটি মোটামুটি শান্ত মেজাজের। এর জল ঘোলা এবং শাদাটে রঙের। গুহা থেকে সামান্য দূরে ছোট একটা উষ্ণ-প্রস্রবণ রয়েছে। নাম মেন-ছু। কাম্বাচেনের লোকেরা বিশেষ বিশেষ তিথিতে এখানে তীর্থস্নান করতে আসে। এটি অত্যন্ত পবিত্র প্রস্রবণ। কারণ, লাল উষ্ণীষ গোষ্ঠীর প্রবর্তক পেমা-গুরু, তিব্বত যাওয়ার পথে এই প্রস্রবণে স্নান করেছিলেন। এই জায়গাটির নাম লো-নাগ-খাং। এখান দিয়ে চি-টাই-ছু নদী বয়ে গিয়েছে। আর এর পূর্বদিকে সুবিখ্যাত পেমা-চুং-কিটসারি। যার মানে, কাং-চন পর্বতের পুরাণকথিত প্রমোদোদ্যান নে-পেমাখাং-য়ের বহিঃপ্রাচীর। দেবতারা ও ঋষিপুরুষরা এই উদ্যানে আনন্দ করতে আসেন। এখানে লাইন করে অনেক দূর পর্যন্ত ছোট-বড় অজস্র পাথরের স্তূপ— মনে হয় বরফের খামখেয়ালিপনার জন্য একটা মোরেন (বা হিমবাহের চর) যেন কিছুতেই আকার ধারণ করতে পারছে না। এখানে কোনও গাছপালাও নেই যে মাটি আর পাথরকে এক সঙ্গে ধরে রাখবে।

বেলা পাঁচটার সময়ে আমরা অবশেষে জোরগু-ওগ নামে একটা জায়গায় আশ্রয়

tirtha
Tour & Travels Pvt. Ltd.

Kashmir	14/15	30/3, 27/4, 18/5, 25/5, 11/10, 12/10, 19/10, 31/10, 1/11
Rajasthan with Bikaner	13	22/3, 11/10, 12/10, 19/10, 31/10, 1/11
Nepal	11	20/4, 27/4, 18/5, 11/10, 19/10
Shimla-Manali/ Himachal	12/15	20/4,18/5, 25/5, 11/10,12/10, 31/10
Nainital-Munsiyari (with Lucknow)	13	18/5, 25/5,11/10, 12/10,19/10, 31/10, 1/11
Kedar-Badri / Chardham	13 18	18/5, 28/5, 8/6 1/10, 12/10
Leh-Ladakh	18/9	7/6, 21/6, 5/7, 19/7, 9/8, 6/9, 20/9

Instant Hotel Booking in these place

Jammu-Kashmir Jammu, Katra, Pahelgaon, Patnitop, Gulmarg, Sonamarg, Srinagar, Houseboat
Himachal Pradesh Shimla, Manali, Dalhousie, Dharmasala, Kulu, Sarahan, Sangla, Kalpa
Rajasthan Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Udaipur, Mt. Abu, Ajmer, Pushkar, Bikaner
Garhwal Haridwar, Rishikesh, Dehradun, Mussorie, Kedar-badri, Uttar Kashi, Chopta, Joshimoth, Rudraprayag
Kumaon Nainital, Almora, Ranikhet, Chaukari, Kausani, Munsiyari, Lohaghat, Pithoragarh
Goa / Maharashtra Aurangabad, Jaigaon, Mahabalieswar, Mumbai, Pune, Goa
Uttar Pradesh Agra, Allahabad, Mathura, Varanasi, Vrindaban
Sikkim Gangtok, Pelling, Rinchengpong, Kaluk, Uttarey, Borong, Aritar
North-East Bomdila, Dirang, Guwahati, Kaziranga, Shillong, Tawang, Tejpur
Old silk route Rishi, Aritar, Zuluk, Nathang valley, Kupup, Silarigaon (Min. 6-8 heads)
Andaman (6N/7D, 7N/8D) [min. 4 heads any day]
West Bengal/Orissa Darjeeling, Gorumara, Jaldapara, Kalimpong, Lataguri, Lava, Lolegaon, Padong, Mandermoni, Digha, Bakkhali, Puri, Chandipur, Gopalpur, Rishoip

Head Office: D/16/1, Katjunagar, Jadavpur (Behind South City Shopping Mall), Kolkata-700 032
Ph: (033) 2414 5566, 98300 94268, 98310 74939

BRANCH:
NORTH KOLKATA- 9830266466 MIDNAPUR / TAMLUK- 9933165416
DHAKURIA- 9831424520 DURGAPUR/BANKURA- 9531617430
DUMDUM- 9874579210 BIHAR- 9955146567
GARIA- 90512 78140 BAGHAJATIN- 9007181584

MEMBER OF ASSOCIATION OF TOURISM SERVICE PROVIDER OF BENGAL
MEMBER OF TAAB

Enjoy LTC/LFC Facilities with us
web: www.tirthatourism.com
mail: tirthatourism@gmail.com

নিলাম। আশ্রয় মানে পাথরের অপ্রশস্ত একটি গর্ত— চার ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া ও তিন ফুট উঁচু। এই গর্তটির প্রকৃত মালিক একটি পাহাড়ি শৃগাল (ওয়ামো) — যার দুষ্প্রাপ্য চামড়া বা ছাল বাজারে খুব উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়। আমাদের গাইড বললো, এখানে মৃগনাভি হরিণ এবং বিশেষ এক ধরনের ছাগল আছে। ছাগলের এই বিশেষ জাতিটিকে স্থানীয় দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, তাই এটিকে হত্যা করা হয় না। তবে অন্যান্য জীবজন্তু সম্পর্কে এধরনের কোনো বিধিনিষেধ নেই।

এই জোরগু-ওগয়ের উচ্চতা ১৮,৬০০ ফুট, জলের তাপাঙ্ক ১৭৮ ডিগ্রি। বিকালের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি। আমি চা তৈরি করলাম আর সেই সঙ্গে ভারত থেকে আনা ভুট্টা দিয়ে সকলের ক্ষুন্নিবৃত্তি হল। আমাদের কাছে ভাত রান্না করার যথেষ্ট জ্বালানি ছিল না। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুরির ফলার মতো ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল, সেই সঙ্গে অল্পস্বল্প তুষারপাত। উগিয়েন আর আমি বেশ কষ্ট করে সঙ্কীর্ণ শেয়ালের গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। সঙ্গের কুলিরা আমার বর্ষাতির কাপড় ও দুটি ছাতা নিয়ে খোলা আকাশের নিচে শোবার ব্যবস্থা করল। গর্তের মেঝেটা একেবারেই অসমান ও পাথর ছড়ানো।

Explore Kashmir Tour & Travels

One of the premier & popular Jammu base Travel House.

CUSTOMIZED & TAILORMADE TOUR PACKAGE FOR

Katra, Vaishno Devi, Jammu & Kashmir, Kargil, Ladaks, Amritsar & Delhi

suitable to clients' requirement & budget

We offer all type of

GOOD TRANSPORTATION

according to your requirement & budget.

a Journey to a paradise!

"if there is paradise on earth, it is this, it is this, it is this".

We have all type of cars to serve your requirement.

VISIT US AT: explorekashmir.in

MAIL US AT: rahulwanchoo@rediffmail.com

J & K: 09419222723, 09419252604, 09419147429

Delhi: 09910403290

Kolkata: 09830304090

সেজন্য পরদিন পিঠের ব্যথায় খুব কষ্ট হয়েছে।

২৭ জুন, ১৮৭৯। সকালবেলা কয়েক দলা আধ সেদ্ধ ভাত কোনোক্রমে গলাধঃকরণ করেই খুব তাড়াতাড়ি পথে বেরিয়ে পড়েছি। আজকের পথ ছোট-বড় অজস্র শিলাখণ্ড অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। চারদিকে গাছপালার কোনো চিহ্নই নেই, মাঝে মাঝে স্পঞ্জের মতো নরম একটু-আধটু শ্যাওলা, এরাই এখানে উদ্ভিদ জগতের একমাত্র প্রতিনিধি।

তুষাররাজ্যের আরো কিছুটা কাছে এগিয়ে যাবার পর চারদিক থেকে তুষারধ্বসের প্রচণ্ড গর্জন শুনতে পাওয়া গেল। এতে আমরা সকলেই বেশ ভীত হয়ে পড়েছিলাম। এখানে তিন-চারটে ল্যাজহীন ইঁদুর দেখতে পাওয়া গেল। গাইড বলল, এরা জলা-জায়গায় শ্যাওলা খেয়েই বেঁচে থাকে। আকাশে বেশ কিছু হাঁস-জাতীয় পাখিও দেখা গেল— পাখিদেরও এটা গ্রীষ্মকালীন দেশ-বদলের সময়।

এইবার আমরা চিরতুষারের রাজ্যে ঢুকে পড়েছি। পথের ডাইনে এবং বামে দুটি তুষারাবৃত গিরিশ্রেণী সমান্তরালভাবে উত্তর দিকে চলে গিয়েছে, আর তারই মাঝখান দিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে আমরা চড়াই ভেঙে এগিয়ে চলেছি। কিছুদূর যাওয়ার পর গিরিশ্রেণী দুটি সমান্তরাল ভাবেই উত্তর-পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়েছে। এই বাঁকটিতে পিরামিডের মতো ত্রিভুজাকৃতি অজস্র তুষারস্তূপ রয়েছে, তার মধ্যে দীর্ঘতরগুলি ৫০ ফুটেরও বেশি উঁচু। এগুলোকে তুষার-সমুদ্রের সফেন তরঙ্গ বলে মনে হচ্ছিল।

মাইল তিনেক এগোবার পর আমি হতক্লান্ত হয়ে পথের উপরই বসে পড়লাম। হালকা হাওয়ায় শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তার উপর ১৯,০০০ ফুট উচ্চতায় চড়াই পথ, ফুসফুসের উপরও প্রচণ্ড চাপ পড়ছিল। এছাড়া চোখে নীল চশমা থাকা সত্ত্বেও, বরফের উপর সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে সবকিছু কেমন গুলিয়ে গেল। সম্পূর্ণ হতাশাচ্ছন্ন হয়ে আমি কাঁপতে কাঁপতে বরফের উপরেই বসে পড়লাম। উগিয়েন গিয়াৎসো আমার চাইতে বেশি স্থূলকায়, ওরও পথ চলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। এখানে আমরা আধ ঘণ্টা ঝিম হয়ে রইলাম।

গিয়াৎসো তখন আমাদের গাইড ফুরচুংকে বললো, যে যদি আমাকে পথের বাকি অংশটা কাঁধে করে নিয়ে যায় সে যা পারিশ্রমিক চাইবে তাই তাকে দেওয়া হবে। আধ মাইল দূরে একটি গিরিশাখার উপর পর্যন্ত ফুরচুং আমাকে বহন করে নিয়ে গেল। তারপরে আবার ফিরে গেল নিজের বোঝা সংগ্রহ করে আনতে। এখান থেকে আবার যাত্রা শুরু হলো। এদিকে সন্ধ্যা ছয়টা হয়ে গিয়েছে। পাহাড়ের যে প্রাচীরটির কাছে আজকের যাত্রাবিরতি হওয়ার কথা সেটি তখনও অনেক দূরে।

আমার তখন আর এক পা-ও চলার ক্ষমতা নেই। কিন্তু কাছাকাছি কোনো পাথরের আশ্রয় ছিল না। জলও নেই। তাছাড়া এই তুষাররাজ্যে, এই ঠান্ডা ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে, এই খোলা আকাশের তলায় রাত কাটাবার কথা চিন্তাই করা যায় না। আমরা আবার গুটি গুটি এগোতে শুরু করলাম। কিন্তু মাইলখানেক এগোবার পরে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। তারার আলো বরফে প্রতিফলিত হয়ে একটু আবছা-আলো হয়েছে, তাইতেই পথ চলতে হচ্ছে। অবশেষে সন্ধে সাতটায় আমরা একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ডের তলায় পৌঁছলাম। প্রস্তরখণ্ডটি বরফের উপরেই বসানো ছিল। আমাদের গাইড বরফের প্রকৃতি অনুধাবন করে বলল, 'আজ রাতের ঠান্ডায় এই পাথর টলবে না। কিন্তু কাল খুব সকালেই আমাদের রওনা হয়ে পড়া নিরাপদ হবে।' আমরা অগত্যা বরফের উপরেই কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ার ব্যবস্থা করলাম। নরম বরফের উপর শয্যা একদিক থেকে বেশ মনোরম হয়েছিল। আমার গতকালও কিছু খাওয়া হয়নি, আজও অভুক্ত কাটল। তবে ক্লান্তির জন্য আমার তখন কোনো ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ ছিল না।

২৮ জুন, ১৮৭৯। সকাল হওয়ার আগেই আবার চলা শুরু হল। চারদিকে তুষারময় শ্বেত সমুদ্র। সবুজের তো প্রশ্নই নেই। কোথাও একটুক পাথরের কালো থাকলে ক্লান্ত চোখ দুটো একটু আশ্রয় পেত— কিন্তু চারদিকে শুধু শাদা আর শাদা। শ্বাসকষ্ট ক্রমেই আরও বেড়ে চলেছে। দু-চার পা হাঁটছি, তারপরেই বসে পড়ছি, আবার উঠছি এবং দু-চার পা গিয়েই আবার বসে পড়ছি— জ্বলন্ত বরফের উপর। এলাকাটায় শক্ত সবুজ বরফের উপরে প্রায় হাঁটু সমান নতুন বরফ। উগিয়েন গিয়াৎসো বেশ আনন্দের সঙ্গেই পাহাড় অতিক্রম করছে, কিন্তু আমার কথা স্বতন্ত্র।

আমার হাঁটু-দুটো সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গিয়েছে, পা দুটো ঠিকমতো কাজ করছে না। এমনি বিপদগ্রস্ত অবস্থায় আমি চাথাং-লা (জনসং-লা) গিরিবর্ত্মের খাড়া পর্বতগাত্র বেয়ে প্রাণপণে এগোবার চেষ্টা করছি— সেই সময়ে আমার হাল দেখে আমাদের সুহৃদ-সহযাত্রী ফুরচুং খুব বিচলিত হয়ে পড়লো। পিঠের বোঝা বরফের উপর নামিয়ে রেখে ফুরচুং ওর লোহা-বাঁধানো লম্বা যষ্ঠিটা আড়াআড়িভাবে কোমরে বেঁধে নিল— বরফের মধ্যে যাতে একেবারে ঢুকে যেতে না হয় সেজন্যই এই ব্যবস্থা। তারপরে সে আমাকে পিঠে তুলে নিল। আমার নীল চশমাটা ওকে দিলাম— আর আমি প্রায় বেহুঁশ অবস্থায়

চোখ বুজে রইলাম।

এর পরে আমরা আরও বৃহৎ একটা তুষারক্ষেত্রে পৌঁছলাম। এখান থেকে চাথাং-লা আরো অন্তত এক মাইল হবে। নয় ইঞ্চি গভীর নতুন বরফের উপর দিয়ে এবার নিজের পায়েই চলতে হচ্ছিল, চলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। ফুরচুং আবার নিজের বোঝা আনতে ফিরে গেল, ওর বোঝা ততক্ষণে নতুন বরফের তলায় চাপা পরে গিয়েছে। দুপুরের দিকে সূর্যের তেজে খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এখন সূর্য পশ্চিম দিকের গিরিশ্রেণীর আড়ালে চলে গিয়েছে। আমরা শেষ শক্তিটুকু সম্বল করে চাথাং-লার ভয়াবহ চড়াই ভাঙছি। প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই পা পিছলে গড়িয়ে অর্ধেকটা করে নেমে যাচ্ছি। আবার উঠছি। ফুরচুং ওর কুকরি (নেপালি ছুরি) দিয়ে বরফের উপর ধাপ কাটছিল, আর দু-হাত দিয়ে আমাকে টেনে টেনে তুলছিল। মুষলধারে তুষারপাত হচ্ছে, প্রতিমুহূর্তেই ভয় হচ্ছে যে, এই বুঝি জীবন্ত সমাধি হয়ে গেল।

যাই হোক, সন্ধ্যা ছয়টার সময় আমরা নির্দিষ্ট পর্বতগুহায় এসে পৌঁছলাম। গতরাত্রির তুলনায় আজকের গুহাটি মোটামুটি প্রশস্ত, মেঝেটাও ততটা কর্কশ নয়। আমাদের গাইড বলল, পথের সবচাইতে দুর্গম ও বিপজ্জনক অংশটা আজ পেরিয়ে আসা হয়েছে, পথের বাকি অংশটা অপেক্ষাকৃত সহজ। এইভাবে প্রচুর কষ্ট স্বীকারের পর আমি সুবিখ্যাত চাথাং-লা (জনসং-লা) অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করি। আজকের সমস্ত পথটাই কেবল শূন্যতা, ভীতি আর তুষার ফাটলের অজস্র মৃত্যু-ফাঁদ।

গুহার ভিতরে কম্বল বিছিয়ে আমরা সংজ্ঞাহীনের মতো শুয়ে পড়লাম। মেঝেটা বরফে ঢাকা, উপর থেকে পাথর গড়িয়ে সর্বত্র ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। জল ফুটিয়ে এখানকার উচ্চতা নিরূপণ করা গেল না। সঙ্গে কোনও জ্বালানি ছিল না, তাছাড়া কাজ করার মতো অবস্থাও আমাদের ছিল না। তবে জোরগু-ওগ থেকে আরো অন্তত দুই হাজার ফুট চড়াই করা হয়েছে, সেই হিসাবে সমুদ্রবক্ষ থেকে চাথাং-লা সম্ভবত ২০,০০০ ফুট উঁচু।

২৯ জুন, ১৮৭৯। আজকে সকাল হওয়ার অনেক আগেই চাথাং-লার পূর্বদিকের তুষারাবৃত গিরিগাত্র বেয়ে আমরা নেমে আসতে শুরু করি। সারারাত একেবারে ঘুমোতে পারিনি। ঠাণ্ডা, ভিজে, তার উপরে গুহার ছাদ থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে অবিরাম ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে— ঘুম হয়নি, কেবল আধা-বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকা। সারাদেহে ব্যথা যেন জমাট বেঁধে রয়েছে। তবুও রাত থাকতেই আমরা রওনা হয়ে পড়লাম, যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

তুষারাবৃত ও দুর্গম হলেও আজকের রাস্তা তেমন বিপজ্জনক নয়। পথে একবারও বসে বিশ্রাম না নিয়ে, ছয় ঘণ্টা ক্রমাগত পথ চলার পর আমরা এই তুষাররাজ্যের প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছলাম। এখানেও চারদিকেই স্তূপীকৃত বরফ, তবে তারই মধ্যে যেখানে একটু ফাঁকা পেয়েছে সেখানে খয়েরি রঙের ঘাস গজিয়েছে। বেলা একটার সময় আমরা একটি ক্ষীণস্রোতা পাহাড়ী নদীর ধারে পৌঁছলাম। বলা যায়, এখানেই আমরা সর্বপ্রথম পবিত্র বোধিসত্ত্বের দেশে পদার্পণ করলাম। আরও কিছুটা এগিয়ে পাহাড়ের পরবর্তী ঢালটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সামনে যেন সবুজের ঢল নেমেছে।

এই জায়গাটির নাম 'শিয়ামি ঠোঠো'। গুর্খাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় চীনের সেনাধ্যক্ষ (সম্ভবত সুন্ড-ফো) এখানে পাথরের একটি দেওয়াল দাঁড় করান এবং দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করেন— এই চাথাং-লা গিরিবর্ত্ম এখন থেকে চিরদিনের জন্য বন্ধ থাকবে। সেই চিররুদ্ধ শিয়ামি-ঠোঠো পেরিয়ে আমরা আরো প্রশস্ত একটি নদীর ধারে পৌঁছলাম। নদীর বাঁ-ধারে একটি বালির পাহাড়, দারুণ খাড়া। নদীটির নাম জেমি। কাংচন-এর উত্তরের ঢালের যত বরফগলা জল তার সব এই জেমি-ছু ও অন্যান্য নদী দিয়ে তিস্তা নদীর উৎসস্থলে বয়ে যায়।

জেমি-ছু নদীর ধারা অনুসরণ করে আমরা এখন দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগোতে থাকলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি বেশ কয়েকটি ইয়াক চরে বেড়াচ্ছে। তাই দেখে আমাদের গাইড ফুরচুং দারুণ ভীত হয়ে পড়ল। ডোকপাদের হাতে ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই। এই ডোকপারাই এই গিরিবর্ত্মের জিম্মাদার। তিব্বতীয় সরকারের প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে এদের এই অধিকার দেওয়া হয়েছে। চাথাং-লা অতিক্রম করে যদি কেউ এদিকে প্রবেশ করে তবে ডোকপারা তাদের উপর লুঠপাট চালাতে পারবে। ফুরচুং আগে থেকেই এসব কথা জানতো কিন্তু আমাদের যে সরকারি অনুমতি আছে এখানে তা কোনোই কাজে লাগবে না, কারণ আমরা নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে নির্বোধের মতো এই রাস্তায় এসে পড়েছি। এখান থেকে উত্তর দিকে ছোর্টেন নিমা-লা গিরিবর্ত্মের ওধারটায় তিব্বতি লুঠেরাদের রাজত্ব, আর এধারটায় ডোকপাদের। ধরা পড়লে হয় ঘাতকদের হাতে মৃত্যু, নয়তো সর্বস্বান্ত হয়ে অনাহারে ও ঠান্ডায় মৃত্যু।

সবদিক বিবেচনা করে আমরা দিনের বাকি অংশটা একটা গুহার আড়ালে আত্মগোপন করে কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে আবার চলতে শুরু করলাম। প্রথমেই নিঃশব্দে ও চুপিসারে নদীটি পেরোতে হল। নদীটি এখানে

দেখবো এবার জগৎটাকে

23A, Keshab Chandra Sen Street,
Kolkata-700 009
Ph: 22192253 / 9433456266 / 9831809491
E-mail: dekhbo.ebar.jagat.taake@gmail.com

Package Tours

- **Vizag-Araku-Gopalpur-Rambha-Barakul-Taptapani** (8 Days)– 25/03/13
- **Taroba-Pench-Nagjira** (8 Days)– 25/03/13
- **Gopalpur-Rambha-Barakul-Taptapani** (5 Days)– 13/04/13
- **Satkosia-Tikarpara** (5 Days)– 13/04/13
- **Kiriburu-Meghataburu** (3 Days)– 14/04/13
- **Kashmir** (12 Days)– 19/04/13
- **Kashmir with Vaishnodevi** (14 Days)– 19/04/13

Hotel Booking

Shimla, Manali, Dalhousie, Kashmir, Leh, Bhutan, Nainital, Sarahan, Sangla, Kalpa, Lingtham, Aritar, Pedong, Lava, Gangtok etc.

New Eye India Travels

7, C.R. Avenue, Gr. Floor,
Laha Paint House, Kolkata-72
(M) 98365 84017, 92306 16841

প্যাকেজ ট্যুর 2013

● হিমাচলপ্রদেশ ● জম্মু-কাশ্মীর ● উত্তরাখণ্ড
● রাজস্থান ● দঃ ভারত ● মুম্বই-গোয়া
● উঃ ভারত ● কেরালা ● আন্দামান
● ভাইজ্যাগ-আরাকু ● ডুয়ার্স

এছাড়া সমগ্র ভারত, নেপাল, ভুটান হোটেল, গাড়ি এবং প্যাকেজ ট্যুর বুকিং করা হয়।

Easy EMI-তে বুকিংয়ের সুযোগ নিন। শর্তসাপেক্ষ

Special offer for REPEATED TOURIST

Special Package 2013–
LEH-LADAKH
(*Pick up from* Chandigarh, *dropping* Jammu)
13 N / 14 D @ 22000/-

★ EMI 2200/- per pax for 10 month.
★ *Condition apply*

পাহাড়ের নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার জন্য অনেকগুলি ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছে— সব মিলিয়ে প্রায় এক মাইল চওড়া। এর মধ্যে তিনটি ধারা অত্যন্ত খরস্রোতা, সেগুলি আমাদের প্রচুর কষ্ট স্বীকার করে পেরোতে হয়।

এরপর রীতিমত উঁচু এবং খাড়া একটা পাহাড় অতিক্রম করে আমরা ছোর্টেন নিমা-লা গিরিবর্ত্মের দক্ষিণ ধারে পৌঁছলাম। চাঁদের আলোয় জায়গাটিকে বেশ সমান্তরাল ও সুপ্রশস্ত বলে মনে হল। এর ডাইনে এবং বামে দুটি তুষারাবৃত পর্বতমালা রয়েছে, তবে এখানে তেমন বরফ নেই। নিকটবর্তী পর্বতশিখরগুলির রং শবদেহের মতো ফ্যাকাসে শাদা— কোনোই জ্যোতি বা উজ্জ্বলতা নেই। মাটির উপর কম্বল বিছিয়ে চাঁদের আলোয় আমরা শুয়ে পড়লাম। বাকি রাস্তাটা যে ঘুমের মধ্যে কোথা দিয়ে কেটে গেল তা জানতেও পারলাম না।

৩০ জুন, ১৮৭৯। সকাল থেকেই আবার পথচলা শুরু হল। পথ এখন খুব একটা খাড়াই নয় এবং একঘেয়ে। গত তিন দিন প্রকৃতপক্ষে অনাহারে কেটেছে, সেজন্য ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় আমরা সকলেই অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এমনি অবস্থায় প্রায় আট মাইল পথ চলার পর আমরা ছোর্টেন নিমা-লা গিরিবর্ত্মের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম।

সে এক অতি গৌরবময় দৃশ্য। গিরিবর্ত্মের শিখরদেশে অনেকগুলি ন্যাড়া-পাথরের ছুঁচলো পর্বতশীর্ষ রুদ্রমূর্তি ধরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের ফাঁক-ফোকরে শাদা-শাদা বরফ। মাথার উপরে ও পিছন দিকে যত দূর দৃষ্টি যায়— তিব্বতের স্বচ্ছ সুনীল আকাশ। আর পর্বতগাত্র বেয়ে যেসব হিমবাহ নেমে এসেছে সেগুলি থেকে যেন সবুজ রঙের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। একাধারে দুর্গম ও বিপজ্জনক এই ছোর্টেন নিমা-লার সামনে দাঁড়িয়ে একদিকে যেমন মনে ভয় হয়, তেমনি একই সঙ্গে মন কানায়-কানায় ভরে ওঠে। পথের অধিকতর দুর্গম অংশগুলি পেরোবার সময় ফুরচুং আমাকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু হাল্কা হাওয়ার জন্য এবারে আর তেমন শ্বাসকষ্ট হয়নি।

গিরিবর্ত্মের উপরে উঠে তিব্বতের সুবিস্তৃত মালভূমি দেখা গেল। আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত, উত্তর দিগন্তে এ-প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত নীল পাহাড়ের সারি। গিরিবর্ত্মের উপরে মোঙ্গোলদের একটি 'লাপ-চে' ও বৌদ্ধদের একটি 'স্তূপ' রয়েছে, আমি সেই পাথরের ঢিবির পাশে শুয়ে পড়লাম। ঢিবির গায়ে অজস্র ধর্মীয় পতাকা লাগানো রয়েছে, আমাদের বন্ধু উগিয়েন গিয়াৎসো সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি পতাকা লাগিয়ে দিল। নিরাপদে গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বৌদ্ধদের মধ্যে এই পতাকা লাগাবার রীতি আছে। আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে আমরা আবার তিব্বতের মালভূমির দিকে নামতে শুরু করলাম।

বেলা তিনটের সময় আমরা গিরিবর্ত্মের তলদেশে এসে পৌঁছলাম। এখানে হিমবাহের মাঝখানে উজ্জ্বল নীল রঙের একটি সরোবর রয়েছে। হিমবাহ থেকেই এটি সৃষ্টি হয়েছে— যেন চারদিকের শাদা বরফের মধ্যে নীল রঙের একটি আয়না বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সূর্য ততক্ষণে ভারত সীমান্তের দিকে পাহাড়ের আড়ালে চলে গিয়েছে, চারদিকে নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সরোবরের স্থির জলে পিছনের পর্বতরাজি নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়ে সে-এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। সরোবরটি ডিম্বাকৃতি— লম্বায় প্রায় সিকি মাইল, আর চওড়ায় ২৫০ গজ। এই সরোবরটি থেকেই ছোর্টেন নিমা-ছু নদীর জন্ম। এখানে বসে ভুট্টা ও গুড় খেয়ে আমরা আবার নামতে শুরু করলাম।

পথের দু-ধারে পাহাড়ের গায়ে গাছপালার কোনো চিহ্নই নেই। হিমালয়ের ওধারটায় সিকিমে ও ভারতে, কি গভীর অরণ্য অথচ এদিকটায় বৃক্ষলতার লেশমাত্রও নেই। এতটুকু ব্যবধানের মধ্যে প্রকৃতির এমন বৈপরীত্য খুবই বিস্ময়কর।

প্রায় পাঁচ মাইল পথ চলার পর আমরা একটি জায়গায় পৌঁছলাম। এই জায়গাটির নামও ছোর্টেন নিমা, অর্থাৎ 'সূর্যের চৈত্য'। তীর্থকামীদের জন্য এখানে কয়েকটি ছোট ছোট পাথরের ঘর আছে। আর আছে মন্ত্র খোদাই করা পাথর দিয়ে তৈরি সুবিশাল এক চৈত্য। ভারত থেকে আসা প্রথম যুগের বৌদ্ধরা এই চৈত্যটি নির্মাণ করেছিলেন। সুপ্রাচীন এই চৈত্যটি খুবই পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। তিব্বতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, এমনকি সুদূর মোঙ্গোলিয়া এবং চীন থেকেও তীর্থযাত্রীরা প্রতিবছর এখানে পুজো দিতে আসেন। খুব ছোট ছোট কয়েকটি ঝোপগাছ এখানে নজরে পড়ল। সেগুলিতে ছোট ছোট ফুলও ফুটেছে— ঈষৎ গোলাপী রঙের।

সন্ধ্যার পর আবার আমাদের যাত্রা শুরু হল। কাম্বাজং থেকে যে রাস্তাটা টেংরিজংয়ের দিকে চলে গিয়েছে, এবারে আমরা সেই রাস্তা লক্ষ করে এগোতে শুরু করলাম। আমরা কোন রাস্তা দিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করেছি সেটা গোপন করার জন্য প্রচলিত সংক্ষিপ্ত রাস্তাটি ছেড়ে আমরা ঘুরপথে অগ্রসর হলাম। এখানে ধরা পড়লে বন্দী করে সোজা কাম্বাজং দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

এখন আবহাওয়া ভারি সুন্দর, আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত। হিমালয়ে যেমন নানাধরনের প্রস্তর দেখতে পাওয়া যায়, এদিকটায় তেমন নয়। এখানে চারদিকে শুধুই স্লেট-পাথর, তবে স্লেট-পাথরের যে এত রকম শ্রেণীভেদ, বর্ণভেদ আছে আগে তা জানা ছিল না। পথে অনেকগুলি পাহাড়ী নদী পেরিয়ে অবশেষে মাঝরাতে আমরা খে-কং গ্রামের কাছে প্রধান সড়কটিতে এসে পৌঁছলাম। রাত্রির বাকি অংশটুকু এখানেই কাটানো হবে। খোলা আকাশের নীচে, গায়ে কম্বল জড়িয়ে, রাস্তার উপর অঘোর নিদ্রা। দক্ষিণ দিকে চাঁদের আলোয় ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের অজস্র তুষারশীর্ষ, আর তারই পটভূমিতে তিব্বতের এই রোমাঞ্চকর মালভূমি। আমাদের বাঁ দিকে খে-কং ছাড়িয়ে একটি গিরিশ্রেণী চলে গিয়েছে, আর সামনের দিকে সেন্ট্রাল টিবেটান হিমালয়ান রেঞ্জের গিরিশ্রেণী।

১ জুলাই, ১৮৭৯। আজ খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমরা প্রথমে সার ও কিংকিজং গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থানের মাপজোক নিই। এখান থেকে এই গ্রামদুটির দূরত্ব প্রায় আট মাইল, উত্তর-পশ্চিম দিকে। যাত্রা শুরু করে কিছুদূর এগোবার পর আজ আমাদের আরও একবার ছোর্টেন নিমা নদী পেরোতে হল। আরো মাইল খানেক চলার পর— ঘণ্টার টুংটুং শব্দ কানে এল। মানে কোনো যাত্রীদল। চারজন যাত্রী, চলেছে সার গ্রামের দিকে। ওরা আমাদের নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল— আমরা কে, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব ইত্যাদি। আমাদের হয়ে ফুরচুংই সব প্রশ্নের জবাব দিল। ওরা আমাকে একজন নেপালি তীর্থযাত্রী বা শেরপা-লামা বলেই ধরে নিল।

ডগলাস ডবলিউ ফ্রেশফিল্ডের সুবিখ্যাত 'রাউন্ড কাঞ্চনজঙ্ঘা' গ্রন্থের পরিশিষ্টে বাবু শরৎচন্দ্র দাশের প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রদক্ষিণের দিনলিপি এখানে এসেই শেষ হয়েছে। এ যাত্রায় বাবু চন্দ্র দাশ লাসা পর্যন্ত যেতে পারেননি। কিন্তু টাশি-লুনপো মঠে তাঁকে আন্তরিক সংবর্ধনা জানানো হয়। লামাতন্ত্রের ছাত্র হিসাবে তিন মাস তিনি এই মঠে বাস করেন এবং এই সুযোগে এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকার ভূগোল, নৃ-তত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি সবকিছু উত্তম রূপে জরিপ করে ফেলেন। অবশেষে বছরের শেষে সিকিম ঘুরে তিনি আবার দার্জিলিঙে ফিরে আসেন।

বাবু চন্দ্র দাশের দিনলিপির এই অংশও নিশ্চয়ই একই রকম রোমাঞ্চকর, কিন্তু ফ্রেশফিল্ড সাহেবের কাছে সেসব অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। কারণ কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রদক্ষিণের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ কোনো যোগাযোগ নেই। জোংরি থেকে রওনা হয়ে জনসং-লা অতিক্রম করে বাবু চন্দ্র দাশের প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘা পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়।

HIMACHAL PRADESH HELPLINE TOURISM

APPROVED BY : GOVT. OF HIMACHAL PRADESH TOURISM LTC / LFC APPROVED

10, The Mall, Shimla H.P., Phone No.-0177-2802676 Mobile: 09816026770 / 09816666660 / 09816967213
Kolkata Office: 6, C.R. Avenue, E-Mall, 1st Floor, Room No.-104, Kolkata-700 072.
Phone: 033-3246 9887/ 64597052 Mobile: 9748756954 / 9903416136

Special Package Tour 2013

Tour No.1 *সহজ মাসিক কিস্তিতে হিমাচল-কাশ্মীর-লে-লাদাখ চলুন, সুদবিহীন ১০টি মাসিক কিস্তিতে টাকা প্রদান করুন।*

লে-লাদাখ -১২ রাত্রি/১৩ দিন (চন্ডিগড় পিকআপ, জম্মু ড্রপ) সফর মূল্য: ২২০০০ টাকা
গন্তব্যস্থান: মানালি, কেলং, সারচু, লে, প্যাংগং লেক, নুব্রাভ্যালি, সুমরারি লেক, কারগিল, সোনমার্গ, শ্রীনগর এবং জম্মু ড্রপ।
* **EMI:** 2200/- Per Pax, Per Month for 10 Months (0% Interest)

Tour No.2 কিন্নর-লাহুল-স্পিতি - ১২ রাত্রি/১৩ দিন (সিমলা পিকআপ, কালকা ড্রপ) সফর মূল্য: ১২৫০০ টাকা
গন্তব্যস্থান: সিমলা, সারাহান, সাংলা, ছিটকুল, কল্পা, নাকো, টাবো, ঢংকর, কাজা, কুনজুম পাস, চন্দ্রতাল লেক, কেলং, রোটাং পাস, মানালি ও কালকা।
* **EMI:** 1250/- Per Pax, Per Month for 10 Months (0% Interest)

Tour No.3 কিন্নর-মানালি - ১০ রাত্রি/১১ দিন (সিমলা পিকআপ, কালকা ড্রপ) সফর মূল্য: ১১৫০০ টাকা
গন্তব্যস্থান: সিমলা, সারাহান, সাংলা, ছিটকুল, কল্পা, রামপুর, জালরি পাস, মানালি, রোটাং পাস, কুলু, মণিকরণ, কালকা ড্রপ।
* **EMI:** 1150/- Per Pax, Per Month for 10 Months (0% Interest)

Tour No.4 সিমলা-কুলু-মানালি - ৬ রাত্রি/৭ দিন (সিমলা পিকআপ, কালকা ড্রপ) সফর মূল্য: ৮৫০০ টাকা
গন্তব্যস্থান: সিমলা, কুফরি, ফাগু, মানালি, রোটাং পাস, কুলু, মণিকরণ, কালকা ড্রপ।
* **EMI:** 850/- Per Pax, Per Month for 10 Months (0% Interest)

Tour No. 5 সিমলা-কুলু-মানালি-ধরমশালা-ডালহৌসি-অমৃতসর (সিমলা পিকআপ, অমৃতসর ড্রপ) সফর মূল্য: ১২৫০০ টাকা
গন্তব্যস্থান: সিমলা, কুফরি, মানালি, রোটাং পাস, কুলু, মণিকরণ, ধরমশালা, কাংড়া, পালামপুর, ডালহৌসি, খাজিয়ার, চাম্বা, ওয়াগা বর্ডার, গোল্ডেন টেম্পল।
* **EMI:** 1250/- Per Pax, Per Month for 10 Months (0% Interest)

Tour No. 6 কাশ্মীর-বৈষ্ণোদেবী - ৮ রাত্রি/৯ দিন (জম্মু পিকআপ, জম্মু ড্রপ) সফর মূল্য: ১১০০০ টাকা
গন্তব্যস্থান: কাটরা, বৈষ্ণোদেবী, শ্রীনগর, গুলমার্গ, সোনমার্গ, পহেলগাঁও, পাটনিটপ, জম্মু ড্রপ।
* **EMI:** 1100/- Per Pax, Per Month for 10 Months (0% Interest)

Tour No. 7 চানসাল ভ্যালি -কারসোক - চিন্দি ৮ রাত্রি/৯ দিন (সিমলা পিকআপ, কালকা ড্রপ) সফর মূল্য: ১০৫০০ টাকা
গন্তব্যস্থান: সিমলা, তপ্তপানি, চিন্দি, কারসোক, বহরু, খাড়াপাথর, চিরগাঁও, হরিপুরধার, রেণুকাজি, কালকা ড্রপ।
* **EMI:** 1050/- Per Pax, Per Month for 10 Months (0% Interest)

All packages are luxury facilities & promise to give good service. Package include: Family-wise Deluxe Room, Transportation by Luxury Car/Bus. Food: Bed Tea, Breakfast, Lunch, Evening Snax and Tea, Dinner.

আমাদের নিজস্ব হোটেল

সিমলা- হোটেল ডিপ্লোম্যাট। সারাহান- হোটেল স্নোভিউ। সাংলা- হোটেল দেবভূমি। ছিটকুল- টেন্ট (নদীর ধারে)। কল্পা- হোটেল মাউন্ট ভিউ/রোলিং রং। রামপুর- অতুল রিজেন্সি। মানালি- হোটেল ওসেন/ অ্যাপেল প্যারাডাইস। ধরমশালা- হোটেল ট্রুড। ডালহৌসি- হোটেল অমর। অমৃতসর- সুখমন ইন্টারন্যাশনাল। কাটরা- হোটেল জলি প্লাজা। শ্রীনগর- হোটেল রিমানো। পহেলগাঁও- হোটেল পাইন প্যালেস। কারসোগ- গোপাল অ্যাপেল ভ্যালি।

"Lucky Draw Scheme & Lot of Gifts For Repeat Tourist." Kindly Contact Immediate 09748756954. Scheme open from 10th February 2013

2013 PUJA BOOKING OPEN

Nobody can give you Himachal better than us * *conditions apply*

ফিরে দেখার ২০ বছর

১৯৯৩ ∬ আমার ভ্রমণ

নাইরোবি থেকে একটা ছোট এরোপ্লেনে করে যাচ্ছি কেনিয়ার মাসাইমারা ন্যাশনাল পার্কে। ছোট্ট প্লেনটিতে মাত্র ষোলো-সতেরো জনের জায়গা হয়েছে। মাসাইমারায় পৌঁছে প্লেনটা আর কিছুতেই নামতে পারে না। সেখানে অল্প একটু জায়গা পরিষ্কার করে সরু ফিতের মতো একটা এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করা হয়েছে। দেখি সেই এয়ারস্ট্রিপের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে দুটো বিশাল হাতি!

এয়ারস্ট্রিপের কাছে কিছু লোক পটকা-টটকা ফাটিয়ে সেগুলোকে তাড়ানোর চেষ্টা করল। হাতিগুলো খুব যে ভয় পেল তা নয়। একটু বিরক্ত হয়ে কয়েক পা মাত্র সরে দাঁড়াল। তারপর নামল প্লেন। মাসাইমারা ন্যাশনাল পার্কে থাকার জায়গা হল জঙ্গলের মধ্যে একেকটা তাঁবু। তাঁবুগুলো একটা থেকে আরেকটা বেশ দূরে দূরে, আর এমনভাবে সাজানো, কোনওটা থেকেই কোনওটাকে দেখা যায় না, মনে হয় জঙ্গলের মধ্যে একা আছি। এইসব তাঁবুতে থাকলে এত জন্তু-জানোয়ারের ডাক, তাদের চলাফেরার আওয়াজ চারদিক থেকে আসতে থাকে যে রাতে ঘুম-টুম মাথায় উঠে যায়। মাসাই গার্ড আছে। সশস্ত্র। তাদের সাহায্যে রাত্রে চলাফেরা করতে হয়। একা বেরনো যায় না। খাওয়ার জন্য স্বতন্ত্র একটা তাঁবুতে সবাইকে যেতে হত। এরকম এক রাত্রে খেয়ে দেয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরছি, হঠাৎ দেখি আমার তাঁবুর সামনে কী একটা জন্তুর চোখ জ্বলজ্বল করছে। ভাবছি এটা আবার কী রে বাবা! মাসাই গার্ডকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই, ওরা ভাষা বোঝে না। ওকে দেখলাম টর্চের আলো ফেলছে জন্তুটার চোখে। মস্ত বড় চেহারা দেখে একসময় ভাবলাম গন্ডার নাকি! পরে জানা গেল ওটা গন্ডার নয়, জলহস্তী। বিশাল চেহারা। কাছেই জলাজায়গা আছে। সেখান থেকে রাত্রে উঠে এসেছে। মাসাই গার্ডরা জানে কীভাবে এদের মোকাবিলা করতে হয়। তার চোখে বার বার টর্চের আলো জ্বালিয়ে-নিভিয়ে বিরক্ত করে ওটাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।

পরদিন ম্যানেজারকে এই ঘটনার কথা জানাতে, তিনি আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, জলহস্তীকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নিরীহ প্রাণী, কিচ্ছু করে না। আদৌ মাংসাশী নয়। তবে একেবারে মুখের সামনে পড়ে গেলে একটু কামড়ে দেয়। আর কামড়ে দিলেই— মানুষ দু'খণ্ড হয়ে যায়। বলাই বাহুল্য! বিরাট বড় মুখ তো!

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় □ ভ্রমণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

১৯৯৪ ∬ জংলি পালামৌ: অন্য চোখে

একবার ঘোর বর্ষাতে বেতলার ট্যুরিস্ট লজ থেকে বিকেলে চা খেয়ে, গেট পেরিয়ে, জঙ্গলের কাঁচা রাস্তা ধরে গভীরের দিকে চলেছি। সঙ্গে সেবারে নীরেনদা (কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) এবং মিনতি ও বিভাস রায়চৌধুরি ছিলেন। বেশ অনেকটা চলে গিয়েছি, এমন সময় তর্জন-গর্জন করে বৃষ্টি নামল মুষলধারে। প্রথমে কিছুক্ষণ একটা মস্তবড় পইসাঁর গাছের নীচে দাঁড়িয়ে মাথা বাঁচানোর চেষ্টা করলাম। তা যখন হল না, তখন বৃষ্টিতে ভেজার মজাটা পুরোপুরি উপভোগ করার জন্য বৃষ্টি মাথায় করেই গাছের আশ্রয় ছেড়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে এসে ভিজতে ভিজতে ধীরে ধীরে ট্যুরিস্ট লজের দিকে ফিরে চললাম। ঠিক সেইসময় একদল চিতল হরিণ, প্রায় শ-দেড়েক হরিণ-হরিণী ও মৃগশিশু ছিল সেই দলে; কোথা থেকে যে দৌড়ে এসে আমাদের সামনের উদোম ঘাসবনে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল যে, দেখে আশ্চর্য হলাম আমরা।

হয়তো বাঘে অথবা চিতাতে অথবা বুনো কুকুরে তাড়া করেছিল তাদের! যে কারণেই হোক, আমাদের বরাদ্দ ছিল ওই আশ্চর্য সুন্দর অপ্রত্যাশিত দৃশ্যের শরিক হওয়ার, তাই হলাম।

একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। আশ্চর্য সুন্দর কনে-দেখা কাঁচা হলুদ আলোতে নরম হয়ে উঠল প্রকৃতি, আর ঠিক তখনই হরিণগুলি আবার দলছুট হয়ে যেদিক থেকে দৌড়ে এসেছিল, তার উল্টোদিকে লাফাতে লাফাতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বুদ্ধদেব গুহ □ ভ্রমণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

১৯৯৫ ∬ আরেক সিমলা

যে-কোনও উপভোগের পথেই বিস্তর অন্তরায়। সুন্দরের উপভোগে তো আরও বেশি। প্রকৃতিকে নিয়ে কবিত্ব করবার লোভে সিমলায় একবার কী বিপদ ঘটেছিল বলি।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিতে গিয়েছি তখন এক বছরের জন্য। শঙ্খিল পাহাড়িপথে ঘুরতে ঘুরতে বাস বা ট্রেন যখন এগোতে থাকে সিমলার দিকে, অনেক দূর দূর থেকে নানা কোণে দেখতে পাওয়া যায় বিপুল মহিমময় উচ্চচূড় এক অট্টালিকা, ওইটাই সেই ইনস্টিটিউট। প্রাসাদতুল্য সে বাড়ির প্রশস্ত ছাদ বা অলিন্দ থেকেও দেখা যায় দূর-প্রসারিত শ্যামল-বন্ধুর ঢলের পর ঢল। কিন্তু ঠিক-ঠিক সিমলা শহরটার কোনও ধারণা পাওয়া যায় না ওখান থেকে, দেখা যায় কেবল তার ছড়িয়ে থাকা পাহাড়পট।

অনেক আগে থেকে ইনস্টিটিউটে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বুঝিয়েছিলেন, বাজারের দিকে নেমে সামনে একটা ছোট চূড়োয় ওঠবার পথ আছে, সেখানে একবার যাওয়া চাই। ওখান থেকে চারপাশে বৃত্তের মতো দেখা যায় অনেকখানি সিমলা, ওই চূড়ো যেন একটা কেন্দ্র।

কী আছে ওখানে?

আছে একটা মন্দির। বেশি পুরনো নয়, স্থাপত্যের কোনও গরিমা নেই; কিন্তু তবু চূড়ো যখন, মন্দির তো থাকতেই হবে একটা! সেটা না দেখলেও চলবে, দেখতে হবে কেবল পরিবেশটা। তবে, যাবার আগে মন্দিরের পুরোহিতকে অবশ্যই একটা ফোন করা দরকার হবে।

মন্দিরে ফোন? কেন?

কেননা পুরুতঠাকুরের প্রকাণ্ড এক অ্যালসেশিয়ান আছে। কেউ আসছেন খবর পেলে উনি বেঁধে রাখবেন ওটাকে। ছাড়া থাকলে কিন্তু খুবই মুশকিল। অনেককেই কামড়ে দিয়েছে ও।

ওই চূড়োয় এমন একটা কুকুর রেখেছেন কেন উনি?

কারণ একটা আছে। জনহীন ওই চূড়োয় বাস করেন উনি একাই, মন্দিরের পিছনদিকটাই তাঁর বাড়ি, সঙ্গে কেবল তাঁর এক সুন্দরী কন্যা। সে মেয়ে অবশ্য বেশ বড় হয়েছে এখন, কাজে লিপ্ত কোথাও। আসলে তাঁরই রক্ষণের জন্য ঠাকুরমশাইকে পুষতে হয়েছিল অ্যালসেশিয়ান।

বৃত্তান্ত শুনে সৌন্দর্য নিরীক্ষণে আমার আগ্রহ একটু কমেই গেল। অত আয়োজন করে ফোনে অগ্রিম খবর দিয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়া বেশ শক্ত কাজ, আবার খবর না দিয়ে শ্বাপদ-দংশনের মুখোমুখি হওয়াও ঠিক ততটাই কঠিন।

এরপরে কেটে গেছে কয়েক মাস। কদিনের জন্য এক বন্ধু এসেছেন বেড়াতে। কুয়াশামোড়া এক ভোরবেলায় হঠাৎ মনে হল ওই চূড়ো থেকে তাঁকে দেখানো যাক সিমলার কুয়াশামোচন। অন্যদের ঘুম ভাঙবার অনেক আগেই পায়ে পায়ে আমরা উঠতে লাগলাম চূড়োর দিকে, ওখানে বসেই না হয় দেখা যাবে সূর্যোদ্ভব। বেশ একটা প্রকৃতিপ্রেমিক ভঙ্গি তখন আমাদের।

মন্দিরের প্রায় সামনে এসে পৌঁছেছি যখন, তার চারধারে শূন্যের পূর্ণ বিস্তারটা দেখবার অনেক আগেই 'বাঃ' শব্দটা মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে যখন, ঠিক তখনই প্রথম ভাঙল ঘোর। কোন অলক্ষ্য কোণ থেকে জেগে উঠল একটা ঘেউ ঘেউ ডাক।

সর্বনাশ! ফোন তো করা হয়নি। এখন উপায়?

কিন্তু এরকম ভোরবেলায় ওরকম একটা কুকুর নিশ্চয় ছেড়ে রাখা নেই? করলই না হয় দাপাদাপি, না হয় একটু চ্যাঁচালই। আর, চ্যাঁচালেই ভালো, কেননা গৃহকর্তার ঘুম ভেঙে যাবে তাহলে। আর তাহলে আশা করি এও বোঝা যাবে যে আমরা ঠিক তস্কর নই, অপহরণকারীও নই। মন্দিরটাকে ডানপাশে রেখে এগিয়ে যাই শূন্যের দিকে, কেননা ওপরে মাত্র ছোট্ট একটু সমতল। গর্জনধ্বনিতে চোখে পড়ে মন্দির-পিছনে বাড়ির বারান্দাটা, আর সে বারান্দার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বিপুল আক্রোশে দৌড়ে বেড়ানো এক অ্যালসেশিয়ান। ঠিক আছে ঠিক

আছে, বাড়ির গেট তো অন্তত বন্ধই আছে নিশ্চয়। ভয় কী তবে? আরও দুপা এগোই। আর ঠিক তখনই, সমস্ত নিশ্চয়তাকে তুচ্ছ করে দিয়ে ধাবমান ওই কুকুর ক্ষিপ্ত এক ঝাঁপে আবজানো গেটের একেবারে বুকের ভেতর দিয়ে পৌঁছল এসে আমাদের পায়ের কাছে। আস্ফালিত লাঙুল, ঊর্ধ্বমুখী তার চিৎকৃত ডাক আর সন্নিহিত তার সঘন নিশ্বাসের ছোঁয়া পাওয়া মাত্র যে আশ্চর্য বাক্যটা প্রথম আমার মনে এল তখন, তা হচ্ছে: ইনস্টিটিউটের ডাক্তার না হাসপাতালের ডাক্তার?

ইনস্টিটিউটে যোগ দেবার দু-চারদিনের মধ্যেই জেনেছিলাম যে তার আছে নিজস্ব এক চিকিৎসাব্যবস্থা, ওষুধপত্র আর ডাক্তার সমস্তই মজুত, কিন্তু সেইসঙ্গে এই সতর্কবাণীও শুনেছিলাম যে অসুখবিসুখ করলে শহরের হাসপাতালে দেখানোই বরং ভালো, কেননা কেবলমাত্র সেক্ষেত্রেই সেরে ওঠবার কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা থাকে। কুকুরটিকে হাঁটুর ওপর উঠতে উদ্যত দেখে তার আশু দংশন বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ আমার একমাত্র বিবেচ্য হল তখন পরবর্তী কর্মপদ্ধতি: ইনস্টিটিউটের ডাক্তার না হাসপাতালের ডাক্তার?

কিন্তু সঙ্গিনীর গলায় উচ্চারিত হতে শুনলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরামর্শ: বিস্কুট, বিস্কুট!

নতুন কেনা এক প্যাকেট বিস্কুট ছিল পকেটে, আমাদের সম্ভাব্য প্রাতরাশ হিসেবে। সেকথা মনে করিয়ে দিতেই বিদ্যুৎবেগে হাত চলে যায় পকেটে, বার করে আনি প্যাকেট, ছুড়ে দিই তাকে অনেকেটা দূরে। সঙ্গে সঙ্গে তার লক্ষ্য বদল করে কুকুর। হাঁটু ছেড়ে দৌড়োয় সে প্যাকেটের দিকে। বিপুল উদ্যমে কড়মড় শব্দে চিবোতে থাকে বিস্কুট, আর আমি ভাবতে থাকি অতি ক্ষণস্থায়ী ওই বিস্কুট শেষ করবার পর আর কোন উপায় আছে আমাদের! আর কী দিয়ে তোষণ করব ওকে? জীবনমৃত্যুর মাঝখানে এই দুই মুহূর্তের শুধু অবকাশ। যেন কুকুরটির বিষয়ে কিছুই আর ভাবছি না, এমনই একটা মুখ করে তাকিয়ে রইলাম আকাশের দিকে, আকাশের বর্ণবিভায় হৃদয়কে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্‌বেলিত হতে দিলাম, গায়ের ভেতরে শিরশিরানি জমিয়ে নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম: আহা, কী চমৎকারই না দেখাচ্ছে দূরের ওই সদ্যঘুমভাঙা শহর!

কিন্তু এ কী! বিস্কুট ফুরিয়ে যাবার পর আবারও তো ছুটে এল না ও। বরং বেশ তৃপ্ত লীলায় সামনে-পিছনে দু-চারবার ছুটোছুটি করল শুধু, আর তারপর প্রায় আবেশমন্থরতায় পাথরের পাশে এলিয়ে দিল গা, যেন আমাদেরই অনুকরণে সেও তাকিয়ে রইল ভোরের আলোর ওই আকাশেরই দিকে। প্রকৃতিসেবনে বড় একটা বাধা হল না আর, কেবল এই একটা প্রশ্ন ফিরে ফিরে জাগতে লাগল মনে: মাত্র এক প্যাকেট বিস্কুটেই বশে আনা যায় যে রক্ষীকে, তার কাছে কি খুব সুরক্ষিত ছিলেন রূপসী সেই মন্দিরকন্যা?

শঙ্খ ঘোষ □ ভ্রমণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

১৯৯৬ ∬ দুচাকায় দুনিয়া

কায়রো ছেড়ে রওনা হলাম দক্ষিণে। রাস্তা ভালো। এত অসহ্য গরম যে কষ্ট হচ্ছিল। সাইকেল চালাবার সময় একটা গরম হাওয়া পাওয়া যায় কিন্তু থামলে অতিষ্ঠ লাগে।

দুদিন চলবার পর একেবারে ডানদিকে নুবিয়ার বিস্তীর্ণ দেশ জুড়ে বালির পাহাড় দেখলাম। এটা সাহারা মরুভূমির পূর্ব অংশ, দেশটার নাম সুদান। উটের ওপর চড়ে ছাড়া এ দেশের যাতায়াত করা যায় না। ১২০-১৩০ ডিগ্রি তাপমাত্রা। মানুষ একটু ছায়া পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। সুদানের লোকের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে। দুর্ধর্ষ জাতি।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পর থেকে ইজিপ্ট, সুদান এবং পুরো উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকা মুসলমান হয়ে যায়। মোটামুটি আফ্রিকার মানুষকে দুভাগে ভাগ করা যায়। আফ্রিকার নানা উপজাতি ও মুসলমান সম্প্রদায়।

দেখতেদেখতে ৭০০ মাইল দক্ষিণে এসেছি। দিনে ৫০ মাইলের বেশি সাইকেল চালাতে পারছি না গরমের কষ্টে।

একদিন বিকালে নুবিয়ার মরুভূমিতে অস্পষ্ট দেখলাম দুটো সিংহ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছাদন ছাড়া বাইরে কোথাও রাত কাটানো যাবে না। এক্ষেত্রে কাপড়ের তাঁবু ফেলে শোওয়া বিপজ্জনক। সিংহের কোনও অভিজ্ঞতা আমার নেই। দেখামাত্র আক্রমণ করবে কিনা জানি না। বন্দুকটা হাতে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম।

প্রায় আট মাইল চলবার পর আশ্রয় পেলাম এক মিশরীয় চাষীর কুঁড়ে ঘরে। সে বলল যে সিংহ সাধারণত আক্রমণ করে না মানুষকে, যদি মানুষ তার দিকে তেড়ে না যায়। অফুরন্ত জীবজন্তু আছে, তাদের জলাশয়ের ধারে জল খেতে গেলে ধরে খায়। মরুভূমি-প্রধান জায়গায় জন্তুরা জল না খেয়ে কেমন করে বেঁচে থাকে জানি না। দূরে দূরে জলাশয় আছে নিশ্চয়। সিংহের গায়ের বা লোমের রং এবং বালির রং একই। খুব সহজে গা ঢাকা দিয়ে জলাশয়ের কাছে বসে থাকে।

মাঝে মাঝে দেখতাম ছোট ছোট গাছের ঝোপ, প্রাণপণে মরুভূমির প্রকোপ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

এগারো দিন পর আসওয়ান শহরে পৌঁছলাম। ইজিপ্টের সব শহর নাইল নদীর গা ঘেঁসে। আসওয়ান একেবারে দক্ষিণে। এক প্রকাণ্ড মন্দির নাইলের জলের ধারে। এটির বয়স অন্তত চার হাজার বছর, অনেক ভাস্কর্যে ভরা দেবদেবীর পাথরের মূর্তি। খুব নিখুঁত কাজ। যখন লোহা বা ইস্পাত আবিষ্কার হয়নি তখন কেমন করে বা কী দিয়ে এমন সূক্ষ্ম খোদাই করতে পেরেছিল পাথরের ওপর, আজ ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এটি পুরনো মিশরীয় শিল্পের একটি সেরা নিদর্শন।

আসওয়ানে তিনদিন বিশ্রাম নিলাম। বড় শহর। তুলোর প্রধান কেন্দ্র। ঠিক পাশেই নাইল নদী বয়ে চলেছে। উত্তর ইজিপ্টের চেয়ে এ অঞ্চলের লোকেরা শান্ত প্রকৃতির।

আসওয়ান থেকে একশো মাইল দক্ষিণে চলেছি। সামনেই সুদানের দ্বিতীয় বড় শহর ওয়াদি-হাইফা। সুদান মস্ত বড় দেশ। ইজিপ্টের দ্বিগুণের চেয়ে বেশি জমি। কিন্তু মরুভূমির চাপ অর্থাৎ সাহারার প্রকোপ দেশটাকে বালুময় করে তুলেছে। ওয়াদি-হাইফায় উট আর উট। মাটির তৈরি দোতলা ঘরবাড়ি। মরুভূমির উপযুক্ত নানা রকম জিনিসের কারবারের জন্য বহু লোকের এই শহরে আনাগোনা।

নদীর ধারে তুলোর চাষ পুরোদমে চলে। মিশরের মতো সুদানের তুলোরও খুব সুনাম আছে। বিদেশে রপ্তানি করে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা হয়। নানা দেশে উটও সরবরাহ করা হয় চাষের জন্য ও মাংসের জন্য।

সামনে কঠিন পরীক্ষা আসছে। রাস্তা খারাপ হতে আরম্ভ করেছে, কাঁচা মেঠো পথ যদিও চওড়া। এদিকে কোনও যানবাহন চলে না। বন্য আফ্রিকা বলতে যা বোঝায় তা এখান থেকে শুরু।

বিমল মুখার্জি □ ভ্রমণ মে ১৯৯৬

১৯৯৭ ∬ গাড়িতে মানস-কৈলাস

নেপাল-তিব্বত সীমান্তে ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ যে নদীর ওপর, তার নাম সান-কোশি। ওই নদীই তিব্বতে ঢোকার পর হয়ে গিয়েছে পো। নিয়ালম পর্যন্ত ওই পো নদী আমাদের পাশে পাশে ছিল। তারপর হারিয়ে গিয়েছে। তারপরে আমরা আবার নদী পেলাম সাগার একটু আগে। গাড়িসুদ্ধ ওই নদী পেরতে হল কপিকলে টানা বার্জের সাহায্যে। নদীর তিব্বতি নাম ইয়ার্লুং-সাংপো। আসলে ব্রহ্মপুত্র।

মানসের যা রুট, তাতে নিয়ালমে প্রথম রাত কাটাতে পারলে পরের দিন সাগা পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়। সকাল নটায় নিয়ালম থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলে সারাদিন গাড়ি চালিয়ে সাগা পৌঁছতে রাত আটটা বেজে যাবে। অবশ্য রাত না বলে বিকেল বলাই ভালো। কারণ তিব্বতে সূর্য অস্ত যায় রাত নটার পর। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় রাত কাটানো যায় সাগার সরাইখানায়। সাগা খুবই নোংরা শহর। কিন্তু উপায় নেই।

আমরা অবশ্য সাগা পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি। আমাদের দ্বিতীয় রাত কাটাতে হয়েছে পেলকুৎসো হ্রদের ধারে তাঁবু ফেলে। ইচ্ছে ছিল, তৃতীয় রাত কাটানোর জন্য সাগা পেরিয়ে জোংবা অবধি চলে যাব আমরা। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি। চার ঘণ্টা পরে সাগার কাছে ব্রহ্মপুত্র নদী পেরতে এসে দেখি মাঝির দেখা নেই। কোনও এক তিব্বতি উৎসব উপলক্ষে আগের দিন রাত্রে মাঝি সাগা শহরে চলে গিয়েছে খানাপিনা করতে। পরদিন বেলা একটা অবধি তার দেখা নেই। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু সেদিন রাত নটা পর্যন্ত মাঝির টিকি খুঁজে পাওয়া গেল না। অগত্যা আবার আমরা তাঁবু ফেললাম ব্রহ্মপুত্রের ধারে। আমাদের তৃতীয় রাত কাটাতে হল সেখানেই। ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার বেগের ভূতুড়ে হাওয়ার মধ্যে। সে হাওয়ার বিকট সব শব্দ শুনলাম সারারাত ধরে। সন্ধের পর থেকে শুরু হল তুষারপাত। এখানেই উচ্চতাজনিত অসুস্থতায় রীতিমতো কাবু হয়ে গেলেন শ্রীমতী মন্দিরা পাল। ডাক্তার দীপিকা সিনহা আক্রান্ত হলেন হিল ডায়েরিয়ায়।

সাগা থেকে জোংবার দূরত্ব ১৪৫ কিলোমিটার। ক্রমশ ওপরে উঠছে রাস্তা। সাগার উচ্চতা সাড়ে চোদ্দো হাজার ফুটেরও বেশি। ওদিকে নিয়ালমের উচ্চতা ১২ হাজার ফুট। কোডারি ৬ হাজার এবং ঝাংমু ৭ হাজার ফুট উঁচুতে। মানস সরোবরের উচ্চতা ১৪৯৫০ ফুট। জোংবা শহরটি মরুভূমির মধ্যে। চারদিকে বালির পাহাড়।

জোংবা শহরে কিছুক্ষণের জন্য চা-পানের বিরতি দিয়ে আমরা রওনা হলাম পারিয়াং শহরের দিকে। আমাদের চতুর্থ রাত কাটবে ওই শহরেই। পারিয়াংয়ের রাস্তা সবটাই প্রায় মরুভূমির ওপর দিয়ে। পথে বিশাল আকারের সব বালির পাহাড়। এখানকার প্রকৃতি অতি বিচিত্র। একইসঙ্গে বালিয়াড়ি এবং তুষারশৃঙ্গ। তারই মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে ব্রহ্মপুত্র। গাড়ি চলেছে বালির সমুদ্রের মধ্য দিয়ে। এখানকার গড় উচ্চতা ১৪ হাজার ফুট হওয়া সত্ত্বেও দিনেরবেলা সূর্যের প্রখর তাপে সমস্ত শরীর ঝলসে যাচ্ছে। রাত্রে আবার ওই একই জায়গার তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির নীচে। প্রত্যেকের চোখমুখ পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে প্রায় সকলেরই। গাড়ির প্রতিটি কাচেই তোয়ালে ঢাকা দেওয়া। যাতে সূর্যের তাপ সরাসরি মাথায় এসে না লাগে। এই অবস্থাতেই আমরা পারিয়াং পৌঁছলাম বিকেলের কিছু পরে। প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায়। এই পথে টানা দশ ঘণ্টা চলন্ত গাড়িতে কাটানো রীতিমতো কষ্টকর।

পারিয়াং এসে গিয়েছি মানেই মানস সরোবর আমাদের হাতছানি দিচ্ছে। আর মাত্র একদিনের পথ বাকি। যদিও এই রুটে পারিয়াং থেকে মানস পর্যন্ত পথই দীর্ঘতম। সকালে ব্রেকফাস্টের পর পারিয়াং থেকে বেরোলে মানস সরোবর পর্যন্ত পৌঁছতে অনেক সময়ে মধ্যরাত্রি পার হয়ে যায়। তবে মাঝপথে মায়ুম গিরিপথের সর্বোচ্চ পয়েন্ট থেকে মানস এবং কৈলাসের প্রথম দর্শন পাওয়া যায়। এই দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে যান যাত্রীরা। আমাদের জ্যেষ্ঠতম যাত্রী মায়ুম গিরিপথ থেকে প্রথম মানস-কৈলাস দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচতে শুরু করেছিলেন। মানসের ধারে বসে ইনিই কর্পূর জ্বালিয়ে যজ্ঞ করেছেন। গঙ্গা-ছু'র উষ্ণ প্রস্রবণে খালি গায়ে তেল মেখে স্নান করেছেন। কৈলাসের দিকে তাকিয়ে গীতাপাঠ করেছেন একঘণ্টা।

সমীর রায় □ ভ্রমণ আগস্ট ১৯৯৭

১৯৯৮ ∬ নীল ও হ্যাভলক

ডাবের সন্ধানে এবার ফেরার পথ ধরে গ্রামের দিকে এগোই। শুনলাম মাইল দুয়েক পিছিয়ে গেলে একটা দোকান আছে, সেখানে ডাব মিললেও মিলতে পারে। মিলবে কি না জোর করে বলা যায় না।

গলা শুকিয়ে কাঠ, সমুদ্রসৈকত ছেড়ে বেশি দূর যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, এমন সময় একজন স্থানীয় লোককে দেখে ডাবের কথাটা পাড়লাম। কিনতে পাওয়া যায় কি?

লুঙ্গি পরা খালি-গা লোকটি 'আমার সঙ্গে আসেন' বলে রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকের নিচু জমিতে বোধহয় তার বা অন্য কারও উঠোনে বা বাগানে নেমে গেল। খোলা জায়গায় একটা বাঁশের বেঞ্চিতে আমাদের বসিয়ে লোকটা ঘরের মধ্যে ঢুকল, আর তখনই বাঁহাতে ডাব, ডান হাতে দা নিয়ে বেরিয়ে এসে ডাব কেটে আমার হাতে দিল, ধরতে হল দুহাতে। মিঠে ঠান্ডা জল, মুখ বুক স্নিগ্ধ হয়ে যায়। দুজনকে দুটি ডাব খাইয়ে ডাবের শাঁস খাবার ব্যবস্থাও করে দিল। হাতের সঙ্গে তার মুখও চলছে। কলকাতা থেকে ১৯৬৮ সালে ৪১ টাকা ভাড়ায় জাহাজে এখানে আসার পথে ক্যাপ্টেনের ভুলে কীভাবে এরা নিকোবরে চলে গিয়েছিল, পরে কম্পাসের সাহায্যে দিক চিনে সারাদিন সারারাত ধরে জাহাজ চালিয়ে কীভাবে প্রথমে পোর্টব্লেয়ার ও সেখান থেকে হ্যাভলকে এসে পৌঁছয় সেই গল্পটি, তার সব খুঁটিনাটি ও রোমাঞ্চ সহ মনে রাখতে পারলে প্রায় একটা দুর্গম জলযাত্রার কিংবা দ্বীপ-অভিযানের মনোগ্রাহী বৃত্তান্ত হত। সমুদ্রে পথ হারিয়ে একদিন বাড়তি থাকার জন্য দুবেলা মাংস ভাত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তাদের দেওয়া হয়েছিল সেই আনন্দ ও লাভস্মৃতি লোকটির মনে এখনও তাজা হয়ে আছে। প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে লোকটির কিছুটা ক্ষোভ আছে মনে হয়, হঠাৎ বলল, সরকার তোমাকে জমি দিয়েছে বলেই সে জমির ওপরের আকাশটাও তোমার হয়ে যায় না। আরও একটা কথা সে বলেছিল, সেটা ঠিক এতটা দার্শনিক নয়, বরং সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের বিষয়। জমি দিসে তোমারে, তারপর তুমি ঘর বানাইয়া জমি তৈয়ার কইরা চাষ করলা, বিয়া করলা, তোমার ছাওয়াল মাইয়া হইল, ভগবানের বিধানে ছাওয়াল মাইয়া দুইজনেই বড় হইল, তুমি মাইয়ার বিয়া দিইয়া তারে তোমার জমির উত্তরাধিকার থিকা চিরকালের মতো বঞ্চিৎ করলা আর মরণের পর তোমার হগল জমি পাইল তোমার পোলায়। এইডা কি সরকার চাইছে, না ভগবানের বিধান? আপনারা মূল ভূখণ্ডের লেখাপড়া শিখা মানুষ, আপনারাই কন।

বাবা-মায়ের পর তাদের মাইয়া পোলা দুজনেই জমির সমান সমান ভাগ পেলে আমি খুবই খুশি হব। কিন্তু এখানে সে ব্যবস্থা করার আমি কে, আমার কথার দামই বা এখানে কে দেবে, এইসব দ্বিধায় সামান্য বিব্রত বোধ করছি, এমন সময় অদূর রাস্তা দিয়ে ভয়ার্ত ধ্বনি তুলে আমাদের কোচটা দেখলাম যাত্রীনিবাসে ফিরে যাচ্ছে! ছুটন্ত বাসের ড্রাইভারের পাশের সিটে ডলফিনের মহিলা ম্যানেজারকে এক পলক দেখেই আমরা হাত তুলে গলা তুলে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেও বাসটাকে থামানো গেল না। ফলে আদিকাল থেকে জমির মালিকানা বা উত্তরাধিকার নিয়ে যেসব গূঢ় খেয়োখেয়ি চলছে সেগুলোর চেয়ে আমার কাছে বড় হয়ে উঠল এই একটাই চিন্তা— ১৬ কিলোমিটার অচেনা রাস্তা হেঁটে কী করে ডলফিনে পৌঁছব! ডাবই আজ ডোবাল। তবে এইরকম পরমাশ্চর্য একটা দ্বীপে এসে বাহন হারিয়ে বা পথ ভুলে তা নিয়ে কতক্ষণ আর আশঙ্কা আর আপশোস করা যায়! এদিকে সন্ধেও প্রায় হয়ে আসছে। লোকটিকে নির্লজ্জের মতো কিছুটা নাটকীয়ভাবে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার কাছ থেকে সংক্ষেপে বিদায় নিয়ে আমরা সমুদ্রসৈকতে ফিরে এসে আনন্দে মূক হয়ে গেলাম— আকাশে জলে স্বর্গীয় আগুন লাগিয়ে সমুদ্রে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এই দৃশ্য না দেখে ডলফিনের কোচ ফিরে গেল কী করে? জমির মালিকানার মতো এরও উত্তর আমি খুঁজে পাই না।

মাসখানেক আগেই বাংলাদেশের কক্সবাজারে সূর্যাস্ত দেখে এসেছি, এখনও তা চোখে লেগে আছে, তারপর আবার এই রাধানগর বিচে সূর্যাস্ত। কক্সবাজার, রাধানগর— দুইই বঙ্গোপসাগরে।

ডলফিনের ট্যুরিস্ট কোচ আমাদের তুলে নিতে ফিরে এল, ওঁরা ঠিক সময়েই আমাদের হাত নাড়া দেখতে পেয়েছিলেন, বাস ঘোরাবার মতো জায়গা না পাওয়ায় অনেকখানি এগিয়ে তবেই বাস ঘোরাতে পেরেছেন, ফলে এই দেরি। এই পরোপকার করার পুরস্কারস্বরূপ আমি তাদের দুচোখ ভরে রাধানগর বিচের সূর্যাস্ত দিলাম।

সন্ধ্যায় ডলফিনে ফিরে জোয়ারে— ক্রমশ পাগল-সমুদ্রের ঢেউ আছড়ানোর ওপর সরাসরি এমন জ্যোৎস্না দেখব ভাবিনি। মনের এত পাওয়ার আছে, মন এতও পায়! ডলফিনের লনের মজবুত দেওয়ালের বাঁধে আছড়ে পড়ছে ঢেউ, উঁচু বাঁধের ওপর বসেও মাঝে মাঝে ভিজে যাচ্ছি জলের ঝাপটায়, সেই জলও আর জ্যোৎস্না থেকে আলাদা করা যায় না, সামনেও অনন্ত জ্যোৎস্নার ঢেউ!

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী □ ভ্রমণ জানুয়ারি ১৯৯৮

১৯৯৯ ∬ ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত

তিনটে জলহস্তী সন্ধ্যার ঝোঁকে নদী ছেড়ে হেলতে দুলতে ডাঙায় উঠল। এখন সারা রাত ওরা চরের ঘাস গাছপালা খাবে। ওপারে জাম্বিয়ার তটরেখায় তিনটে হাতি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছে, তার অনেকটা পিছনে পটে আঁকা ছবির মতো একটি জিরাফের কৌতূহলী উৎকণ্ঠিত মুখ, গ্রীবাভঙ্গি। পানীয়ের সঙ্গে খাদ্যেরও সদ্ব্যবহার হচ্ছে। বেশ জমে উঠেছে পার্টি। চারদিকে নদীর জলে আরও অনেক স্টিমার, লঞ্চ, নৌকো। একতলা দোতলা। কখনও কখনও বাক্য ছোড়াছুড়ি, কুশল বিনিময়ও হচ্ছে। বেপরোয়া একটা স্পিডবোট, সকলের পাশ দিয়ে এবং পাশ কাটিয়ে গোঁ করে বেরিয়ে গেল। উন্মুক্ত-দেহ ছেলেটির দৃঢ়বদ্ধ হাতে স্টিয়ারিং, মেয়েটি এবং তার চুল ছেলেটির গায়ে লুটোপুটি খাচ্ছে।

এবার ফেরার পালা। মাঝ দরিয়ায় ঘুরে বোট মন্থর গতিতে চলেছে। নীচে জলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। হই হুল্লোড় স্তিমিত। পিছনে সমস্ত আকাশ জুড়ে সূর্য ডুবছে। নিরক্ষরেখাস্থিত আফ্রিকার সন্ধ্যাকাশে উজ্জ্বল বলিষ্ঠ তুলির আঁচড়ে যে রং ফুটে ওঠে, পৃথিবীতে কোথাও বুঝি তার তুলনা নেই। আকাশের আলো দ্রুত কমে আসছে। মনে হয় কেউ যেন স্লাইডিং সুইচ ঘুরিয়ে হাজার বাতির প্রভা কমিয়ে আনছে। মৃদু থেকে মৃদুতর। তবু আকাশে এখনও পাখিরা উড়ে যাচ্ছে নিজ নিজ আশ্রয়ে আর জলের ভেতর থেকে চলন্ত লাল পাথরের ঢিপির মতো জলহস্তীরা ডাঙায় উঠে আসছে। জ্বলন্ত লোহার ভাঁটার মতো সূর্য নেমে এসেছে অরণ্য রেখায়— সবুজ গাছের মাথায় লাল আলো ছড়িয়ে পড়ল। সূর্য নেমে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে বনানীর গভীরে, তবু ডালপালা পাতার ফাঁক দিয়ে খণ্ড খণ্ড সূর্য দেখছি— তার দীপ্তিতে ওই দিকটা এখনও ঝলমল করছে। বাকি সব অন্ধকার। দূরে ভিক্টোরিয়া ফলস শহরের আলোগুলো জ্বলে উঠল।

পরদিন সকালে জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া। ট্যুর শুরু হয় আমাদের হোটেল থেকে ৩০০ মিটারের মতো দূরে লিভিংস্টোনের স্ট্যাচুর তলা থেকে। উল্টোদিকে খাদের ওপারে ডেভিলস ক্যাটারাক্ট— সতেরোশো মিটার চওড়া প্রপাতের পশ্চিমদিক এবং প্রপাতের নিম্নতম অংশ— উচ্চতা মোটে ৭০ মিটার। পুবদিক ঘেঁষে উচ্চতম অংশ রেনবো পয়েন্টে প্রপাতের জল ১০৮ মিটার নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ডেভিলস ক্যাটারাক্ট নিচু হলেও এখানে মস্ত সুবিধা এই যে, লিভিংস্টোনের স্ট্যাচুর পাশ দিয়ে সরু পাকদণ্ডির মতো সিঁড়ি বেয়ে খাদের ভেতরে অনেক দূর নীচে নেমে যাওয়া যায় এবং সেখান থেকে ওপরে তাকিয়ে সেই সুবিপুল জলস্রোতের অবিশ্রান্ত সংঘাত বুকের ধুকধুকি দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। ডেভিলস ক্যাটারাক্টের পাশেই লিভিংস্টোন আইল্যান্ড— এখানে দাঁড়িয়ে লিভিংস্টোন প্রথম এই প্রপাত দেখেন এবং একটা বুলেটে সুতো বেঁধে খাদের গভীরতা মাপেন। গাইড বলল, বিকেলবেলা এখানে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় এপার ওপার রামধনু ফুটে থাকে।

খাদ থেকে উঠে এসে খাদের ধারে ধারে পুবমুখো এগনো। ডানদিকে গাছপালা জঙ্গল মহীরুহের দল, বাঁদিকে ৩০ থেকে ৬০ মিটার চওড়া খাদের ওপারে জাম্বেজির বিপুল জলধারা কোথাও কাচের মতো স্বচ্ছ হয়ে, কোথাও সাদা ফেনায় টগবগ করে খাদের গভীরে লাফিয়ে পড়ছে। তার অবিরাম বজ্রনির্ঘোষ আর ঝাপটা হাওয়ায় জলকণা এসে কাপড়চোপড় ভিজিয়ে দেয়। গাইড বলল, তবু তো এখন এই অক্টোবর মাসে নদীতে জল অর্ধেকেরও কম। মে-জুন মাসে এলে ওয়াটারপ্রুফে সারা অঙ্গ না মুড়ে এরাস্তা দিয়ে চলতে পারতেন না। অবশ্য এক হিসাবে অক্টোবর-নভেম্বর ভালো। মে জুন মাসে— প্রপাতের ওপরের মেঘ এত গভীর হয় যে অনেক সময়ে খাদের এপার থেকে ওপারে প্রপাতটাই দেখা যায় না।

হরপ্রসাদ মিত্র □ ভ্রমণ অক্টোবর ১৯৯৯

২০০০ ∬ আমাজন থেকে ইগুয়াসু

প্রায়াগেরাঞ্জি দ্বীপে একটা ছোট ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। ছেলেটা খুব লাজুক, অনেক ডাকাডাকির পর নদীর কিনারে এনে আমাকেই তার লজ্জা ভাঙাতে হল। ছেলেটা জলের পোকা। জল তোলপাড় করে একা একা সাঁতরে বেড়াচ্ছে। কখনও আমাজনের ডলফিনের মতো ডিগবাজি খাচ্ছে। আমার ডাকাডাকিতে সে হাঁটু-জল অবধি এসে তীরের একটা গাছের সামান্য আড়াল নিয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বহু চেষ্টায় তার নাম জানলাম— দালিসু। ভাষার বাধায় তার মনের কথা, জীবনের কথা আমার জানা হল না। ধরা পড়া মাছ ছাড়া পেয়ে যেমন লাফ দিয়ে ফের জলে পড়ে, আমার কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে ছেলেটাও তেমনই লাফিয়ে পড়ে এক ডুবে অনেক দূরে গিয়ে ভেসে উঠেই তীরের দিকে আমাকে একবার দেখল।

দ্বীপে এক বৃদ্ধ মাচায় শুকোতে দেওয়া মাছ ঘরে তুলছে, যুবকরা গাছতলায় টিভিতে ফুটবল খেলা দেখছে, একেবারে সভ্য জগতের গ্রাম্য জীবন।

এরকম আরও কয়েকটি দ্বীপেও দরিদ্র ঘরসংসার ঘুরে দেখেছি। কিন্তু এরকমই একটা গ্রাম থেকে নদীপথে ক্যানোয় চড়ে হোটেলে ফেরার সময় আরণ্যক আমাজনের সাংঘাতিক পরিচয় পেলাম।

ক্যানোয় ব্রাজিলের দুজন সাংবাদিক ছিলেন, এটা নাকি তাঁদের প্রথম আমাজন ভ্রমণ। নৌকো চলছিল নদীর কিনার ঘেঁষে। বহুকালের প্রাচীন বড় বড় গাছের ঝুরি নদীর জল পর্যন্ত ঝুলছে, কোথাও কোথাও তীরে গাছের ডালপালা থেকে মাথা বাঁচাতে মাথা হাঁটুর কাছে নামিয়ে আনতে হচ্ছে।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ ও প্রবল ঝাঁকুনি! নৌকো এক মুহূর্ত কাত হয়ে আবার সোজা হয়ে দুলছে। কী ব্যাপার? দুই সাংবাদিকের একজন, চলন্ত নৌকো থেকে একটা ঝুলন্ত ঝুরি ধরে টান দিতেই অনেকটা মৌচাকের মতো দেখতে মস্তবড় একটা চাঁই গাছের উঁচু ডাল থেকে নৌকোর পাটাতনে আছড়ে পড়েছে। বিপদের এটা মাত্রই শুরু।

এক মিনিটের মধ্যেই দেখি হাজার হাজার ডেঁয়োপিঁপড়ে ওই ভাঙা চাঁই থেকে বেরিয়ে নৌকো ছেয়ে ফেলেছে। আমরা উঠে নিমেষে মাঝের কাঠের ফালিগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে জোরে জোরে পা ঠুকছি, একবার ডান পা একবার বাঁ পা। যাতে পা বেয়ে উঠতে থাকা পিঁপড়েগুলো আমাদের পা থেকে খসে পড়ে। যে কোনও সময় নদীতে পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা, তবু পিঁপড়ের কামড়ের ভয়ে এই মারাত্মক কুচকাওয়াজ থামানো অসম্ভব! আমাদের এই নিশ্ছিদ্র সতর্কতার সুফলও পেয়েছি— হাতে পায়ে সারা গায়ে মাত্র পনেরো-কুড়িটা ডুমো ডুমো দাগ আর পাল্লা দিয়ে চুলকানি।

আমি পরে ওই সাংবাদিকটিকে বহুবার জিজ্ঞেস করেছি, আপনি ওরকম করলেন কেন? উনি শুধু হাসেন, অর্থাৎ নিছকই কৌতূহলে। এই ছোট্ট ঘটনাতেও বোঝা যায়, আমরা কেন ও কতদূর এই পৃথিবীতে বাসের অযোগ্য।

আমাজন থেকে চলে আসার আগের দিন, আমাকেই আগ বাড়িয়ে বলতে হল, কালো জলের নিগ্রো নদী আর হলুদ জলের সোলিমওয়েস নদী যেখানে আমাজন নদীতে গিয়ে মিশেছে সেখানে আমরা কখন যাব?

পর্তুগিজ গাইড জানালেন, এবারের ভ্রমণসূচিতে এটা নেই।

আমাজনে এসে আমাজন নদীই দেখব না? তাই আবার হয় নাকি?

ঠিক হল, কাল খুব ভোরে বেরিয়ে আমাজন ছেড়ে যাবার আগে নিগ্রো আর সোলিমওয়েসের মিলনজল আমাজন নদীর সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। আমাজনে পড়েও অনেক দূর অবধি দুই নদীর কেউই তাদের নিজস্ব রং ধুয়ে ফেলেনি। দুপুরের উড়ানে আমাজন ছেড়ে রিও পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। যখন হোটেলে এলাম তখন রিওতে রাত দশটা। কলকাতায় পরদিনের সকাল ছটা।

রিওর সকাল ছটায় আবার বিমানবন্দর, এবার যাব ইগুয়াসু। ইগুয়াসু পৌঁছলাম দুপুর দুটো নাগাদ। এয়ারপোর্টেই ট্র্যাভেল এজেন্সির কাউন্টারে অল্প সময়েই সেদিন বিকেলের ও পরদিন সকালের ইগুয়াসু জলপ্রপাত দর্শনের সম্পূর্ণ ভ্রমণসূচি পেয়ে গেলাম। ন্যায্য টাকা পয়সা নিয়ে রসিদও দিয়ে দিল।

জলপ্রপাতের কাছেই ট্রপিক্যাল ডাস কাটারাটাস হোটেলে সুটকেস রেখেই সোজা চলে গেলাম এক অভাবনীয় প্রাকৃতিক মহাশিল্পের সম্মুখে। যত দূরে যাই, ধাপে ধাপে যত নীচে নামি, ততই ইগুয়াসুর পূর্ণ প্রসারিত রূপ। ছোট নৌকোয় প্রপাতের কাছে গিয়ে যতই মাথা উঁচু করে ওপরে তাকাই, আনন্দে কৃতজ্ঞতায় ততই মাথা যেন নত হয়ে আসতে চায়। প্রকৃতির এ যেন এক নান্দনিক রূপ। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার সীমানায় চিরস্থায়ী এক ছন্দ-তাল-ধ্বনি-লাবণ্যময় মহাপ্লাবনের মহানৃত্য। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় সমস্ত জীবন যদি শুধু এই রুদ্ধশ্বাস সৌন্দর্যের সান্নিধ্যে কাটানো যেত!

পরদিন সকাল সাতটায় সারাদিনের মতো তৈরি হয়ে ট্র্যাভেল এজেন্সির ট্যুরিস্ট কোচে চড়ে যেতে হবে আর্জেন্টিনা। এবার ইগুয়াসু জলপ্রপাত দেখব আর্জেন্টিনা থেকে।

আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত হোটেলের কাছাকাছি ফিরেও জলপ্রপাতের সামনে থেকে নড়িনি। ফলে সকালে ঘুম ভাঙল দেরিতে। রিসেপশন কাউন্টার থেকে টেলিফোনে ট্র্যাভেল এজেন্ট তিনবার তাড়া দিয়ে মনে হয় অপেক্ষা করছে। তাড়াহুড়োয় তৈরি হয়ে রিসেপশনে দৌড়ে গিয়ে হোটেলের সামনের চত্বরে কোনও কোচ না দেখে ভাবছি কাকে কী জিজ্ঞেস করি, এমন সময় রিসেপশনের মেয়েটি একটা স্টেপল করা চিরকুট এগিয়ে দিল। খুলে দেখি, 'সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আমরা চলে যাচ্ছি। আমাদের অফিসে যোগাযোগ করুন।'

অফিসটা কোথায়? এয়ারপোর্টে নাকি! রিসেপশনের মেয়েটিই বলে দিল, এই হোটেলেই, এই গেট দিয়ে বেরিয়েই বাঁদিকের ঘর।

সেখানে একটি আফ্রিকান মেয়ে। চিরকুটে চোখ বুলিয়েই টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলে আমাকে জানালেন, এখুনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লে আর্জেন্টিনা যাওয়ার কোচটাকে অমুক হোটেলে পেয়ে যাবে। ট্যাক্সিভাড়া? ১৮-২০ ডলারের মতো পড়বে।

তখন হিসেবের সুযোগ কোথায়? বললাম, ট্যাক্সি কোথায় পাব?

ফোন করে দিতেই এক মিনিটে ট্যাক্সি এল, আধঘণ্টায় সেই হোটেলে কোচ ও গাইডের দেখা পেলাম। সেখান থেকে দুজন নতুন যাত্রী নিয়ে, প্রায় বাসভর্তি ইগুয়াসু ফলস দর্শনার্থী নিয়ে, আমাকে নিয়ে, আমার পূর্ব-পরিচিত তিনজন ভারতীয়কে নিয়ে কোচ ছুটে চলল আর্জেন্টিনার পথে। ভারতীয় পরিবারটি ডাস কাটারাটাস হোটেলেই উঠেছেন, হোটেল থেকে যথাসময়ে বাসে চড়েছেন।

সবুজ ইগুয়াসু ন্যাশনাল পার্কের মধ্য দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ এগিয়ে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার সীমানায় বাস থামল। ইমিগ্রেশান চেকিং হবে। একটু পরেই গাইড এসে তিন সদস্যের ভারতীয় পরিবারটিকে ব্যাগসুদ্ধ নামিয়ে নিয়ে গেলেন। আমি ভাবলাম, এঁরা বোধহয় টয়লেটে যাবেন।

গাইড একটু পরে ফিরে যাত্রীদের সবাইকে নামে নামে পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে বাস ছেড়ে দিলেন, সেই ভারতীয় পরিবারটি তখনও ফেরেননি, আমি হইহই করে সেকথা জানিয়ে বাস থামাতে বললাম।

গাইড জানালেন, 'ওঁদের ট্যাক্সিতে তুলে ব্রাজিলে ফেরত পাঠানো হয়েছে।'

'কেন? ওরা কি আর্জেন্টিনা থেকে ইগুয়াসু ফলস দেখবেন না?'

'ইমিগ্রেশান পুলিশ ওঁদের আর্জেন্টিনায় ঢোকবার অনুমতি দেয়নি।'

'কেন? ওঁদের দোষের কী?'

'ওঁদের কারও আর্জেন্টিনা যাওয়ার ভিসা ছিল না।'

'সে তো আমারও নেই।'

'তোমার পাসপোর্টই দেখানো হয়নি! ডাস কাটারাটাস হোটেলের ট্যুরিস্টদের পাসপোর্ট বাসে ওঠার সময়ই জমা নিয়েছিলাম, তুমি বাস ফেল করলে, তোমার পাসপোর্ট নেওয়া হয়নি, পরেও আর আমার মনে পড়েনি।'

ভাগ্যিস, বাস ফেল করেছিলাম!

স্পিডবোটে ইগুয়াসু নদী পেরিয়ে, সুদীর্ঘ কাঠের সেতুর পর সেতু হেঁটে, ইগুয়াসুর একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে জলের ধুলোয় ঢাকা পড়ে যখন অবিরাম নৃত্যরত মহাজলপ্লাবন দেখছি, যখন পাহাড়ি সিঁড়ির পাকদণ্ডী বেয়ে একেবারে নীচে নেমে জলপ্রপাতের ওপর রামধনু দেখছি, তখন একথা ভেবে আরও আনন্দ হল যে বিপুল এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে দুটি দেশ কেমন ভাগাভাগি না করে নিজেরাই সেই সৌন্দর্যের বাঁধনে বাঁধা পড়ে গিয়েছে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী □ *ভ্রমণ অক্টোবর ২০০০*

২০০১ ∬ জিম করবেটের জঙ্গলে

আচমকাই শব্দহীন হয়ে গেল জিপটা। নিঃশব্দ জঙ্গলে অন্যরকম শব্দের ঝঙ্কারে সচকিত হয় প্রকৃতি। ঝিঁঝির একটানা ডাক, পাখিদের সমস্বরে হৈচৈ, মর্কটকুলের বেখাপ্পা হঠাৎ চিৎকার— সব ছাপিয়ে ক্রমশ ঘনীভূত হয় গাছের ডাল ভাঙার মটাস মটাস আওয়াজ। নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমরা বসে থাকি, আগ্রহ আর আশঙ্কার দোলায় দুলতে দুলতে।

ধানগড়ি চেকপোস্ট পেরিয়ে কিছুক্ষণ হল প্রবেশ করেছি করবেট জাতীয় উদ্যানের অন্দরমহলে। জঙ্গলের বুক চিরে কালো অ্যাসফল্টের রাস্তা। অরণ্য কোথাও গভীর, সতর্ক দৃষ্টি হেনেও কিছুই নজরে পড়ে না— এমনই ঠাসবুনোট। আবার কোথাও শুদ্ধাচারী কতিপয় মহীরুহ, অন্যের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণে ক্রমশ দীর্ঘ হবার চেষ্টায় মগ্ন। নতমুখী লতাগুল্ম যেন তাদের পা জড়িয়ে আছে। বেশ চলছিলাম। কখনও মসৃণ গতিতে, কখনও শব্দুক লয়ে, কখনও বা লাফিয়ে লাফিয়ে। মাঝে মাঝে রাস্তার অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। হঠাৎই ড্রাইভারের সশব্দ ব্রেক কষায় চমকে গেলাম।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এক দঙ্গল হাতি, কাচ্চাবাচ্চা সহ, নির্বিচারে গাছের ডাল ভাঙতে ভাঙতে এসে দাঁড়াল ঠিক রাস্তার পাশটিতে। আমাদের গাড়ি থেকে হাত কয়েক দূরে। গনগনে বৈশাখের তীব্র তাপে পিচরাস্তার দুধারের মাটি ফুটিফাটা, ধুলোর পুরু চাদর বিছানো। দলপতি হাতি শুঁড় দিয়ে সেই ধুলোকে বেশ করে উড়িয়ে দিয়ে তার ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল। তারপর গা দুলিয়ে দুলিয়ে সে কী ধুলো মাখার ধুম! পরপর লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সকলে। একজন একজন করে বেশ 'ধূলিধূসরিত নন্দদুলাল' সেজে পরের জনকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে হেলতে দুলতে ঢুকে পড়ছে জঙ্গলের ভেতরে। সম্ভবত রামগঙ্গায় গিয়ে স্নানটা সেরে নেবে।

এদিকে আমরা ন যযৌ ন তস্থৌ, আরও গোটা দুই গাড়ি এসে পড়ায় সাহস কিঞ্চিৎ বেড়েছে। তাহলেও, ঠিক নির্ভাবনায় আছি বলা যাবে না। গাড়িটাকে নিয়ে কার যে কখন ফুটবল খেলতে ইচ্ছে হবে কে জানে? ধুলোকেলি তো চলছেই, চলছে মিছিলও। সব থেকে ছোটটি চলার সময় মায়ের পেটের তলায় ঢুকে পড়ছে। মা-ও শুঁড়ে করে ধুলো নিয়ে তার সন্তানকে স্নেহভরে মাখিয়ে দিচ্ছে। ভারি দৃষ্টিনন্দন সে দৃশ্য। পরে জেনেছিলাম এভাবে ধুলো ঘষে ঘষে হাতিরা তাদের শরীরের পোকা মারার চেষ্টা করে।

প্রায় মিনিট কুড়ি চলল এই শোভাযাত্রা। বাকি পথটুকু উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে ফুটতে, হাওয়ায় ভর দিয়ে ২০ কিলোমিটার পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম ধিকালায়।

মণিদীপা বন্দ্যোপাধ্যায় □ *ভ্রমণ মার্চ ২০০১*

২০০২ ∬ অর্ধশতাব্দী আগের বদ্রীনাথ যাত্রা

সেদিন দুপুরে আমরা একটা অতি দীর্ঘ ধসের কাছে পৌঁছলাম। এইখানে পাহাড় অর্ধচন্দ্রাকার। মাঝখানে অনেকখানি ধসে গেছে। আমাদের সঙ্গে যারা গিয়েছে, তাদের পায়ে পায়ে একটা পথের ইশারা দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। নিচে ৫০০ ফুট গভীর খাদ। ভাবিনি এই জায়গাটা পার হতে পারব। বদ্রীনাথের কৃপায় ওপারে গিয়ে পৌঁছলাম। তখনও আমি ভয়ে বিধ্বস্ত। এই স্থানটির নাম পাতালগঙ্গা। এখানে কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তাদের একজন, তিনবার এই যাত্রা করেছে। সে বলল, এইখানে মাটিটা কাঁচা। প্রতিবছরই এমনই ভেঙে যায়। এবারে, গতকাল এক যাত্রী খাদে পড়ে গেছে। তার মৃতদেহের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। মনে মনে ভাবলাম এই মানুষটির কী এমন প্রার্থনা যে, বদ্রীনারায়ণের কাছে একে তিনবার আসতে হয়েছে। আমার শরীর তখনও ভয়ে কাঁপছে। ওই মরণফাঁদ পেরিয়ে আসতে পেরেছি, বিশ্বাস হয় না।

বদ্রীনাথের পথে পাহাড়গুলিতে বড় গাছ কম। যে ধরনের অরণ্যের ভূমি দেখব বলে আশা করেছিলাম তেমন কিছু দেখতে পেলাম না।

মস্ত একটা চড়াই উঠতে হল যোশিমঠে। আমরা মাঝে মাঝে চা পানের জন্য কিছুক্ষণ বিশ্রাম ছাড়া থামছি না। অনেক উতরাইয়ের পর বিষ্ণুপ্রয়াগ। দুপুরে কোথায় খিচুড়ি চড়িয়েছিলাম মনে নেই। সন্ধ্যার পরে যে চটিতে থামলাম তার নাম বগোদর। সেই একই রুটিনে এখানে রাত্রিযাপন হল। সকালে আবার যাত্রা শুরু। তখন আমাদের মন অধীর। আজ বিকেলের আগেই পৌঁছে যাব আশা করছি।

মাঝে মাঝে কোনও যাত্রীদলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছি, আবার কখনও কোনও যাত্রীদল আমাদের ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। ওদিক থেকেও কিছু যাত্রী আসছে। সব দলের মুখে এক আওয়াজ 'জয় বদ্রীবিশাল কী'!

কোটদ্বার পৌঁছবার পর থেকে যে দুর্ভাবনা ও টেনশন শুরু হয়েছিল এখন হঠাৎ তার থেকে মুক্তি পেয়ে গিয়েছি। আর কোনও বাধা আমাদের আটকাতে পারবে না। অনিশ্চয়তার আশঙ্কা নেই, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ মনে শেষের দশ মাইল পার হচ্ছি। শুনেছিলাম পথে বরফ পাব। কিন্তু প্রবল বর্ষণে রাস্তার ওপর থেকে বরফ ধুয়ে গিয়েছে। পাহাড়ের ওপরে, আমাদের নিচে, নদীতে নামবার পথে এখনও বরফ জমে আছে। ওপারের পাহাড়ের ওপর বরফ ছোট ছোট হিমবাহ তৈরি করেছে। যাত্রীসংখ্যাও বেশি দেখছি এখানে। সাধু-সন্ন্যাসী, ভিক্ষুকের সঙ্গে সাধারণ গৃহস্থ মানুষেরাও হেঁটে চলেছেন পাশাপাশি। সবারই এক অভীষ্ট, বদ্রীনাথ। মুখে 'জয় বদ্রীবিশাল কী' ধ্বনি। দুটি সম্পন্ন মারোয়াড়ি পরিবার চলেছেন দাস-দাসী সঙ্গে নিয়ে। তাঁদের গৃহিণীরা ডুলিতে, পুরুষরা পদব্রজে, অল্পবয়সীরা টাট্টু নিয়েছে, শিশুরা দাসদাসীদের কোলে। সবাইকে প্রফুল্ল দেখছি। আশপাশে মানুষজন, প্রকৃতি— যা দেখছি, সবার মধ্যেই প্রফুল্লতা সঞ্চারিত হয়েছে। এমনই হয়, অনেক কষ্টের পর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলে আনন্দের সীমা থাকে না। সবাইকে সেই আনন্দের ভাগ দেবার ইচ্ছা হয়।

হনুমান চটি থেকে শেষ পাঁচ-ছ মাইল প্রচণ্ড চড়াই। শরীরের কষ্ট হৃদয়ের

আনন্দকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। তবু কারও ক্লান্তি নেই, যত দ্রুত পারে হেঁটে চলেছে।

এখানে সূরজপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হল। সে বদ্রীনাথ মন্দিরের পাণ্ডা। বদ্রীনাথ থেকে এতখানি এগিয়ে এসেছে যজমান ধরবার জন্য। মানুষটি ভালো। বলল, আপনাদের আর কিছু ভাবতে হবে না। আমি আপনাদের ভার নিয়েছি, আপনাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেখা আমার কাজ। আমরা পাঁচ পুরুষের পাণ্ডা।

সূরজপ্রসাদ আমাদের দেখভালের কোনও ত্রুটি রাখেনি। তার বাড়িতেই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু আমরা আরও ভালো জায়গা চাওয়াতে, সে-ই আমাদের অন্ধ্র ধর্মশালায় থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ব্রহ্মকুণ্ডের ঠিক ওপরেই এই বাড়িটি। উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল মুনশিজির জন্য গত বছরই তৈরি হয়েছে। দুটিমাত্র শয়নকক্ষ। তারই একটায় আমরা উঠেছিলাম।

ঈশ্বর বোধহয় মানুষকে অনেক কষ্ট দেন, তার সুখের স্বাদ গভীর করবার জন্য। আমরাও যখন আর চড়াই উঠতে পারছি না, তখন হঠাৎ দূরে, কিছু নিচে সবুজের ছোঁয়া মাখা উপত্যকার একপ্রান্তে, আমাদের আরাধ্য দেখতে পেলাম। সূরজপ্রসাদ বলল, এই স্থানটির নাম দেবদেখানি। আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। তাহলে আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হল। বিশ্বাস হতে চায় না, বরফমণ্ডিত দুই শিখরের নিচে, ছোট্ট মন্দিরটি বদ্রীনাথের। হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের সব প্রান্ত থেকে যাত্রীরা এই মন্দিরে আসার জন্য প্রাণ বিপন্ন করতে দ্বিধা করে না, ভক্তির অমোঘ আকর্ষণ তাদের টেনে আনে।

সামনে সেই বদ্রীনাথের মন্দির। সমস্ত অবসাদ যেন মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। দুপুরের সূর্য যেন আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে নীলকণ্ঠ পর্বতে। তার নিচে বদ্রীনাথের সোনার চূড়া।

জয় বদ্রীবিশাল কী!

প্রতাপকুমার রায় □ ভ্রমণ অক্টোবর-নভেম্বর ২০০২

২০০৩ // তুন্দ্রার তৃণ

আবার সেই তুষার মেরুভূমির উট জিপগাড়িতে চড়ে আমরা বেরলাম। এখানে দুটিই মাত্র গাড়ি আছে। একটি মালবহন করে, একটি মানুষ। অয়েল রিগ দেখতে যাব। যে পুণ্য কুয়োতলায় প্রথম পেট্রোলিয়াম পাওয়া গিয়েছিল, সেই রিগটি এখনও অক্ষত, যত্ন করে রাখা আছে, যদিও সেটার ছাদ নেই। একমাত্র সেটিতেই ছাদ ছিল না। আরও দূরে, অন্য অন্য নতুন যেসব কূপ খনন করা হয়েছে সেখানে বেশি কর্মশক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি লেগেছে, সেগুলিতে ছাদ আছে। এখান থেকেই শুরু হয়েছে সেই বিখ্যাত ট্রান্স-আলাস্কান পাইপলাইন। আর্কটিক সার্কেলের মধ্যে তিনশো মাইল গভীরে চলে এসেছি। মোটা মোটা পাইপ পাতা রয়েছে সাদা বরফের ওপরে। কলকাতায় রাস্তায় যেমন বড় বড় পাইপের কাজ হয়, যার মধ্যে আমাদের নামহীন পথবাসীদের ঘরকন্না, রোদবৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচিয়ে— তার চেয়েও স্থূল আরও বিশাল বিশাল পাইপ। একটির ধারে একটা স্তম্ভ— সেটি মাইলস্টোন, তাতে 'জিরো-মাইল' লেখা। অর্থাৎ এখান থেকেই যাত্রা আরম্ভ হল। ভালডেজে গিয়ে যাত্রা থামবে। সেখানে মাইলস্টোনের গায়ে '৩০০০ মাইল' লেখা আছে। শুরু দেখলুম, কপালে ছিল, শেষও দেখা। এরপরে আমি 'ভালডেজ'-এও গেছি। অ্যাংকোরাজ থেকে আমি একটি চমৎকার ট্যুরিস্ট ট্রিপ নিয়েছিলুম জাহাজে আর বাসে মিলিয়ে— প্রধানত জাহাজে— তাতেই ভালডেজ পর্যন্ত গিয়েছি। সেখানেই রাত্রিবাস করেছিলাম। একটি এস্কিমো মেয়েও ছিল সেখানে— তারও নামটি সুবিধার জন্য মার্কিনি করা। সেই ট্রিপটিতে আমি যে কী না দেখেছি, কী না শিখেছি। সেটায় অবশ্য এই আর্কটিক ট্রিপের মতো জেদ ধরে শাড়ি পরে যাইনি— জিনস-শার্টই ছিল। আর্কটিকের মানুষজন, জীবজন্তু, উদ্ভিদ যেমন আমি দেখিনি, তারাও তো শাড়িপরা মেয়ে দেখেনি, দেখুক একটু! ফেয়ার-এক্সচেঞ্জ হবে।

তা সেটি হয়েছিল। শাড়ির জন্য কমপ্লিমেন্ট আমরা চিরদিন পেয়ে আসছি। সেই ১৯৫০-এ আমার মা-কে দেখেছিলুম, সর্বক্ষণ পথেঘাটে স্ত্রী-পুরুষের কাছে শংসাবার্তা পেতেন। আমিও ১৯৫৯ থেকে সেটি পেতে শুরু করেছি— কিন্তু এখানে সত্যি সত্যি কেউ কোনওদিনও শাড়ি পরিহিত মনুষ্য-মূর্তি দর্শনই করেনি। এবং এই অতল নিঃসীম বরফের মধ্যে ফিনফিনে শাড়ি! প্রত্যেকেই এসে প্রশ্ন করছেন, আর ইউ কোল্ড? বাঙালিনীদের দেওয়া কোমর পর্যন্ত লম্বামোজা, মোটা উলের টাইটস পরেছি পেটিকোটের নীচে। তাই ফুরফুরে লাল-সাদা প্রিন্টেড নাইলনের পাতলা শাড়িটি দেখে সকলেই বিভ্রান্ত হচ্ছেন। জানেন না কেউ টাইটসের ওপরেও হাঁটু অবধি স্টকিংস আছে! বেচারি ঠান্ডা ঢুকবে কোথা দিয়ে? এমন কিছু ঠান্ডা ছিলও না— বাতাস না বইলে তো ঠান্ডাটা কষ্ট দেয় না। হাওয়াটাই যা প্রাণঘাতী, নাকচোখ যেন কেটে ফেলে, তীক্ষ্ণ শান-দেওয়া ছুরির ফলার মতো হাওয়া। হাওয়া না বইলে চমৎকার। ওইদিন আমরা হাওয়ায় তেমন কষ্ট পাইনি। হাওয়া বইলে বাইরে থাকাও যায় না, স্নো ওড়ে, কিছু দেখাও যায় না। দেখার অবশ্য ছিলই বা কী? — 'ক্যারিবু হরিণেরা এখনও বিশেষ বেরোয়নি খাদ্য খুঁজতে, হাঁসেরাও তেমন উড়ে আসেনি এখনও, ফুলও ফুটছে না ঘাসে ঘাসে।'— বলল জো। ফুল? ঘাসই তো দেখছি না। ঘাস কই? 'ওই যে, ওই তো ঘাস।' ঘাস? কই ঘাস? বরফের ওপরে চৌকো একটুকরো পাপোশ পাতা আছে দেখলাম। ব্রাউন রঙের। যেমন হয়, বনেদি ছোবড়ার পাপোশ। ওখানেই হঠাৎ কেন পাপোশ পাতা? কোনও দরজা তো নেই সামনে। দরজা কেন, কোনও ঘরবাড়িই তো নেই। পাপোশ শুকোচ্ছে একটা বরফের মাঠের মাঝখানে। আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা এ দেশের। 'ওটা তো পাপোশ। ম্যাট তো ওটা।'

'না, ওটাই ঘাস। তুন্দ্রা-গ্রাস। ম্যাটলাইক ভেজিটেশন'—

'আমি নামব। আমি দেখব। কাছ থেকে দেখব। গাড়ি থামাও।' গাড়ি থামতেই— আমি তো লাফিয়ে নেমে হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে পড়েছি পাপোশের ওপরে, ঘাসের ঘাসত্ব দেখব বলে। আরে, সত্যি তো? কুচি কুচি ব্রাউনরঙের ঘন ঘন ঘাসই তো! আমাদের দেশে রোদে শুকিয়ে গেলে ঘাসের যে অবস্থা হয়, তেমনই। শুষ্কং তৃণং তিষ্ঠত্যগ্রে! আমি হাত বাড়িয়েছি, একগুচ্ছ তুন্দ্রার তৃণ তুলে নিয়ে যাব মার জন্য, পিকো-টুম্পার জন্য, মাদুলি করে রেখে দেব জন্মের শোধ— তুন্দ্রার তৃণগুচ্ছ বলে কথা— সবাইকে তাক লাগিয়ে দেব... জো খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেলল সজোরে এবং কঠিন স্বরে বলল, 'একেবারে ছোঁবেন না।' স্পর্শ করা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। তুন্দ্রা গ্রাস হচ্ছে অমূল্য জাতীয় সম্পদ— সুরক্ষিত! শুধু ক্যারিবু হরিণরা আর হাঁসেরাই ওতে মুখ দিতে পারে— আপনি হাত দিলেই পুলিশে বিশাল জরিমানা করবে আপনাকে', মাত্র একটাই তৃণের কণা নিলে কি এমন ক্ষতি হত? তুন্দ্রা-তৃণেরও তো ভারতবর্ষে যাওয়া হয়নি কোনওদিন? এত বড় একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটত, জো, আপনি তাতে বাধা দিলেন? কিন্তু বাধা তো দেওয়া হয়েই গিয়েছে। এবং সি বি এস নায়ক-নায়িকা এতক্ষণে আমার একটা বন্য, গ্রাম্য কর্ম দেখে সত্যিই পরিতৃপ্ত। চোখেমুখে উন্নততর প্রাণী হওয়ার তৃপ্তিসুখ ফেটে পড়েছে এতক্ষণে। সমস্যা হচ্ছিল, এই গাঁইয়া ভারতীয় লেখিকা আর তাঁরা সমান সমান মর্যাদা পাচ্ছিলেন— তাঁরা আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করছিলেন না। ওই একবারই যা ভিজিটিং কার্ড দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল মাত্র। ওদের সঙ্গে আরও একজন গাইড থাকায়, ওদের আর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজনও হচ্ছিল না, যদিও আমরা একই গাড়িতে। একই সঙ্গে। এবং ধুধু মেরুপ্রান্তরে শুধু আমরা ছাড়া ভিন্ন জনপ্রাণী ছিল না।

আমি সমুদ্রের তীরে যেতে চাইলুম— পাশেই তো আর্কটিক ওশান। সমুদ্রে একটু নামতে হবে না? এটা তো সামার। সেদিন সূর্য ছিল না। যদিও দিবালোক ২৪ ঘণ্টাই। সেদিনটা ছিল মেঘলা। সামারে 'বিচ'-এ যাব না? মেরু অঞ্চলে আছি বলে কি পৃথিবীতে নেই?

জো বলল, 'চলুন বিচ-এ নিয়ে যাচ্ছি। তবে বিচ-এ নয়, আমরা সমুদ্রেই ছিলাম এতক্ষণ। ওই অয়েল-রিগ তো সমুদ্রবক্ষেই। — 'সমুদ্রবক্ষে?'

— 'এখন তো সমুদ্র ফ্রোজেন। গলতে গলতে জুলাই-আগস্ট। তারপরই আবার ফ্রিজ করে যাবে। এখানে ষাটদিনের সামার। ষাটদিনের জন্য বসন্ত আসে, ওই ঘাসেই ঘাসফুল জন্মায়, ভারি সুন্দর দেখায়, পাখি আসে, হরিণ আসে। কোথাও কোথাও আর্কটিক অক্স, আর্কটিক ফক্স, আর্কটিক হেয়ার— এসবও আসে, তবে 'প্রুডহো বে'-তে আমি তো শুধু ক্যারিবু, আর হাঁসই দেখেছি নানারকমের'।

—সমুদ্রে জাহাজ লেগেছে। দূর থেকে মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। পর পর অনেকগুলি মাস্তুল। বন্দর।

— 'ফ্রোজেন সমুদ্র। তো জাহাজগুলো কেমন করে এল?'

জো হেসে উঠল। 'ওরা কি এখন এসেছে? গত সামারে এসেছিল। এই সামারে ফিরবে। ওরা তো ফ্রোজেন হয়ে আটকে রয়েছে।' 'আমি দেখব! আমি দেখব!' সি বি এস দম্পতি আমার আদেখলে পাগলামি সহ্য করতে না পেরে ঘরে ফিরে যাওয়া মনস্থ করলেন। এর চেয়ে সেখানে একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে বসে দুজনে গল্প করলেও কাজে দেবে। ওঁরা ফিরলেন। আমি চললুম ফ্রোজেন জাহাজ দেখতে।

সত্যি সত্যি জাহাজগুলো পাশাপাশি জমাট বাঁধা বরফের ঢেউয়ের মাঝখানে আটকে রয়েছে, জাহাজের বুক পর্যন্ত বরফে ডোবা। ঠিক যতটা জলে ডোবা থাকে আর কী। আমি বীরগর্বে থপ থপ করে অন্যের বুটজুতো পরে বরফ ভেঙে গিয়ে জাহাজের পাশে ঘেঁষে দাঁড়ালুম। মাঝসমুদ্রে এভাবে জাহাজের পেটে হাত বুলোনোর সুযোগ তো আর পাব না, যেন পোষা বেড়ালের গায়ে, কিংবা গরুর গলকম্বলে হাত বোলাচ্ছি।

নবনীতা দেব সেন □ *ভ্রমণ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৩*

২০০৪ ∬ বোর্নিওর আদিম জঙ্গলে

এক আদিম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। মাথার ওপরে বড় বড় গাছের ঘন চাঁদোয়া বা ক্যানোপি। প্রত্যেকে প্রত্যেকের গায়ে গায়ে এমনভাবে জড়ানো যে নিরক্ষীয় অঞ্চলের গনগনে সূর্যালোক সেই দুর্ভেদ্য চাঁদোয়ার আবরণকে ছিন্ন করে জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারে না। সকাল ১০টায় যখন মাথার ওপর চাঁদিফাটা সূর্য, ঠিক তখন জঙ্গলে ঢুকলে মনে হবে যে মাত্র সকাল হচ্ছে বা সন্ধ্যা নেমে আসছে। অথচ জঙ্গলের ভেতর প্রচণ্ড আর্দ্রতা। আধ ঘণ্টার মধ্যেই শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে। আর সর্বক্ষণের সঙ্গী ঝিঁঝির ডাক। মাঝেমধ্যে সামা পাখির মিষ্টি মধুর ডাক। অর্ধেক পথ যাওয়ার পরে একটি ওরাংউটান গাছ থেকে নেমে এল। বেশ কিছুটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সে আমাদের অনুসরণ করতে লাগল। ফেরি বলল যে সেটি একটি স্ত্রী ওরাংউটান, নাম প্রিন্সেস। যাচ্ছে ফিডিং স্টেশনে খেতে। বেশ অনেক পরে সে আবার শাখাচারী হয়ে অন্য পথে এগোতে লাগল। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর বনপথ একেবারেই মানুষের হাঁটার অযোগ্য। তাই লম্বা লম্বা কাঠের পাটাতন দুই সারিতে বসিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ করে এগুলির ওপর দিয়ে খুব সাবধানে এগোতে হয়। একটু অসাবধান হলেই পা হড়কাবার সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে তোলে ওরাংউটানদের গাছের ওপর থেকে ছুড়ে ফেলা কলার খোসা। এই পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গাছে গাছে ওরাংউটানদের লাফালাফিকে সঙ্গী করে একসময়ে পৌঁছে যাই ফিডিং স্টেশনে। এক বিশাল খাদ্যযজ্ঞ সেখানে। নানা বয়সি ওরাংউটানের মেলা বসে গিয়েছে। কেউ মাটিতে বসে, কেউ গাছে খাবার নিয়ে গিয়ে খাচ্ছে। এক জায়গায় একটা ছোট বেঞ্চ পাতা পর্যটকদের জন্য। কিন্তু বসেও শান্তি নেই। হয় ওরাংউটান গাছের ওপর থেকে খাদ্যাংশ ছুড়ে মাথায় ফেলবে নয়তো বেঞ্চের যে অংশে বসে আছি সেখানেই তারা বসতে চাইবে। এমনভাবে এগিয়ে আসবে যে উঠে যেতেই হবে পর্যটকদের। রাজা উইন এল। এসেই সোজা উঁচু পাটাতনটিতে চড়ে বসল। দলের অন্য কারও তখন আর ওখানে বসার অধিকার নেই। অন্য কোনও পুরুষ ওরাংউটান তার ধারেকাছেও আসে না। সে এখানকার একমেবাদ্বিতীয়ম। কিছু স্ত্রী ওরাংউটানও দেখলাম। অন্তত দুজনের কাছে একটি করে বাচ্চা ছিল। একটু পরে হঠাৎ এক নাবালক একটা দুধের বালতি অন্য একজনের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গাছের অনেকটা উঁচুতে উঠে গেল। ওখানে উঠে খাওয়ার পর সে পাত্রটা হাতে ধরে রইল। একসময় হঠাৎ পাত্রটা নীচে দুম করে ছুড়ে ফেলে দিল। দেখলাম কলাই সবার প্রিয় খাদ্য। খুব খাচ্ছে। সব মিলিয়ে অসাধারণ দৃশ্য। এ দৃশ্য সারাজীবনেও ভোলার নয়। ফিডিং দেখে ফেরার পথে তথ্যকেন্দ্রে এসে দেখলাম দুটো গিবন তারে ঝুলে ঝুলে খেলা করছে। আমি তাদের ছবি তুলতে লাগলাম। হঠাৎ একটা গিবন লাফ দিয়ে আমার গায়ের ওপর পড়ে আর কি! আমি চকিতে সরে যেতেই সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল এবং ফেরির ঘাড়ে হাল্কা করে মারল একটা চাঁটি। আদরের বহিঃপ্রকাশ। রাতের বেলায় ক্লটকের ছাদ থেকে অসাধারণ পরিষ্কার বিষুববৃত্তের আকাশ দেখলাম। তারায় তারায় আকাশ ভেঙে পড়ছে। লালগ্রহ মঙ্গল খুব কাছে এবং উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

অর্পিতা চক্রবর্তী □ *ভ্রমণ অক্টোবর ২০০৪*

২০০৫ ∬ অকল্পনীয় আন্টার্কটিকা

এতক্ষণ অসীম সমুদ্রে দিগ্বিদিকহীন ভাসছিলাম। এখন দূরে তুষারময় স্থলভূমি দেখা যাচ্ছে। এগুলির নাম শেতল্যান্ড আইল্যান্ডস। শেতল্যান্ড দ্বীপমালা।

১৩ নভেম্বর অর্থাৎ যাত্রার চতুর্থ দিনে আমরা সমুদ্রের যে অংশে এসেছি, তাকে বলা হয় কনভার্জেন্স। অর্থাৎ সঙ্গম। এই অঞ্চলে আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগর এসে মিশেছে। সমুদ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত, হাওয়াও উদ্দাম নয়। আগের রাতেই ঘোষণা হয়েছে, আজ প্রাতরাশের পর নটার সময় আমরা স্থলভূমি স্পর্শ করব। সবাই পাঁচ নম্বর ডেকে বেরবেন ডানদিকের দরজা দিয়ে। সাবধানে নামবেন, ডেক পিচ্ছিল হতে পারে। জাহাজের গা বেয়ে অস্থায়ী সিঁড়ি দিয়ে সন্তর্পণে নামবেন, নীচে জোডিয়াক অপেক্ষা করবে। প্রত্যেক জোডিয়াকে আট বা দশজন যাত্রী নেওয়া হবে। যেখানে গিয়ে নামবেন আপনারা, সেখানেও আপনাদের সাহায্য করবার জন্য আমরা কয়েকজন দাঁড়িয়ে থাকব। শেতল্যান্ড দ্বীপমালার এই দ্বীপটির নাম হাফ মুন আইল্যান্ড।

পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। আজও তাই হল। সব ধড়াচূড়া পরে, তার ওজনে নত হয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ালাম। ডেকে বেরতেই অতি শীতল ও তীব্র ঠান্ডা হাওয়া ধাক্কা দিয়েছিল। এখন হাল্কা বরফ পড়ছে। আশ্চর্য, বরফ এত হাল্কা হয়, যেন পেঁজা তুলোর মতো হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। আমাদের পরস্পরের পোশাক দেখছি, সবাই যেন ছদ্মবেশী স্কট কিংবা শ্যাকলটন। মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বলা চলে।

আমার সামনে খাড়া সিঁড়ি অনেক নীচে রবারের নৌকো জোডিয়াক পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। সিঁড়ির হাতে ধরবার রেলটা দড়ির, তাই ধরে নামতে হবে। ভাবিনি আমি নামতে পারব, জাহাজ থেকে জোডিয়াকে উঠতে পারব। এবার সেই আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। আমি অনায়াসে জোডিয়াকে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। সিঁড়ির শেষে পাটাতনের ওপর এবং জাহাজের গায়ে লাগানো জোডিয়াকের দুজন সাহায্যকারীর জন্যই এটা সম্ভব হল। কোথায় ভেবেছিলাম, নাই বা হল জোডিয়াকে নামা, এই জাহাজের ডেকে বসেই আমি সব দেখব, সেই আমি এখন জোডিয়াকে বসে। পরে বুঝেছিলাম, মাটিতে না নামলে কিছুই দেখা হয় না। আমরা এতক্ষণ যা দেখছিলাম, মনে হয়েছিল অলৌকিকের পর্যায়ের, এখন মনে হল সুখের সপ্তম সর্গে পৌঁছেছি।

জাহাজকে মাঝসমুদ্রে, যেখানে জল গভীর, নোঙর করতে হয়। সেখান থেকে গন্তব্য স্থলভূমির দূরত্ব এক মাইল বা বেশিও হতে পারে। সেই জন্য জোডিয়াক। জোডিয়াক যেখানে আমাদের নামাল, পাথর ছড়ানো তীরভূমি। নামতে হল ফুটখানেক জলের ওপর। একটু এগিয়ে মাটির স্পর্শ পেলাম। ইতিমধ্যে তুষারপাত বন্ধ হয়েছে। সামনে পাহাড়ের ধরণের স্থলভূমি সম্পূর্ণ তুষারাচ্ছন্ন। নুড়ি ছড়ানো সৈকত পেরিয়ে বরফের ওপরে দাঁড়ালাম। নরম তুষার, পা বসে যাচ্ছে। সামনে একটু জায়গায় দূর থেকে কালো রেখা দেখেছিলাম, সেটা আসলে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েক হাজার চিনস্ট্র্যাপ পেঙ্গুইন। দূরে আমাদের জাহাজ দেখা যাচ্ছে। আকাশ ক্রমশ নীল হয়ে আসছে। সমুদ্রের রং কালচে নীল। আমি বেশি ওপরে না উঠে একটা পাথরের ওপর বসলাম। পেঙ্গুইনরা বেশ চেঁচামেচি করে। তাদের কলরব শুনছি নীচে বসে। আমার নিকটতম পেঙ্গুইনটি কুড়ি-পঁচিশ ফুট দূরত্বে। হঠাৎ দেখি, কয়েকটি পেঙ্গুইন উঁচু থেকে নেমে আমার পাশ দিয়ে, হয়তো দশ ফুট দূরত্ব, আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দুলে দুলে হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের কাছে চলে গেল। সেখানে একটা পাথরের ওপর থেকে একে একে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। তারা শিকারে বেরিয়েছে না সাঁতার প্র্যাক্টিস করছে বুঝতে পারিনি। পেঙ্গুইনদের চলার ধরন বড় বিচিত্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পায়ে সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুর মতো ঈষৎ টলতে টলতে যাচ্ছে পেঙ্গুইন। কখনও কল্পনা করিনি এত নিকট থেকে এত পেঙ্গুইন দেখব। এই স্থানটা চিনস্ট্র্যাপ পেঙ্গুইনদের বড় বসতি। শুনেছিলাম এখানে এখন হাজার পাঁচেক পেঙ্গুইন আছে।

প্রতাপকুমার রায় □ *ভ্রমণ জানুয়ারি ২০০৫*

২০০৬ ∬ ৩০ বছর আগে আন্দামানের দ্বীপে

আজ বিকেলে দেখলাম, অল্প জলে একটি অক্টোপাস। পালিয়ে যাওয়ার সময় কালি ছিটিয়ে দিল। এটা অক্টোপাস গোষ্ঠীর একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া। বড় ইলমাছ, ছোট অক্টোপাসের প্রবল শত্রু। কালি ছিটিয়ে দিয়ে তারপর অক্টোপাস নিজের শরীরটাকে প্রায় স্বচ্ছ করে ইলের চোখে ধুলো দেয়। কাটলফিশের কালি 'সেপিয়া ইঙ্ক' আগে আর্টিস্টরা ব্যবহার করতেন। ওড়িশার কোনও কোনও স্থানে স্কুইড আর কাটলফিশকে কালিভাণ্ড বলা হয়, জার্মান ভাষায় স্কুইড হল কালমার, ফরাসিতে কালামার, আর একথাটি নাকি আরবি কলম থেকে এসেছে।

এরপর দেখলাম একটা পাথরের ওপর তিনটি অক্টোপাস, দুটি পুরুষ, একটি স্ত্রী। একটু পরেই, পুরুষ দুটি নিজেদের মধ্যে জড়াজড়ি করে যুদ্ধ করতে করতে দূরে চলে গেল। এসব বইতে পড়েছি, এখন চোখের সামনে দেখলাম জীবন্ত উদাহরণ।

২-১১-৭৩। আজ ঝড়ের পর এক-দেড় ইঞ্চি লম্বা একটি সামুদ্রিক কচ্ছপ তীরের কাছে চলে এসেছে ঢেউয়ের ধাক্কায়। সামনের দুটি পা পাখনার মতো, পাখির ডানার মতো ভাঁজ করা। কচ্ছপশিশুটি বেঁচে আছে। তাকে কয়েকদিন রেখে শান্ত সমুদ্রে ছেড়ে দিই।

১০-১১-৭৩। নরেশবাবুর সাহায্য নিয়ে আমি আর রক্ষিত একটি ছোট কাঠের নৌকায় করে জনহীন দ্বীপ পাপিতা পাহাড়ে নামলাম। দা দিয়ে ঘন কেয়াঝোপ কেটে আমাদের এগিয়ে দিল মাঝি। খালি জায়গা দেখে একটি ভালো সুইস টেন্ট খাটালাম। বালিমাটিতে পেগগুলি সহজেই ঢুকে যায়। তবে তাঁবু মজবুত হয় না। নৌকা ফিরে গেল। আগামীকাল দুপুরে ফিরে আসবে। প্রবাল দ্বীপে ঘুরেঘুরে একটি জায়গায় অগভীর জলে দেখি আমাদের স্বপ্নের উদ্যান। প্রবালস্তূপে, পাথরে যেন বিরাট বিরাট রঙিন ফুল ফুটেছে। এগুলি বড় বড় সি-এনিমনি আর তার মধ্যে কত ক্লাউন ফিশ— তাদের লাল, কমলা আর সাদাটে নকশা নিয়ে। আমার সুপার-এইট মুভি ক্যামেরার ভোল বদলে দিয়েছে রক্ষিত। ওটি একটি ওয়াটারপ্রুফ লোহার বাক্সে, সামনে কাচ লাগানো। এটা দিয়ে জলের তলায় মুভি তুলব। এখন কিন্তু সেটা তাঁবুতেই আছে। ঠিক হল কাল সকালে এসে পুরো এক রোল ফিল্ম তুলব। অনেক সমুদ্র-শশা দেখলাম। সন্ধ্যায় সেই নির্জনতা উপভোগ করলাম হ্যারিকেনের আলোতে। রাতে চাল-ডাল রান্না করতে গিয়ে দেখি জনতা কেরোসিন কুকারের সলতেতে গন্ডগোল। সামান্য টিনের খাবার খেলাম।

১১-১১-৭৩। সকালবেলা সেই উদ্যানটি আর খুঁজেই পেলাম না। ডাইনে-বাঁয়ে আরও দূরে 'খ্যাপা খুঁজে বেড়ায় (ফেলে আসা) পরশ পাথর'। নির্দিষ্ট সময়ে নৌকা এসে গেল। আর একটু অপেক্ষা, তারপর আর একটু। কিন্তু মায়াহরিণের মতো সে মায়া-উদ্যান আর পেলাম না। এসে ভাটার টান। নৌকা আর যেতে পারবে না। শেষবেলায় অভুক্ত, মর্মাহত দুটি প্রাণী পৌঁছলাম নৌকা নিয়ে মাখিও বিচের বাংলোতে, তারপর বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি। এ যাত্রা আমাদের আন্ডার ওয়াটার ফিল্ম হল সমুদ্র-শশা নিয়ে, কিন্তু পরে অন্যত্র, ওই সুন্দর সি-এনিমনি-ক্লাউন ফিশ উদ্যান খুঁজে পেয়েছি আর ফিল্ম করেছি, স্বচ্ছ জলের দু ইঞ্চি ওপর থেকে। সে ফিল্ম ভালোই উঠেছিল।

রতনলাল ব্রহ্মচারী □ *ভ্রমণ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০০৬*

২০০৭ ∬ সাগরখাঁড়ির গান

এত বেশিক্ষণ আলো থাকে এখানে, চোখে লাগে। সুইডেন, নরওয়ে— সর্বত্র রাত দশটা এগারোটা বেজে যাওয়ার পরও ফ্যাটফ্যাট করছে রোদ। এই রোদ পোয়াতে পোয়াতে ডিনার খেতে বেদম অস্বস্তি হত, হাসিও পেত। যে চেহারাটা আমরা দেখে গেলাম না, সেটা হল শীতকালের স্ক্যানডিনেভিয়া— সেসময় আবার রাতের মাত্তানি বেশি। দিনের বেশিরভাগ সময়টাই অন্ধকার নিভু নিভু আলো— বরফ-টরফ মিলিয়ে সে এক বিদঘুটে ব্যাপার। বাইরে বেরনোও যায় না। সুপর্ণাদের কাছে শোনা— ইউনিভার্সিটি হোস্টেলে একাকীত্ব কাটাতে দিনের একটা সময়, জানলার বাইরে মুখ বার করে সব ছাত্রছাত্রী পাগলের মতো চেঁচায়। সেই একটানা রাতপৃথিবীতে ওইটুকুই তাদের অস্তিত্বের চিৎকার, একে অপরের সঙ্গে সংযোগের গান।

পরদিন আলো ফোটার আগেই আমরা স্টেশনে হাজির। এইবার শুরু হল নরওয়ে বেড়ানো, মানে সুপর্ণা ট্র্যাভেল কোম্পানির গাইডেড ট্যুর। যে ট্রেনটায় উঠলাম তার গায়ের রং দেখে মন ভালো হয়ে যায়। খেলনা ট্রেনের মতো, টুকটুকে লাল রং। আকাশের আজ মনমেজাজ খারাপ, তারই মধ্যে ট্রেন চলেছে পাহাড়ি পথ বেয়ে। ট্রেনটার ভেতরেও আশ্চর্য আছে হরেকরকম— আস্ত একটা কাফে, রেস্তোরাঁ। বিলু টেনে নিয়ে গেল, বিয়ার নিয়ে আমরা কাফেতে মশগুল— হঠাৎই জানলার ফ্রেমে ব্ল্যাকফরেস্ট কেক। বরফ ঢাকা পাহাড়, দুধসাদা, মধ্যিখান দিয়ে চকোলেট রঙা পাহাড়ের স্নাইস। হইহই করে সকলে জানলায়। একের পর এক টানেল, অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলেছে অনন্তযাত্রা— আর আলোর মতো বরফের শুভ্র ঝলকানি। বিলুর ছবি তোলার বাই ছোটবেলার, ক্যামেরা কাঁধে সে তাক করে রয়েছে মোক্ষম মুহূর্তের, রুকুর মতো আমরাও উত্তেজিত, সাদা পাহাড় দেখার ম্যাজিকে।

ট্রেন গিয়ে পৌঁছল শেষ স্টেশনে, জায়গাটার নাম মিরডাল। এই অবধিই রেলগাড়ি আসে, এরপর থেকে শুধুই বরফের সাম্রাজ্য। স্টেশনে নেমে থেকে সকলেরই মুখে আনন্দের, অবাক হওয়ার চিৎকার। পৃথিবীর এই শেষ স্টেশন থেকে ছাড়বে একটা মিষ্টি টয়ট্রেন। সাইজে দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেনের মতো। ধিকিয়ে ধিকিয়ে এই খেলনারেল আমাদের সমতল অবধি নিয়ে আসবে। সারা পৃথিবীর বহু মানুষ গরমের ছুটি কাটাতে আসে এদেশে— ফ্ল্যাম রেলওয়ে তাদের কাছে এক বিস্ময়। আমরা একটু একটু করে নামছি, থামছি, ট্রেন থেকে নেমে আবার উঠছি। বরফে-সবুজে ছবির মতো, স্বপ্নের মতো জায়গাগুলো সরে সরে যাচ্ছে। এভাবে প্রকৃতিকে দেখার একটা চমক আছে। সিনেমার মতো তা নতুন নতুন বিস্ময় আমদানি করে। চমকের শেষ পোঁচটুকু বাকি ছিল। হঠাৎই কানে এল প্রচণ্ড আওয়াজ, পাহাড়ি ঝরনার। তার গা দিয়ে চলেছি আমরা। ট্রেনটা থেমে গেল এমন একটা জায়গায়, যেখানে একটা বড় কাঠের প্ল্যাটফর্ম, রেলিং দিয়ে ঘেরা, নেমে দেখবার জন্য। জলের আওয়াজ এত তীব্র, পাশের লোকের কথা শোনা যাচ্ছে না কিছুই। চোখের সামনে যে জলস্রোত নামছে, অত বিশাল, অত বিপুল জলরাশি আমি জন্মে দেখিনি। রেলিংয়ের সামনে দাঁড়ানো যাচ্ছে না, জলের ছিটে এসে স্নান করিয়ে দিচ্ছে সকলকে, ফটো তোলা তো দূরঅস্ত। রুকু চিৎকার করছে, আমরাও, এমনকি চেঁচিয়ে উঠছে সাহেবসুবোর দলও— রেলগাড়ি চেপে এমন আশ্চর্য দেখেনি কেউ আগে।

এমন সময় শোনা গেল খুব অদ্ভুত এক গান। সুর বেজে উঠছে পাগলপারা ঝরনার পিছন থেকে, দূরদেশের সেই অচিনসঙ্গীত বিজাতীয় ভাষায় যেন কথা বলছে আমাদের সঙ্গে, আলাপ পরিচয় সেরে নিচ্ছে। যতদূর চোখ যায়, জলের ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম এক মহিলাকে। নরওয়েজিয়ান বাহারি পোশাকে তিনি নেচে চলেছেন ওই গানের তালে আপন ভঙ্গিমায়। প্রত্যেকদিন ট্রেন এসে দাঁড়ালে, বেজে ওঠে এমন গান, নেচে ওঠেন এমন কোনও নর্তকী... বড় দুর্গম তাঁর নাচ, বড় অনন্য তার উপস্থিতি। আবছায়ায় ভালো করে দেখা হয়নি তাঁকে, শুধু বাঁশি শুনেছি।

ঘোরলাগা একপাল মানুষ গিয়ে পৌঁছল ফ্ল্যাম স্টেশনে। ছোট্ট একরত্তি স্টেশন, তার গায়ে লেগে আছে সমুদ্র। এই জলে ভেসে গেলে উত্তর মেরু পৌঁছনো যায়। ফ্ল্যাম স্টেশনের ঘাটে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে বরফসাদা জাহাজ। আমরা এবার এই জাহাজে ভেসে পড়ব নতুন কোনও ঠিকানায়। এই বেড়ানোর কথা সুপর্ণা আমাদের আগেই বলেছে। সং অব দ্য ফিয়র্ডস। সাগরখাঁড়ির গান। যে পৃথিবীতে বাস করি, ইতিহাস-ভূগোলের তার প্রায় কিস্যুই জানি না— নইলে জানা উচিত ছিল, পাহাড়ের কোল ঘেঁসে ঘেঁসে, পৃথিবীর সবচেয়ে সঙ্কীর্ণ খাঁড়িপথ এই নরওয়েতেই।

ডেকের ওপর আমরা পজিশন নিয়ে তৈরি। যদি তিমিমাছ দেখা যায়! বলা তো যায় না, যদি একপিসও গভীর সমুদ্র থেকে ছিটকে চলে আসে এই খাঁড়ির জলে। জাহাজ চলল, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল একটা দারুণ ব্যাপার। পাড়ের ধারে ছিল যত সিগাল, তারা সবাই উড়তে উড়তে চলল আমাদের সঙ্গে। আমরা যে এসেছি তাদের দেশে, সেইজন্য যেন অভিবাদন জানাতে জানাতে চলল তারা। যাত্রীরা

সবাই তাদের জন্য ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগল কেকের টুকরো, স্যান্ডউইচের অংশ। ক্যাচ ধরার অসম্ভব ক্ষমতা এদের। একটাও মিস হয়নি একবারও। সামুদ্রিক পাখিগুলোর গায়ের রং ধবধব করছে সাদা, এমন জেল্লা, রোদ পিছলে যায়। তেমন বাহারি ঠোঁট তাদের, সবকিছুই বড্ড নিখুঁত— কোন রমেশ পাল যে গড়েছেন এদের কে জানে! তবে এই সুন্দরেও কুৎসিত হচ্ছে তাদের গলার আওয়াজ। উরে বাপ! ক্যাঁ ক্যাঁ করে মাথা খেয়ে নেয়। ঝগড়াঝাটিতে নামিয়ে দিলে খেস্তিপিসিও পালাতে পথ পাবে না। এই চিড়িয়া-খানা পর্ব শেষ হওয়ার পর লোকে একটু থিতু হল, দূরবীন বাগিয়ে, ক্যামেরা উঁচিয়ে তারা তাক করে পাহাড়ি ঝরনার দিকে— খাঁড়ির দুপাশে ঘন সবুজরঙা পাহাড়, তার গা দিয়ে অঝোরে নেমে আসছে অজস্র জলস্রোত, বড় অবাধ সে ঝরনার গান— সং অব দ্য ফিয়র্ডস।

অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় □ ভ্রমণ অক্টোবর-নভেম্বর ২০০৭

২০০৮ ∬ আইসল্যান্ড ভ্রমণের বৃত্তান্ত

বাস থামল পাহাড়ের ওপরে এক গিরিখাতের ধারে। প্রশস্ত সমতল জায়গায় আরও কয়েকটি বাস দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ হাতে পাহাড়ের একটা অনেক উঁচু ধাপ, ডান হাতে গভীর গিরিখাত। সামনে দেখা যাচ্ছে খুব বড় একটা জলপ্রপাত। সংকীর্ণ জলপ্রপাত নয়, নায়াগ্রা জলপ্রপাতের মতো অনেকটা প্রশস্ত। ঠিক ওইরকম থালার মতো সমতল পাহাড়চূড়া থেকে বিপুল জলরাশি সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নীচে। ছোট ছোট পাথর বিছানো সমতলে মাঝে মাঝে এখানে সেখানে বরফ জমে থাকায় চলার পথ পিচ্ছিল। সাবধানে পা ফেলে ফেলে ছুটলাম ঝরনাকে লক্ষ্য রেখে।

এই হল আইসল্যান্ডের বিখ্যাত গালফোস জলপ্রপাত। জলপ্রপাত আর আমাদের মাঝখানে গভীর গিরিখাত। গিরিখাত বরাবর দড়ি বেঁধে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তাকে সমতল ধরলে, ৩২ মিটার উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে ৭০ মিটার নীচে গিরিখাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলপ্রপাতের জল। সেই গভীর গিরিখাতের তলদেশে, জলপ্রপাতের পদতল ছুঁয়ে ওপরে উঠে আসছে শুভ্র মেঘমালার মতো ভাসমান বারি বিন্দু। যেন খুব ঘন কুয়াশা পড়েছে। তার স্পর্শে বাতাস হিমশীতল হয়ে আছে। এক ফালি বিদায়ী নরম সূর্যরশ্মি ঝরনার জলে মিশে সোনালি রঙের আস্তরণ তৈরি করেছে। তাই বুঝি এই ঝরনার নাম হয়েছে সোনালি জলপ্রপাত। গালফোস কথার অর্থ সোনালি।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ধাপে উঠে যাওয়া হল গালফোস কাফেতে। খাওয়া-দাওয়া হল। কাফের পাশেই উপহার সামগ্রীর দোকান। আমার প্রদর্শনী আলমারি সাজাবার জন্য কিছু কেনাকাটা করলাম।

পাহাড়কে অনেক দূরে রেখে বাস চলেছে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছুটা দূরে দূরে সাদা ধোঁয়ার মতো কী যেন মাটি থেকে ওপর দিকে উঠে বাতাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কী ওগুলো বুঝতে পারছি না। কখনও ধোঁয়া একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে আবার কখনও নতুন করে ধোঁয়া উঠছে। কৌতূহলী দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইলাম ধোঁয়ার দিকে। কী ব্যাপার! কোনও কারখানা? পাহাড়ি পথটাকে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে বাস ক্রমশ এগিয়ে চলেছে ওই ধোঁয়ার উৎসের দিকে।

বাস থামল। ভীষণ কৌতূহল। তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে আছাড় খেলাম। একটা পাথরের ওপর লেখা আছে গিজার, ড্যানিশ ভাষায় Geysir, ইংরিজিতে Geyser।

এই হল আইসল্যান্ডের প্রসিদ্ধ গিজার। চারদিকে প্রচুর উষ্ণপ্রস্রবণ ছড়িয়ে আছে। একটু দূরে একটা বড় আকারের গিজার। তাকে ঘিরে ছোট ছোট অনেকগুলো। বড়টার কাছেই দর্শকের ভিড়। এগিয়ে চললাম ওই দিকে।

ভূ-পৃষ্ঠের জল মাটির নীচে অনেক গভীরে উষ্ণ মাটি আর পাথরের সংস্পর্শে এসে উত্তপ্ত হয়। সেই উত্তপ্ত জল মাটি ভেদ করে ওপরে এসে প্রস্রবণের রূপ নেয়। এর গোলাকৃতি মুখগহ্বরের পরিধি প্রায় ৬০ ফুট এবং গভীরতা ৪ ফুট। একটা মস্ত বড় কড়াইয়ের মতো, তাতে সব সময়ই জল ফুটছে। এক বাটি দুধ উনুনের ওপর চাপিয়ে দিলে দুধটা গরম হয়ে একটু একটু করে ফুলে ফুলে যেমন করে ওপর দিকে উঠতে থাকে, মুখগহ্বরে ফুটন্ত জল ঠিক তেমনি ভাবে একটু একটু করে উঠতে উঠতে হঠাৎ হুস করে ওপরের দিকে উঠে যায় তীব্র বেগে, পিচকারির মতো। প্রায় ২০০ ফুট পর্যন্ত ওপরে উঠে যায়। তুবড়ির মতো চারদিক ছড়িয়ে পড়ে গরম জল। ৩-৪ মিনিট অন্তর অন্তর এমন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটছে। ভীষণ গরম জল, এক ফোঁটা গায়ে পড়লে রক্ষা নেই। তাই নিরাপত্তার জন্য চারদিকে গোল করে লোহার খোঁটা পুঁতে মোটা দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে গিজারকে। অনন্তকাল ধরে এমনই হয়েই চলেছে। এর আদি কেউ দেখেনি, অন্ত বুঝি নেই। পৃথিবীর আর কোনও দেশে এ জিনিস নেই। প্রকৃতির কী অপরূপ সৃষ্টি। অপার বিস্ময়ে চেয়ে থাকি। চারদিক থেকে ক্লিক ক্লিক শব্দে ক্যামেরা ঝলসে উঠছে। উহ! এর ছবি নিয়ে যেন আশ মেটে না। নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেছে। সঙ্গীরা চলে যাচ্ছে বাসের দিকে। আমার যেতে মন চায় না।

শঙ্করঞ্জন রায়চৌধুরী □ ভ্রমণ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৮

২০০৯ ∬ স্বর্গের কাছাকাছি জনপদ

বাড়ির তিনটে গরুর দোয়ানো দুধ রাখা থাকে রান্নাঘরে। বাড়ির সকলের খাবার মতো দুধ রেখে ইনি বাঁশের মন্থনদণ্ড দিয়ে ঘুঁটে ঘুঁটে বাকিটা থেকে মাখন তোলেন সারা সকাল। এক ডেকচি ভর্তি সুস্বাদু স্নিগ্ধ মাঠা রাখা থাকে রান্নাঘরে। খাবার টেবিলে থাকে বাগান থেকে তুলে আনা ডজন ডজন কলা। বাড়িতে তো লোক বলতে গৃহিণী আর তাঁর অবিবাহিতা দিদি, দুটি ছাত্র— গীতার এক কাকার মেয়ে কবিতা, ক্লাস সেভেনে পড়ে। তাদের দূর গ্রামে হাই স্কুল নেই বলে সে এখানে থেকে পড়ে। আর ভুটানি শরণার্থী শিবির থেকে নিয়ে আসা ছোট্ট অনাথ মেয়ে দীক্ষা। সে পড়ে ক্লাস থ্রিতে। বাড়ির বাকি ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক মেয়ে কালিম্পংয়ে পড়ে। মাসে এক-দুবার বাড়ি আসে। বাকি তিনজনই বাইরে। প্লেনসে— এঁদের ভাষায়। ফলে ওই কলা, আনারস, অত অত মাঠা— কে খাবে? বাড়ির সামনের ঢালু পাহাড়ি পথ দিয়ে গ্রামের যে বাচ্চারা স্কুলে যায়, তাদের মধ্যে যার যার ইচ্ছে, রান্নাঘরে এসে গ্লাসে করে মাঠা নিয়ে খেয়ে যায়। কলা খায়। গ্লাস ধুয়ে তাকে উপুড় করে রেখে যায়। বাড়িতে কেউ থাকুক না থাকুক, রান্নাঘরের দরজা বন্ধ থাকে না। কোনও বাড়িরই না।

স্কুল শুরু এগারোটায়, বাচ্চারা যেতে শুরু করে কিন্তু সাড়ে নটা থেকে। সবচেয়ে কুঁচোগুলো সাড়ে নটায় রাস্তা জুড়ে কলকল করতে শুরু করে। ছুটছে, পড়ে যাচ্ছে, এ ওকে তাড়া করছে, গাছের নিচু ডালে চড়ছে। চারটে-পাঁচটা করে বাচ্চার একেকটা দল আসছে। স্কুল ড্রেস পরা, পিঠে বইয়ের ব্যাগ, শুনলাম এসব গাঁয়ে নাকি সব বাচ্চা স্কুলে যায়। কিন্তু যেভাবে যাচ্ছে, কখন স্কুলে পৌঁছবে ওরা? তারও ব্যবস্থা আছে। সোয়া দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ একদল ছাত্রীকে দেখি রাস্তা বেয়ে আসছে। এদেরও পিঠে ব্যাগ— হয়তো নাইন-টেন হবে। এদের গুটি তিনেকের হাতে ছড়ি গোছের, হতে পারে কাঠি কিংবা ভাঙা গাছের ডাল। এরাও নিজেদের মধ্যে গল্প করছে কিন্তু যাচ্ছে প্রায় রাখালদের মতো স্টাইলে, রাস্তায় ছড়িয়ে থাকা যত বাচ্চাকে ওই ছড়ির ভঙ্গি দেখিয়ে খেদিয়ে নিয়ে চলেছে ইশকুলের দিকে। জানলাম এটাই স্বীকৃত ব্যবস্থা। এই খেলতে পাওয়ার লোভে কুঁচোরা চটপট খেয়ে, ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ির লোকেদের না-জানার কথা নয়, কারণ রাস্তা তো গ্রামের বাড়িগুলোরই আশপাশ দিয়ে। ওই একটাই বড় রাস্তা। বেশ খানিকক্ষণ প্রাণভরে খেলে নেওয়ার পর এই পশ্চাদবাহিনী আসে। এরা সবগুলোকে নিয়ে এবার স্কুলে ঢুকবে, 'আমরাও করতাম এরকম। খেলবার জন্য তাড়াতাড়ি পড়া করে নিতাম, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতাম'— বলে তাদের একজন। 'আর, এখন যাওয়ার রাস্তায় একটু খেলতে না পেলে স্কুলে গিয়ে খুব চেঁচামেচি করবে, খুব দৌড়াদৌড়ি করবে, পড়ায় মন লাগবে না।' না চাইলেও মনে পড়ে যায় টুলটুলে কচি কচি সব মুখ যাদের সারাদিনের রুটিনে কোনও খেলা নেই। মা-

বাবার বাইরে কোনও ব্যক্তিগত অবসর বা বন্ধুত্ব নেই। এরকম সহজ-সাবলীলভাবে সমাজে নিজেদের দায়িত্ব নেওয়ার কোনও অভ্যাততায় যারা বড় হয়ে ওঠে না।

বাড়ির পিছনদিকে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় খেতের শেষে পাহাড়ের ঢালে মাচার ওপর স্তূপাকৃতি খড় আর তার ওপর কিছু নড়াচড়া। বাপ্পা বাইনোকুলার ফোকাস করতে শেখায় একে একে প্রায় সবাইকে। চড়ুইয়ের চেয়েও ছোট ছোট লাল কালো বাদামি পাখির দঙ্গল ঝাঁপাই করছে স্তূপটার মধ্যে। আসলে ওরা খুঁটে খাচ্ছে খড়ের মধ্যে লেগে থাকা এক এক দানা ধান। তা করতে গিয়ে একেবারে ডুব দিচ্ছে খড়ের গাদার মধ্যে। হিমালয়ান মুনিয়া নাকি এরা। কালো ঠোঁট, কালো পা। পাখিরা বেশ অদ্ভুত। সবসময়ে আমাদের আশপাশে আছে, অন্তত এখনও আছে, কিন্তু খেয়াল না করলে অদৃশ্য হয়ে থাকে। অথচ যেই মন দেব, অমনি চারদিকের শূন্য যেন ঢেউ খেলিয়ে উঠবে, একটু উড়ে যাওয়া, একটু লাফিয়ে চলা, ডানার কী ঘাড়ের ছোট ছোট ভঙ্গি, ডাক। অবাক হয়ে ভাবব— এতদিন তো দেখতে পাইনি! সামনেই ছিল? কিন্তু এখানে, গাছ মাঠ খেতের এই বিষহীন সবুজ সম্ভারে, এ তো পাখিদেরই উৎসবক্ষেত্র।

জয়া মিত্র □ *ভ্রমণ সেপ্টেম্বর ২০০৯*

২০১০ ∬ এভারেস্ট এভারেস্ট

আজ ১৬ মে একটা অন্যরকম অনুভূতি হতে লাগল। বাইরে বেরিয়ে বেশি হাঁটাচলা না করে তাঁবুতেই বেশিরভাগ সময় কাটাচ্ছি। কারণ হাঁটাচলা বেশি করলেই অক্সিজেনের ব্যবহার বেড়ে যাবে। অক্সিজেন বোতলও যা আছে, শীর্ষে না ওঠা অবধি শেষ করা যাবে না। এইসব ভাবতে ভাবতে ঠিক হল আজ, অর্থাৎ ১৬ মে, রাত ৮টায় শীর্ষে ওঠার জন্য বেরনো হবে। এক-দেড়ঘণ্টা আগে থেকে আমরা চারজনই প্রস্তুত হয়ে বসে আছি। রাত আটটায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম। জানি সব জায়গাতেই দড়ি লাগানো আছে। যেখানেই দড়ির সাহায্য নিতে হচ্ছে সেখানেই জুমারিং। জোনাকি পোকার মতো অন্ধকারে জ্বলছে সবার হেড টর্চ। বুঝলাম প্রায় সব অভিযাত্রীরা এবং তাদের শেরপারা রওনা হয়েছে।

সারারাত ধরে আস্তে আস্তে উঠতে লাগলাম, ওই উচ্চতায় খুবই কষ্টকর ব্যাপার। প্রচণ্ড দমবন্ধ লাগছিল। এই পর্বটা বেশ কষ্টকর। তখন অন্য আর কিছুই মাথায় আসছে না। শুধু সামনে ওঠো, দড়ি ধরো আর আস্তে আস্তে শীর্ষবিন্দুর দিকে এগিয়ে যাও। এইরকমভাবে বেশ কয়েক ঘণ্টা বাদে এসে পৌঁছলাম সাউথ সামিটে। এটি এভারেস্টের শীর্ষে ওঠার আগে একটা স্থান। মোটামুটি শীর্ষদেশ থেকে ৫০০-৬০০ ফুট নীচে। ভোর হয়ে আসছে। আমাদের গতি খুবই শ্লথ। একেকটা পা ফেলছি আর বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। এইরকম সময়ই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম।

পশ্চিমদিকের উপত্যকাতে এভারেস্টের ত্রিকোণ আকৃতির ছায়া। পূর্বদিক থেকে সূর্য উঠছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটিকে ক্যামেরাবন্দি করলাম। আমরা উঠছি দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরা বরাবর, দক্ষিণদিকে দাঁড়িয়ে আছে লোৎসে, পশ্চিমে নুপৎসে, দূরে দক্ষিণ-পূর্বদিকে মাকালু। ভোরের আলোয় নানা রকমের শীর্ষবিন্দুগুলি এবং নামী-অনামী পর্বত, এই হিমালয়ে দেখা যাচ্ছে। এক অদ্ভুত সুন্দর চিত্রপট। কিন্তু বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না। দেবাশিস বরাবরই এগিয়ে ছিল। আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল যে আগে পারবে, সে এগিয়ে যাবে। একজনও যদি শীর্ষারোহণ করতে পারে সেটাই সকলের লাভ। আমার, দেবাশিস বা আমাদের ক্লাবের শুধু নয়, যাঁরা আমাদের ওপর আশা ভরসা করেছে, তাঁদের সবারই লাভ।

ভোরের আলোয় এভারেস্টের পাশের রূপ জীবনে ভোলার নয়। এই সাউথ সামিট থেকে দড়ি ধরে ওঠা শুরু করলাম। বেশ কিছুক্ষণ বাদে দেখলাম একটা রক ক্লাইম্বিং করার মতো জায়গা। প্রায় ফুট পনেরো থেকে কুড়ি একটা চিমনি ক্লাইম্ব। যার দুদিকেই প্রায় ৮,০০০-১০,০০০ ফুট গভীর খাদ। আমার এত বছরের প্রায় আঠারো-উনিশটা পর্বতশিখরে ওঠার জন্য, এর থেকে অনেক অনেক কঠিন পর্বতারোহণ করতে হয়েছে। সেই তুলনায় এটা কিছুই নয়। কিন্তু এই উচ্চতায় কখনও উঠিনি। এই উচ্চতায় এক-এক ফুট দম বের করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। আস্তে আস্তে, খুব সাবধানে ও সন্তর্পণে চিমনিটিও পেরলাম। পরে জানতে পারলাম এটাই নাকি সেই বিখ্যাত হিলারি স্টেপ। জানতে পারলাম বটে কিন্তু কঠিনতাটা বুঝতে পারলাম না। কত কাহিনী শুনেছি এই হিলারি স্টেপের। শেষে উঠে এলাম এভারেস্ট শীর্ষে— ২৯,০২৯ ফুট। তখন ঘড়িতে সকাল আটটা কুড়ি। ১৭ মে।

দেবাশিস প্রায় ৪০ মিনিট আগেই উঠেছে শীর্ষদেশে। ওর ১৫ মিনিট আগে উঠছে পেম্বা, আমার পর উঠছে পাসাং। উঠতেই, প্রথমে দেবাশিস আমায় জড়িয়ে ধরল এবং পেম্বা-পাসাংরাও আমাকে জড়িয়ে ধরল। এই সেই রাধানাথ শিকদারের এভারেস্ট, জর্জ এভারেস্টের এভারেস্ট, হিলারি-তেনজিংয়ের এভারেস্ট, ম্যালোরির এভারেস্ট। সেই এভারেস্টের শীর্ষবিন্দুতে আমরা দাঁড়িয়ে। এভারেস্টের শীর্ষে দাঁড়িয়ে হাজাররকম অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কত কী মনে পড়ছিল। পর্বতারোহণের শুরু থেকে আজ অবধি এবং নানারকম সব স্বপ্ন, সব এক লহমায় চোখের সামনে এক পর্দায় ভেসে উঠে দ্রুত মিলিয়ে গেল। বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম, বাক্যহারা হয়ে গেলাম। সম্বিত যখন ফিরল দেখি, প্রায় ভিড়ে-ভিড়াক্কার শীর্ষদেশটি। নানা দেশের নানা অভিযাত্রী এবং শেরপারা আলিঙ্গনাবদ্ধ। একে অপরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমাদেরও জানাল, আমরাও জানালাম। আনন্দে শীর্ষদেশ থেকে ওয়াকিটকিতে দ্বিতীয় শিবিরে কুক বুদ্ধিকে জানালাম আমরা পেরেছি, আমরা এভারেস্টের শীর্ষে।

বসন্ত সিংহরায় □ *ভ্রমণ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১০*

২০১১ ∬ রেলপথে আগরতলা থেকে ধর্মনগর হয়ে ঊনকোটি

মুঙ্গিয়াকামি স্টেশন থেকে রওনা দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আঠারোমুড়া পাহাড়ের এলাকা আরম্ভ হল। প্রায় ৩৫ মিনিট পরে এই পথের দ্বিতীয় টানেলের ভেতরে প্রবেশ করল আমাদের ট্রেন। ঘন অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দীর্ঘ টানেল অতিক্রম করা সত্যিই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। টানেল অতিক্রম করার পর আবিষ্কার করলাম পাহাড়-জঙ্গলে ভরা এক দুর্গম অঞ্চলের ভেতর দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। কিছুদূর যাওয়ার পর ধলাই নদী পার হলাম। ত্রিপুরার অন্যতম বিখ্যাত এই নদীর নামেই একটি জেলার নামকরণ হয়েছে।

ধলাই নদী অতিক্রম করার পর মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম আমবাসা স্টেশনে। ধলাই জেলার সদর হল আমবাসা। বেশ গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং স্টেশনটিও বেশ বড়। এখানে যত যাত্রী নেমে গেল, উঠল তার চেয়ে বেশি।

আমবাসার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য স্টেশনটির নাম মনু। আমবাসা থেকে ২০ কিলোমিটার দূরবর্তী মনু যাওয়ার পথে অতিক্রম করতে হল এই পথের তৃতীয় টানেল এবং মনু নদী।

মনু থেকে ছেড়ে আমাদের ট্রেন এখন মোটামুটি সমতলভূমির ওপর দিয়ে কুমারঘাট স্টেশনের দিকে চলেছে। ট্রেনের জানলা দিয়ে চোখে পড়ছে সুপারি গাছে ঘেরা কৃষিজমি। পানের বরজ, পুকুর আর বাঁশবন।

আমাদের ট্রেন প্রায় কুড়ি মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর কুমারঘাট থেকে রওনা দিল পরবর্তী স্টেশন প্যাঁচারথল-এর উদ্দেশে। দেখতে দেখতে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ডুব দিল। গোধূলির নরম আলোয় অপরূপ রূপ ধরল চরাচর। সমতল এলাকা ছেড়ে ট্রেন এখন হালকা চড়াই পথ ধরেছে। ছোট-বড় টিলারা আবার দৃশ্যমান হতে আরম্ভ করল। অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ টিলার ওপর সাধারণ ঘরবাড়ির পাশাপাশি আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর দৃষ্টিনন্দন বাড়ি দেখে অবাক হলাম।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসার মুখে প্রথমে ছোট, তারপর বেশ দীর্ঘ একটি টানেল অতিক্রম করলাম। কুমারঘাট থেকে প্যাঁচারথল পৌঁছতে সময় লাগল ২৫ মিনিট।

ইতিমধ্যে অন্ধকার বেশ জমাট বেঁধেছে, অথচ ট্রেনে আলো জ্বলছে না। আমাদের কামরায় ছড়িয়ে থাকা যাত্রীরা সব একজায়গায় জড়ো হল। জানা গেল, এই লাইনের প্যাসেঞ্জার ট্রেনে মাত্র কয়েকটি কামরায় টিমটিম করে আলো জ্বলে আর বাকিগুলিতে সূচিভেদ্য অন্ধকার বিরাজ করে। বলা বাহুল্য, এই পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার জন্য ছিঁচকে চোরেরাও এই রেলপথের নিয়মিত যাত্রী।

অন্ধকারাচ্ছন্ন কামরায় বসে রেলভ্রমণের অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর নয়। অদৃশ্য সহযাত্রীদের মধ্যে হঠাৎ কেউ কথা বললেই মনে হচ্ছে দৈববাণী হচ্ছে।

প্যাঁচারথল থেকে পানিসাগর স্টেশন অতিক্রম করে ধর্মনগর পৌঁছতে সময় লাগল প্রায় এক ঘণ্টা। ট্রেন থেকে নেমে বেশ স্বস্তিবোধ করলাম। তবে এই স্বস্তি সাময়িক। ধর্মনগর শহরে যে আত্মীয়ের বাড়িতে আমি অতিথি হব, ফোনের মাধ্যমে অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তাই সম্পূর্ণ ঠিকানা এবং পথনির্দেশ আমার অজানা। আমার সম্বল বলতে এক ব্যক্তির নাম এবং যে এলাকায় উনি বাস করেন সেই জায়গার নাম।

ধর্মনগর স্টেশন থেকে বাইরে যাওয়ার পথে চোখে পড়ল রেলের নিরাপত্তাবাহিনীর অফিস। সোজা গিয়ে হাজির হলাম ডিউটি অফিসারের সামনে। আমার সমস্যাটা মন দিয়ে শোনার পর উনি একজন প্রবীণ কর্মীকে নির্দেশ দিলেন আমাকে তাঁর কোনও পরিচিত সাইকেল রিকশাচালকের গাড়িতে তুলে দিতে। চালকের ওপর দায়িত্ব থাকবে ন্যায্য ভাড়ায় আমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার। আমার গন্তব্য ধর্মনগর শহরের শিববাড়ি এলাকা। রেলসুরক্ষাকর্মী মাধব মণ্ডলের উদ্যোগে সঞ্জয় দেব নামে এক তরুণ রিকশাচালকের সন্ধান পাওয়া গেল। শিববাড়ি মন্দিরের কাছেই যার বাড়ি।

রিকশা চলতে আরম্ভ করা মাত্র সঞ্জয় আমাকে অভয় দিল, 'কোনও চিন্তা কইরেন না,আমি ঠিক জায়গায় লইয়া যামু।' ধর্মনগর রেলস্টেশন থেকে অনেকটা পথ পেরিয়ে পুরনো বাসস্ট্যান্ড অতিক্রম করে একসময় শিববাড়ি রোডের প্রবেশপথে পৌঁছে গেলাম। একটি মুদিখানা দেখে মনে হল এখানেই খোঁজখবর নেওয়া যাক। দোকানের মালিকের কাছে গিয়ে জানালাম, ধর্মনগর সরকারি কলেজের অধ্যাপক সুজিত চক্রবর্তীর বাড়ির সন্ধান করছি। পথনির্দেশ পাওয়া গেল। আমার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে চক্রবর্তী পরিবার উচ্ছ্বসিত।

ধর্মনগর শহর থেকে উনকোটি ২১ কিলোমিটার দূরে। বেলা ১২টা নাগাদ মধ্যাহ্নভোজন সেরে সুজিতবাবুর সঙ্গে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গিয়ে হাজির হলাম। উনকোটি ভ্রমণে সুজিত চক্রবর্তীকে সঙ্গীরূপে পাওয়া যাবে, আমি একেবারেই আশা করিনি। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গিয়ে দরদাম করে ৪৫০ টাকা দিয়ে একটি অল্টোগাড়ি ভাড়া করা হল।

ধর্মনগর শহর থেকে বেরিয়ে আসার পরেই শুরু হল চা-বাগানের এলাকা। সুজিতবাবু জানালেন, এই চা-বাগানের নাম হাফলং টি-গার্ডেন।

উঁচু-নিচু পথের দুধারে সবুজ চা-বাগানের অনুপম বিস্তার। ধর্মনগর থেকে রওনা দেওয়ার প্রায় কুড়ি মিনিট পর আমাদের গাড়ি আনন্দবাজার নামের জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ি থেকে নেমে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে হাজির হলাম। দোকানের সামনেই বাঁশ দিয়ে তৈরি বেঞ্চিতে বসে স্থানীয় মানুষজনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড দেখতে বেশ লাগছিল।

আনন্দবাজার থেকে উনকোটির দূরত্ব ৭ কিলোমিটার। অসংখ্য বাঁকবিশিষ্ট এই পথটি গিয়েছে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। অসাধারণ প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত এই পথ ধরে চলার অভিজ্ঞতা সত্যিই ভোলার নয়। পথসংলগ্ন অরণ্যে অচেনা গাছপালার সংখ্যাই বেশি। চেনা গাছের মধ্যে রয়েছে শাল, সেগুন, গামার, শিরীষ, বেল, কুল, আমলকী, তেজপাতা, আম, কাঁঠাল, বুনো কলাগাছ, শিমুল, একাধিক প্রজাতির বাঁশ এবং হরীতকী গাছ।

একসময় পথসংলগ্ন বিশাল বোর্ডের দিকে চোখ পড়ল। বড় বড় করে লেখা আছে 'উনকোটি ইকো পার্ক'। এখানে কৈলাশহরগামী সড়কপথ ছেড়ে আমাদের গাড়ি ডানদিকের হালকা চড়াই পথ ধরল।

আমাদের গাড়ি চড়াই পথের শেষে একটি তোরণ পেরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তোরণের মাথায় বাংলায় লেখা 'শৈবতীর্থ উনকোটি'। গাড়ি থেকে নেমে একটু এগিয়ে যেতেই দেখি ইট দিয়ে বাঁধানো সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে। ডানদিকের আরেকটি সিঁড়ি উঠে গিয়েছে পাশের অনুচ্চ টিলায়। সুজিতবাবুকে অনুসরণ করে পৌঁছে গেলাম টিলার ওপরে। এখানে এসে যে একটু হতাশ হলাম তা স্বীকার করাই ভালো। এখানে রয়েছে সাম্প্রতিককালের নির্মিত মন্দিরে মহাদেবের মূর্তি। মহাদেব মন্দির দর্শন করে আবার নীচে নেমে এলাম। মাত্র কয়েকটি ধাপ নামার পর যে দৃশ্যটি চোখে ধরা দিল তা দেখে অপার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। যা দেখছি তা বাস্তব না দৃষ্টিভ্রম! পাহাড়ের গায়ে এমন বিশালাকার ভাস্কর্যকে রূপ দেওয়া সম্ভব হল কীভাবে? আরও একটু কাছে গিয়ে জটাধারী শিবের বিশাল মুখমণ্ডলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। শিবের চেহারা, কর্ণভূষণ এবং গলার মালা দেখে মনে হচ্ছে অনবদ্য এই ভাস্কর্যের মধ্যে কোথায় যেন একটা উপজাতীয় প্রভাব রয়েছে।

রবীন চক্রবর্তী □ ভ্রমণ মে ২০১১

২০১২ // প্রধান সম্পাদকের কথা

ভ্রমণের আনন্দ আপনাকে কে শেখাল? ভ্রমণের পথ আপনাকে কে দেখাল? পৃথিবীর রূপের কথা আপনাকে কে শোনাল? ভ্রমণস্মৃতি আপনি পেলেন কোথায়? এত ভ্রমণস্বপ্ন লেখেন কেন?

কথাগুলো একটু সাজিয়ে নিলেও, পথে-বিপথে প্রায় এইরকমই অবাক, অহেতুক অতিশয়োক্তি শুনি আর ভাবি, মানুষের জীবনটাই যেখানে এক অনির্ণেয় দূরযাত্রা, অনির্দিষ্ট দুর্গমতা, একইসঙ্গে আবার জীবনের মুক্তবিদ্যালয়ে আজীবনের আনন্দপাঠ, সেখানে ভ্রমণ নিয়ে এত কথার সুযোগ কোথায়? মাছ কি জল নিয়ে প্রশ্ন করে? পাখি, আকাশ নিয়ে? কুটো, কালবৈশাখী নিয়ে?

ছেলেবেলায় সেই যে একবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক গাঁয়ে আদিগন্ত জলে-ডোবা ধানখেত চিরে চলে যাওয়া খালে ডোঙা বাইতে বাইতে জেনেছিলাম— জল, আলো, আকাশ, বাতাস শুধু চোখ ভরে দেখা, মন ভরে শেখা আর বুক ভরে নেবারই জিনিস, তার আর বদল হল না, বরং দিনে দিনে সেই বোধ আমার বেড়েই চলল।

সেবার শুধু বড়দের বুদ্ধির দোষে আমার সেই তালগাছের ডোঙায় ধামুয়ার খাল পেরিয়ে ডায়মন্ডহারবারের নদী হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে ক্রমশ সাতসমুদ্রপথে বিশ্বভ্রমণ পণ্ড হওয়ার দুঃখও তাই ভুলতে পারি না। সেইজন্যই আজ সাতসমুদ্র তেরোনদী তেত্রিশহাজার পথে ঘুরে বেড়াই। সবাইকে বেরিয়ে পড়ার ডাক দিয়ে যাই।

এইভাবে পথে পথেই 'ভ্রমণ' উনিশ পূর্ণ করে কুড়িতে পা রাখল। 'ভ্রমণ' জানে, পথই সখা, পথই শেখায়। পথই এক পরম পাওয়া।

আবার, 'ভ্রমণ' নামে আমাদের এই নিমন্ত্রণপত্রিকার পরম পাওয়া পাঠকের ভালোবাসা। বহুজন যখন জানান, সেই প্রথম সংখ্যা থেকে এই সাম্প্রতিক সংখ্যাটিও তাঁর জীবনের প্রিয় সঙ্গ, মূল্যবান সংগ্রহ, তখন আমাদেরও প্রাণে আনন্দ জাগে, মনে প্রেরণা লাগে। কেউ যখন বলেন, 'ভ্রমণ' তাঁর কাছে তাঁর ধর্মগ্রন্থ, তখন আমাদেরও মন আশায় আশ্বাসে ভরে ওঠে। কেউ যখন জানান, প্রতিমাসের 'ভ্রমণ' তাঁর কাছে বসুন্ধরার ধারাবাহিক উন্মোচন, তখন আরও দূর-দিগন্তের পথে তাকে সঙ্গী করে নিতে মন চায়, কেউ যখন 'ভ্রমণ'-এ সুন্দরের সন্ধান পান, সেই সুন্দরের সান্নিধ্য পেয়ে আমাদেরও আনন্দ হয়। আনন্দ হয়, একদশক আগেই যখন ভারতের পর্যটনসচিব এক ঘরোয়া পর্যটন পরিবেশে বলেন, 'ভ্রমণ'-ই তাঁর পড়া ভারতের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-পত্রিকা, তারপর দু-দশকের মধ্যে সারা ভারতে সবচেয়ে বেশি পঠিত ট্রাভেল ম্যাগাজিন হয়ে ওঠবার গৌরবও কম আনন্দদায়ক নয়।

কেউ যখন 'ভ্রমণ'-এর কথায় ছবিতে জীবনের স্বপ্ন খুঁজে পান, কেউ যখন 'ভ্রমণ'-এর পাতায় ভুবনভরা ভালোবাসা দেখেন, প্রকৃতির রূপে-রঙে দেখেন মহতের প্রতিমা, তখন পাঠকই আমাদের পথ দেখান। রবীন্দ্রসংগীতের কিংবদন্তি শিল্পী সুচিত্রা মিত্রও যখন জানান যে সারাদিন গানের পর তাঁর ক্লান্ত মন 'ভ্রমণ'-এ মুক্তি খুঁজে পায়, তখন আমরাও খুঁজে পাই ভ্রমণের নতুন সংজ্ঞা। কিংবা পর্যটনমেলায় হঠাৎ এই ভ্রমণভিখারি লেখকের দেখা পেয়ে কেউ যখন বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে নিজের স্ত্রীকে দেখিয়ে বলে ওঠেন, 'আপনাকে না নিয়ে আমার স্ত্রী একদিনও শুতে যান না,' আর উপস্থিত সবাই যখন বুঝি যে স্ত্রীর শয্যাসঙ্গী বলতে তিনি প্রতিমাসের 'ভ্রমণ'-ই বোঝান, তখন আমাদেরও আনন্দের সীমা থাকে না।

তবে, এইসব আনন্দের সঙ্গে মিশে যায় আমাদের আশঙ্কাও। আশঙ্কা এই যে, পাঠকের এমন দুর্লভ ভালোবাসা আমাদের এগিয়ে চলার প্রেরণা না হয়ে আত্মতৃপ্তির কারণ হয়ে উঠছে না তো! 'ভ্রমণ' নিয়ে আমাদের স্বপ্ন অনেক, সাধনা অতন্দ্র, পথও অসীম। দু-দশকে তার অল্পই পার হয়েছি আমরা। এদিকে সাতসমুদ্র, তেরোনদী, তেত্রিশকোটি পথ আমাদের নিত্য ডাকে।

'ভ্রমণ' ফেব্রুয়ারি ২০১২

ছোটদের জন্মদিনে শ্রেষ্ঠ উপহার

ছেলেবেলা

- ✓ বাড়ির ছোটদের বা তাদের বন্ধুদের সামনের জন্মদিনেই আগামী একবছরের জন্য প্রতি মাসের 'ছেলেবেলা' উপহার দিতে পারেন।
- ✓ একবছরের গ্রাহকমূল্য (ডাকব্যয় সহ) ১৫০ টাকা (ক্যুরিয়ারে পেতে চাইলে ২৬০ টাকা) চেকে বা মানি অর্ডারে Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে আমরাই উপহার প্রাপকের নাম লেখা গিফট কার্ড সহ 'ছেলেবেলা' পাঠাবার ব্যবস্থা করব।
- ✓ চেকের সঙ্গের চিঠিতে বা মানি অর্ডার ফর্মের একেবারে নীচের দিকে আপনার নাম-ঠিকানা আর উপহার প্রাপকের নাম ও জন্মতারিখ অবশ্যই লিখে দেবেন। উপহার প্রাপকের ঠিকানা অন্য হলে তার ঠিকানাও লিখতে হবে।
- ✓ যে মাসে জন্মদিন তার অন্তত একমাস আগে আমাদের দপ্তরে টাকা পৌঁছতে হবে। চেক বা মানি অর্ডার পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

Subscribe online: www.swarnakshar.in

ফোন: ২২৮০ ৮৮১৮ ফ্যাক্স: ২২৮৭ ৬৪৪৮ ই-মেল: chhelebela@swarnakshar.in

অনলাইন গ্রাহক হতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

BHRAMAN □ Vol. 21 No. 1 □ 1 February 2013 □ Rs. 25 RN. 53133/93 □ Postal Regn. No. KOL RMS/218/2013-2015

ভ্রমণ

বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

No. 1 Travel Magazine in India with the largest readership*

Available at Newsstand, also with Newspaper Hawker, OR

Subscribe Online ▶ www.swarnakshar.in

**Source: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q3*

Website: www.bhraman.com □ www.ebhraman.com